আকাশ কত দূর

অনিরুদ্ধ সেন

মনীষা

AKASH KATA DUR
A Bengali Novel
By Anirudha Sen
Rupees Thirty Only

প্রথম প্রকাশ
১৫ই আগস্ট ১৯৬৫

প্রচ্ছদ
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

প্রকাশক
মণি সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৫৪এ, হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুদ্রক
মৃণালকান্তি রায়
রাজলক্ষ্মী প্রেস
৩৮সি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

দাম ত্রিশ টাকা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু
স্মরণে

"The human tragedy reaches its climax in the fact that after all the exertions and sacrifices of hundreds of millions of people . . . . . . we have still not found Peace or Security, and that we lie in the grip of even worse perils than those we have surmounted."

Winston Churchill
in his
"Second warld war"

"ভুলি কেমনে—"

১৯শে নভেম্বর ১৯৬২

ঝোঁকের মাথায় চাকরিটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হল কী ?

চকিতে প্রশ্নটা জাগে ডাঃ গৌতম চৌধুরীর মনে।

সবেমাত্র বার্থটায় বিছানাটা পেতে জানালাটা ঘেঁষে বসেছেন ; মনে হল কে যেন অন্তরাল থেকে ছুঁড়ে মারল প্রশ্নটা তাঁর দিকে। অথচ কেউ কোথাও নেই। প্রথম শ্রেণীর ক্যুপেটায় তিনিই একমাত্র যাত্রী। মাঝপথে রায়পুর থেকে হাওড়াগামী বম্বে মেল-এ খালি একটা ক্যুপে মেলা ভাগ্যই বলতে হয়। বিশেষতঃ দুর্ভাগ্য যাকে পদে পদে অনুসরণ করছে সারা জীবন। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গা এলিয়ে বসেন ডাঃ চৌধুরী।

বয়স হবে আটান্নর কাছাকাছি। সাধারণভাবে দেখলে মনে হবে বেশ দীর্ঘ সুঠাম দেহ। একটু নজর দিয়ে তাকালেই বুঝতে পারা যায় দারুণ একটা বিষণ্ণতা আর বহু শ্রমের ক্লান্তি সারা দেহটাকে যেন ঘিরে আছে। তবু কলকাতা গিয়ে তীব্র একটা আন্দোলন গড়ে তুলবার কঠিন দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন অগ্র-পশ্চাৎ কিছু বিবেচনা না করেই। দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত ছিন্নমূল পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবীতে আন্দোলন।

আন্দোলন ? একটা ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে তাঁর চোখেমুখে একদা ইংরেজরাজের আসন টলাতে আন্দোলনের পথে নামতে হয়েছিল ভারতবাসীদের। আজ আমরা স্বাধীন। কিন্তু আন্দোলনের যুগ ফুরিয়ে যায়নি। যেমনি ছিল তেমনি আছে। আবেদন-

নিবেদনে দিল্লীর মসনদ সেদিনও নড়েনি, আজও নড়ে না। আজও চলে পুলিসের ব্যাটন, চলে টিয়ারগ্যাস আর রাইফেলের গুলি। রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের বলি হয় কত নিরীহ প্রাণ। ব্রিটিশরাজ তাদের উত্তরসূরীদের, আর কিছু না হোক; 'ল' এ্যাণ্ড অর্ডার-এর অজুহাতে গণদেবতাকে কীভাবে দাবিয়ে রাখা যায় সে কায়দাটা ভাল করেই শিখিয়ে গেছে।

এই যেখানে হাল, সেখানে জোরদার একটা আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হবে কী? কেমন একটা দ্বিধা জাগে, আর এই দ্বিধাটাই 'চাকরি ছাড়া ঠিক হল কী'-প্রশ্নরূপে সামনে এসে দাঁড়ায়। মনের দুর্বলতা কাটাতে সোজা হয়ে বসেন বার্থটার ওপর। আড়াল থেকে কে যেন বলে, চাকরি আর আন্দোলন একসঙ্গে চলে না, গৌতম। দৃঢ়পদে এগিয়ে যাও। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। কেউ যদি আজ তোমার ডাকে না আসে, একলা এগোও। ওরা তখন তোমার পেছনে আসবে। তারপর? তারপর আন্দোলন তার নিজস্ব খাত নিজেই করে নেবে।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চোখটা মেলে ধরেন দিগন্তপ্রসারী মাঠটার দিকে। হাওড়াগামী বম্বে মেলটা মাঠটার বুক চিরে ছুটে চলেছে বিদ্যুৎগতিতে। দূরে বহু দূরে আকাশটা নেমে এসে মাঠের বুকে যেন নিজেকে সঁপে দিয়েছে। ছুটতে ছুটতে ট্রেনটা বোধহয় আকাশটাকে ভেদ করে অন্য কোন পৃথিবীতে চলে যাবে।

হঠাৎ নজরে পড়ে রেললাইনের আড়াআড়ি ধাবমান টেলিগ্রামের পোস্টগুলোর দিকে। ছুটে আসছে ওরা। দূরের পোস্টগুলো কত ছোট। তারাই আবার দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে সামনের দিকে ছুটে আসছে। তারপর ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে পেছনের দিকে ছুটে চলে যাচ্ছে।

দেখছেন আর ভাবছেন, কত ঘটনা ঘটে গেল তাঁর জীবনে। বলতে চান সবাইকে, কিন্তু শুনবার মত ধৈর্যবান দরদী কজন

আছেন। নিকট বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন সত্যি তিনজনকে। বলেছিলেন তাঁদের জীবনের সব কাহিনী। তাঁরা দিয়েছেন আন্তরিক সহানুভূতি। কিন্তু তাঁর অশান্ত মন শান্ত হয়নি। কেন? কোন সদুত্তর খুঁজে পাননি। সবকিছু ছাপিয়ে একটা ছিদ্রহীন নিঃসঙ্গতা তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, যার হাত থেকে আজ পর্যন্ত তিনি মুক্তি পেলেন না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। হঠাৎ মনে হল কারা যেন সহস্র চোখ মেলে তীব্র দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। সচকিতে কামরার ভেতরটার দিকে চোখ ফেরান ডাঃ চৌধুরী। কোথাও কেউ নেই, শুধু কামরার বাতিগুলো একসঙ্গে সব দপ্ করে জ্বলে উঠেছে। ছায়াতে কায়াভ্রম। নিজের মনেই অস্ফুটস্বরে বলেন। কিন্তু এতগুলো আলোর তীব্র রশ্মি চোখে যেন জ্বালা ধরিয়ে দেয়। যন্ত্রচালিতের মত উঠে গিয়ে সুইচ্‌গুলো অফ করে দেন। বাকী রইল শুধু নীল রঙের বাতিটা। তা' যাক। কেমন যেন একটা স্বপ্নালু মায়া জড়িয়ে আছে ওটাকে কেন্দ্র করে।

ভাল করে বার্থে পা ছড়িয়ে বসলেন ডাঃ চৌধুরী। দৃষ্টিটা তাঁর ঘুরে ঘুরেই ফিরে যায় ওই নীল বাতিটার দিকে। চোখ ফেরাতে পারেন না। যেন কত দিনের সাথী, কত চেনা, কত সাধনার ধন। নীল আকাশ, নীল সমুদ্র, আর নীল চোখ চিরদিন তাঁর জীবনের বৃহৎ একটা অংশ দখল করে আছে।

মনে পড়ে শিশু গৌতম বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়াত কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ থেমে অবাক হয়ে চেয়ে দেখত নীল সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস কেমন করে দূর-দিগন্তে আছড়ে পড়ছে নীল আকাশের বুকে। যৌবনের সেই তীব্র জ্বালা ঢাকার মিড্‌ফোর্ড হাসপাতালের হাউস্ সার্জেন ডাঃ গৌতম চৌধুরীর বুকে নার্স দীপালির নীল চোখের বিদ্যুৎ যেদিন কালবৈশাখীর ঝড় তুলেছিল। তেমনি আরও কত কী।

সবকিছু ছাপিয়ে বাবার কথাই মনে পড়ে সবার আগে। নাবিক ছিলেন তিনি। উদার, অকৃত্রিম, সৌম্যদর্শন গভীর নীল চোখ। বছরে এক মাসের বেশী গৌতম তাঁর দেখা পেত না। একটি মাস ছুটি পেতেন, আর ঐ একটি মাস গৌতম যেন তাঁর সঙ্গে লেপ্টে যেত। এক মুহূর্ত বাবাকে চোখের আড়াল করতে চাইত না। সায়াহ্নে গৌতমকে সঙ্গে করে বেড়াতে যেতেন সমুদ্রের ধারে। রঙ-বেরঙের কাঁকড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে ছুটে বেড়াতে বড় ভাল লাগত গৌতমের।

ছুটতে ছুটতে কখন যে গালে হাত দিয়ে বালির উপর বসে পড়ত গৌতম নিজেই তা টের পেত না। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত অস্তগামী সূর্যটার দিকে। দূর-দিগন্তে, ওই যেখানে নীল আকাশের বুকে আছড়ে পড়ছে নীল সাগরের জলোচ্ছ্বাস,—দেখা যায় ছোট্ট ছোট্ট জেলে ডিঙিগুলো সাদা, লাল, হলুদ—নানারঙের পাল উড়িয়ে ঢেউয়ের তালে নেচে বেড়াচ্ছে, যেন একপাল রাজহাঁস। আর সেই তালের সঙ্গে নেচে নেচে রাজহাঁসের দলকে নানারঙে রাঙিয়ে দিয়ে সূর্যদেব ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছেন মহাসমুদ্রের অতল গভীরে।

বাবা এসে ডাকতেন—সন্ধ্যে হয়ে এল, বাড়ি চ' গৌতম।

প্রশ্ন করত শিশু গৌতম—আচ্ছা বাবা, ঐ ডিঙিগুলোর কাছে গেলে আকাশটাকে ছোঁয়া যাবে না?

—দূর বোকা, আকাশ বুঝি ছোঁয়া যায়? জবাব দিতেন বাবা। কিন্তু কেন ছোঁয়া যাবে না, কিছুতেই বুঝতে পারত না গৌতম। তার কতই বা বয়স তখন, দশ-এগারোর বেশী হবে না। শিশু হৃদয়ের স্ফুটনোন্মুখ গভীর আগ্রহ নিয়ে গৌতমের মন তখন জাগতিক রহস্যের খোলটা ভেঙে ভেতরটা দেখার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে।

এমনি যখন মনের অবস্থা, তখন এল আর এক প্রচণ্ড ধাক্কা। সেদিন আর বেড়াতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। বিরামহীন বর্ষা। ঘরে বসে বাবা তাকে বলেন যুদ্ধের একটা গল্প।

…ইউরোপে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ অঙ্ক অভিনীত হচ্ছে। বাবাদের মার্চেণ্ট জাহাজ জঙ্গী-জাহাজের প্রহরায় ফ্রান্সের বন্দর থেকে বন্দরে মিত্র-সেনার রসদ জুগিয়ে বেড়ায়। তারই কোন একটা বন্দরে যেন—নামটা আজ মনে নেই—মাল খালাস করে পরদিনই বন্দর ছেড়ে জাহাজটার চলে যাবার কথা। সে রাত্রে সেনানিবাসে জাহাজের নাবিকদের ডিনারের আমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য গৌতমের বাবা শহরের অন্ধকার রাস্তা বেয়ে চলেছেন। সঙ্গে আরও তিনজন সহ নাবিক। একটা অনাগত ভীতির ছায়া যেন শহরটার সারা দেহে নেমে এসেছে। মাঝে মাঝে গৃহস্থ বাড়ির রুদ্ধদ্বারের অন্তরাল থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ ছাড়া জীবনের আর কোন স্পন্দন নেই। এমনি সময় রাত্রির নৈঃশব্দ ভঙ্গ করে জেগে উঠল অসংখ্য আগ্নেয়াস্ত্রের মারমুখী আওয়াজ। শত্রুপক্ষ শহর আক্রমণ করেছে বুঝতে পেরে গৌতমের বাবা সহকর্মীদের নিয়ে জাহাজের দিকে ফিরে চললেন। হঠাৎ একটা লোক দুহাতে পেটটা চেপে ধরে— "ও—মাই গড্" বলে গৌতমের বাবার ঠিক সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। নিজের জীবন বিপন্ন জেনেও তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন। আকাশে তখন আতসবাজির মতো অসংখ্য ট্রেসার লাইট ভেসে বেড়াচ্ছে। তারই আলোকে গৌতমের বাবা দেখলেন, উনিশ-বিশ বছরের একটি সুন্দর ইংরেজ যুবক। বেদনায় তার মুখ পাংশু হয়ে গেছে। মৃত্যু আসন্ন জেনে এক হাতে পেট চেপে ধরে অপর হাতে বুকের কাছে কী যেন একটা হাতড়াচ্ছে। বুক পকেটের বোতামটা খুলে গৌতমের বাবা খামে আঁটা একটা চিঠি বের করলেন।

চোখে জল ঠোঁটে করুণ হাসি টেনে যুবকটি বলল—আপনি যদি বন্ধু হোন, এই চিঠিটা ইংলণ্ডে আমার মায়ের কাছে পৌঁছে দেবেন।

তারপরই মুখ দিয়ে একঝলক রক্ত বেরিয়ে এল। ক্ষীণস্বরে

যুবক তখন বলছে—'গড্, সেভ্ দ্য কিং'—সঙ্গে সঙ্গে তার অসাড় দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

অন্যান্য সঙ্গীরা কোথায় ছিট্কে গেছে কিছুই জানা নেই। চিঠিটা তাড়াতাড়ি নিজের পকেটে পুরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গৌতমের বাবা একরকম ছুটতে ছুটতে জাহাজের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যান।

পরদিন জাহাজ বন্দর ছেড়ে সাউথ্-হ্যাম্পটনে এসে নোঙর করে। ঠিকানা খুঁজে মায়ের হাতে চিঠি পৌঁছে দিতে অসুবিধা হয়নি। আকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করছিলেন মা—আমার জন্, আমার জন্ কেমন আছে, মিষ্টার—

মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেননি গৌতমের বাবা। প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

গল্পটা শুনে শিশু গৌতম অঝোরে কেঁদেছিল আর ভেবেছিল মানুষ কেন যুদ্ধ করে? সেদিন একথার জবাব কিছু খুঁজে পায়নি সে। আজ হলে বলত,—জিজ্ঞাসা কর তাঁদের যাঁরা রণ-দানবকে মানুষের মাঝে ছেড়ে দিয়ে শান্তির প্রলাপ বকে।

কিন্তু তবু সেদিন একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিল শিশু গৌতম —আচ্ছা বাবা, একজন ডাক্তার পেলে সেদিন ছেলেটাকে বাঁচাতে পারতে?

উদাস সুরে বাবা বলেছিলেন,—কী জানি, হয়ত পারতাম।

সেদিন থেকেই ডাক্তার হবার প্রবল বাসনা গৌতমের মনে জেগেছিল। ডাক্তার তিনি হয়েছেন। কিন্তু পৃথিবীটা যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। বাবার আমলের ঘটনার বহু পুনরাবৃত্তি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। বাবা বেঁচে থাকলে এখন কী বলতেন কে জানে।

ভাবতে গিয়ে মন চলে যায় সেদিনকার বিকেলবেলায়। যখন সবেমাত্র গৌতম স্কুল থেকে ফিরেছে। মা তার জন্য খাবার তৈরী

করেছেন। লাল একটা সাইকেলে খাঁকি পোশাক পরা একটা লোক[illegible]দে একটা খাম তার হাতে দিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি খামটা [illegible] কেড়ে নিয়ে ভেতর থেকে একটা কাগজ বের করে একবার চোখ বুলিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কাগজটা মাটিতে পড়ে যায়। হঠাৎ গৌতমকে বুকে চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠেন মা। হতচকিত গৌতম কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে—বাবা কবে আসবেন, মা ?

আরও কান্নায় ভেঙে পড়েন মা। আরও জোরে গৌতমকে চেপে ধরেন। পরে বলেন—তিনি আর ফিরবেন না, বাবা—

—কেন ? অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল গৌতম।

মা শুধু কাঁদতে থাকেন, বলেন না কিছুই।

ওর অভিমান হয় বাবার ওপর।

—এই ত সেদিন যাবার সময় বাবা বলে গেলেন—আবার আসবেন।—তাহলে আসবেন না মানে ? বললেই হল ?

কিন্তু সত্যিই আর আসেননি তিনি। বাবার স্মৃতি আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে মনে থাকে শুধু শেষ বিদায়ের দিনটা। সেবারকার ছুটির পর যেদিন সকালবেলা তিনি চাটগাঁর জেটিতে জাহাজে উঠে চলে গেলেন। মায়ের সঙ্গে গৌতমও এসেছিল কর্ণফুলির জাহাজ ঘাটায়। জাহাজ যখন ছেড়ে নদীর জলে গা ভাসাল, বাবা তখনও রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। বাঁকের মুখে জাহাজটা যখন বাঁদিকে মোড় নিচ্ছে, বাবা হাতের রুমালটা দিয়ে একবার যেন চোখ ঢাকলেন। তারপর তাঁকে আর দেখা গেল না। পাশে মায়ের দিকে তাকিয়ে গৌতম দেখে, মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। তারপর নিঃশব্দে গৌতমের হাত ধরে বাড়ির রাস্তা ধরেন।

সেই যে গেলেন বাবা, আর এলেন না। পরে গৌতম জেনেছে যে বৃটিশ রণপোতের অন্যান্য বাণিজ্য জাহাজের সঙ্গে তার বাবার জাহাজও যখন ফ্রান্সের উপকূলের দিকে এগুচ্ছিল, তখন জার্মানদের

সাবমেরিন তাকে ডুবিয়ে দেয়। সেই নিমগ্ন জাহাজের সঙ্গে বাবাও ডুবে যায়। গৌতম ও গৌতমের মায়ের ভরণ-পোষণ আর গৌতমের শিক্ষার জন্য সরকার থেকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। এমনি করে শুরু হয় চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী থেকে গৌতমের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিপর্ব।

চোখটা ফিবে যায় নীল বাতিটার দিকে। একটা পোকা কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে তার আলোর বৃত্তটায়। মুক্তি চায় সে আলোটার জ্বালা থেকে। প্রাণপণে ছুটে বেরুতে চায়। কিন্তু আবার ফিরে আসে একই কেন্দ্রে। কিছুতেই যেন তার মুক্তি নেই। কতক্ষণ চলেছে এই টানা-পোড়েন লক্ষ্য কবেননি ডাঃ চৌধুরী। সর্বশক্তি নিয়ে এবার পোকাটা পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধপ্ করে পড়ে যায় কামরাটার মেঝেতে।

কলেজিয়েট স্কুলের প্রস্তুতিপর্ব থেকে শুক কবে বহু ঘটনার ঘূর্ণিপাকে পাক খেতে খেতে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ঝোঁকের মাথায় দণ্ডকারণ্যের চাকরিটা ছেড়ে দেবার সঙ্গে একটা হাইফেন যেন টেনে দেয় ঐ ঘূর্ণিপোকাটা। সে হাইফেনের সেতু বেয়ে ফিরে যায় ডাঃ চৌধুরীর নন-কলেজিয়েট স্কুলে। গুম্ গুম্ একটা আওয়াজ এসে কানে বাজে। বোম্বে মেলটাও একটা ব্রিজ পার হচ্ছে।

॥ এক ॥

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল। . বাল্য ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণের ক'টা বছর এখনও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে ডাঃ চৌধুরীর জীবনে। কুখ্যাত 'রাউলাট্' আইনের প্রতিবাদে সারা ভারতের রাজনৈতিক আকাশ তখন উত্তপ্ত। সেই উত্তপ্ত বায়ুতরঙ্গে তড়িৎপ্রবাহের মত নেমে এল 'জালিয়ানওয়ালা বাগের' হত্যাকাণ্ড। পাশবিক শক্তির বজ্রকঠিন চাপে অবদমিত ভারতাত্মা মুক্তির পথ খুঁজে বেড়ায়। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির একটি দ্বিতল প্রকোষ্ঠে সে রাত্রে আলো নেভেনি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্পর্শকতার মন পশুশক্তির এই নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশে যেমনি স্তম্ভিত, তেমনি চঞ্চল।

সরকার প্রদত্ত সর্বজনকাম্য 'স্যার'-উপাধি বর্জন করে রবীন্দ্রনাথ সে-রাতেই তদানীন্তন বড়লাট জেমসফোর্ডকে তাঁর সোচ্চার ধিক্কার ধ্বনিপূর্ণ ঐতিহাসিক পত্র প্রেরণ করেন।

কিন্তু শক্তিমদমত্ত শাসকের মন ধিক্কারকে গ্রাহ্য করে না। গণচেতনাকে শৃংখলিত করবার নিত্য-নতুন 'জঙ্গী আইন' প্রয়োগ করে বলদর্পে সে এগিয়ে যায়।

মুহ্যমান ভারত তার পথের সন্ধানে ব্যস্ত। কবিমনের ব্যথিত আহ্বানে বুঝি ভগবানের আসন নড়ে ওঠে। দয়াহীন সংসারে তিনি দূত পাঠালেন। শান্ত সমাহিত গভীর কণ্ঠে ভারতবাসীকে শেখালেন যিনি মুক্তির বাণী—

—"অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগ।—যে আদালতে পাশবিক

আইনের জোরে মানুষকে বন্দী করা হয়, সে-আদালতের ত্রি-সীমানা কেউ মাড়িও না। যে বিদ্যালয়ে গোলামের গোষ্ঠী পাইকারী হারে তৈরী হয় তোমাদের সন্তানদের বের করে নিয়ে এস সে-গোলামখানা থেকে। বিদেশী কাপড়ের মোহ ছেড়ে নিজের দেশের চরকা ও তাঁত অবলম্বন করে লজ্জা নিবারণ কর। পশু তার গর্জন বন্ধ করে লাঙ্গুল গুটিয়ে তোমার বশ্যতা স্বীকার করবে।"

সে যুগে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আবির্ভাব ভগবানের আশীর্বাদ রূপেই জাতির বুকে সাহসের সঞ্চার করেছিল। তাঁর নতুন বার্তা ছড়িয়ে পড়ে শহর হতে শহরে, গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। সুদূর চট্টগ্রাম শহরেও তার ধাক্কা লাগে। দেখতে দেখতে আদালত প্রাঙ্গণ জনশূন্য হয়ে যায়। স্কুল-কলেজ হ'তে ছেলেরা বেরিয়ে এসে মুক্তি সংগ্রামের স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তুলে। কলেজিয়েট স্কুল যদিও পুরোপুরি সরকারী সাহায্যপুষ্ট, সেখানেও আন্দোলনের ঢেউকে ঠেকান গেল না। প্রধান শিক্ষক নোটিশ দিলেন—"তাঁর স্কুলের কোন ছাত্র ক্লাস কামাই করলে, তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। 'জলপানি' পাওয়া ছেলের 'জলপানি' বন্ধ করে দেওয়া হবে।"

সেদিন যথারীতি স্কুলের গেটে হাজির হয়ে গৌতম দেখে যে প্রবেশপথ আগলে একদল ছেলে মাটির ওপর শুয়ে আছে।—

—"ঢুকতে হয় তো আমাদের পাঁজর মাড়িয়ে যাও"—এই তাদের একমাত্র কথা। গৌতমের সহপাঠী সদর মহকুমা-হাকিমের ছেলে কোন বাধা না মেনে বুকের ওপর দিয়েই ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ ঠোকর খেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। কে যেন চেঁচিয়ে উঠে—এইরে, 'হাঁড়োল।' কথাটার মানে কেউ জানে না। কিন্তু চারদিকে একটা অট্টহাসির রোল পড়ে যায়। অসহনীয় লজ্জায় বেচারীর নাক কান লাল হয়ে উঠে। গায়ের ধুলোবালি ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতেই আবার কে একজন হাঁকে—"মার কৈলাস।" আবার

হাসির কলরোল। ছেলেটা যেন মাটিতে নুয়ে পড়তে চায়। পালাবার পথ খোঁজে।

গৌতম একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছে, আর ভাবছে—কী করবে। স্কুলে না গেলে তার 'জলপানি' বন্ধ হয়ে যাবে। ঢুকতে গেলে ঐ ছেলেটার মতনই যে অবস্থা দাঁড়াবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার ডাক্তার হবার স্বপ্ন এখানেই বোধ হয় ভেঙ্গে গেল। ভাবতেও তার মন খারাপ হয়ে যায়। আবার ভাবে—এতগুলো ছেলে যে স্কুল ছেড়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে আছে, তারাও তো এমনি করে তারই মত কত স্বপ্ন দেখছে। সব ছাপিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্নই আজ তাদের সারা মন জুড়ে আছে।—আর গৌতম—? ছিঃ স্বাধীনতার চেয়ে ডাক্তার হওয়াটাই কি তার কাছে এত বড় হল? নিজের মনেই কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়ে গৌতম। ভাবছে, বাড়ি ফিরে যাব, নাকি ওদের সঙ্গে গেটের সামনে শুয়ে পড়ব?

এমনি সময় একটা চীৎকার উঠে। গৌতম তাকিয়ে দেখে ধুলো উড়িয়ে একদল অশ্বারোহী পুলিস ছুটে আসছে।

আত্মরক্ষার স্বাভাবিক ধর্মে আশে-পাশের ইতস্ততঃ জনতা ছুটে সরে যেতে থাকে। গৌতমও রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ায়। চোখের নিমেষে ঘোড়সওয়ারের দল শুয়ে পড়া ছেলেদের মাঝখান-দিয়েই তাদের ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। চীৎকার আর আর্তনাদে কী যে ঘটছে-না-ঘটছে কিছুই বুঝবার উপায় নেই। চারিদিকে জনতা ছিটকে ছড়িয়ে পড়ে। গৌতমের মাথায়ও একটা ব্যাটনের আঘাত লাগে। তারপরই কেমন যেন পায়ের তলাকার মাটিটা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে আর আকাশটা আসছে নীচের দিকে নেমে—ক্রমশঃ চারিদিক অন্ধকার—

চোখ মেলে গৌতম দেখে—মা তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছেন। চোখে-মুখে তাঁর দারুণ উৎকণ্ঠার ছাপ। গৌতমের বুকে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করেন—কেমন আছিস, বাবা?

ব্যাপারটা যে কি ঘটে গেল তা গৌতম এখনো কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। যে ঘরটায় আর যে বিছানায় সে শুয়ে আছে—কোনটাই তার চেনা-জানা নয়। নাকে কেমন যেন একটা নতুন রকমের গন্ধ ঢুকছে, যার সঙ্গে তার মোটেই কোন পরিচয় নেই। অবাক হয়ে সে এদিক-ওদিক তাকাবার চেষ্টা করে। ঘার ফেরাতে গিয়েই সে অনুভব করে যে ঠিকমত ঘাড় ফেরানো যাচ্ছে না। আটকে আটকে যাচ্ছে আর সেখানে অসহ্য যন্ত্রণা। ডানহাতটা তুলে ঘাড়ের কাছে আনতেই সে বুঝতে পারে যে তার মাথা-মুখ-ঘাড় জড়িয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। জিজ্ঞাসু চোখে মায়ের দিকে তাকাতেই মা বললেন—এটা হাসপাতাল।

মুখ দিয়ে কথা বের হতেও বাধ বাধ ঠেকছে যেন। আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে—হাসপাতাল? হাসপাতালে কেন মা?

মা বলেন, ঘোড়াসওয়ারের বেটনের ঘা লেগেছিল তোর মাথায়। জখমও হয়েছিল খানিকটা, তাই, ওরা তোকে হাসপাতালে দিয়ে গেছে।

গৌতম ভাবে, সে যখন ডাক্তার হবে, এমনি একটা হাসপাতালের ভার হয়তো তারই হাতে থাকবে।

ভাবনা-স্রোতে বাধা দিয়ে ডাক্তার এসে সামনে দাঁড়ান। গৌতমের জিব, চোখ, নাড়ি সব পরীক্ষা করে মাকে বলেন,—সব ঠিক আছে। কাল সকালেই বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। ব্যাণ্ডেজটা শুধু যেমনি আছে তেমনি থাকবে। সাতদিন পর এখানে নিয়ে আসবেন। আমি নিজে খুলে দেব।

বাড়িতে এসে গৌতমের আর সময় কাটে না। গ্রীষ্মাগমে স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। বাইরে আন্দোলনের ঢেউও ঝিমিয়ে এসেছে। শুধু কিছু কিছু ছেলে দল বেধে রাস্তা দিয়ে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি তুলে গান গেয়ে যায়—

'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা,

মানুষ আমরা নহি তো মেষ,
দেবী আমার, সাধনা আমার
স্বর্গ আমার, আমার দেশ।'

সদর দরজায় দাঁড়িয়ে মিছিল দেখে আর ভাবে, কবে আমরা স্বাধীন হব।

স্কুল যখন খোলে, আন্দোলন তখন ঝিমিয়ে পড়েছে। কিছু কিছু ছেলে অনুপস্থিত থাকলেও, অধিকাংশ ছেলেই ফিরে এসেছে। সবদিকে একটা চাপা-চাপা আবহাওয়া। কাল-বৈশাখী ঝড়ের পর প্রকৃতি যেমন নিজের উদ্দামতা ঢাকবার জন্যে একটা লজ্জা-নম্র ভাব ধারণ করে, এ যেন ঠিক তাই। মনটা কেমন খারাপ লাগে। সব লজ্জা ঢাকবার জন্যে গভীর ভাবে সে লেখাপড়ায় ডুবে থাকে।

যথাসময় বিভাগীয় স্কলারশিপ নিয়ে ম্যাট্রিকুলেসন পাস করে চাটগাঁ কলেজে আই. এস্-সি ক্লাশে ভর্তি হয় গৌতম। ফার্স্ট-ইয়ারের মাঝামাঝি সে লক্ষ্য করে ক্লাসের একটি ছেলে,—কমল তার নাম—তার দিকে বিশেষভাবে প্রায়ই তাকিয়ে থাকে। কিছুদিন পর গৌতমের পাশেই সে আসন দখল করে বসে এবং ধীরে ধীরে আলাপ জমিয়ে তুলে। গৌতমের বাড়ির সবকিছু জেনে নেয় বিনিময়ে গৌতমকে সে তার কথা বলে। পিতৃ-মাতৃহীন। বড় ভাই রোজগেরে এবং কমলের পড়াশুনোর খরচ তিনিই বহন করেন। দুজনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে।

একদিন টিফিনের সময় দুজন এসে কলেজের পেছন দিকটায় একটা গাছের ছায়ায় বসে। গল্পচ্ছলে কমল হঠাৎ প্রশ্ন করে,—আচ্ছা তুমি, দেশকে ভালবাস?

—হ্যাঁ, বাসি—

—দেশ স্বাধীন হোক, এটা তুমি চাও?—

—হ্যাঁ, চাই—

—কী ভাবে স্বাধীন হবে, ভেবে দেখেছ—

—তেমনভাবে ভেবেছি তা বলব না। তবে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার বাসনা জেগেছিল মনে, কিন্তু পারিনি—

—কেন পারনি ?—

—প্রথমতঃ, স্কুলের গেটে যেদিন ঘোড়-সওয়ারদের আক্রমণ হয়, সেদিন জনতার ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গিয়ে মাথায় জখম নিয়ে হাসপাতালে ছিলাম কিছুদিন। গ্রীষ্মের ছুটির পর স্কুল যেদিন খুলল সেদিনই হেডমাস্টারের নোটিশ পাই, বৃত্তি পাওয়া কোন ছেলে স্কুল বর্জন করলে বৃত্তি তার বন্ধ হয়ে যাবে। জানোই তো লেখা-পড়া শিখতে গেলে আমাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে বৃত্তির ওপর—বলেই লজ্জায় মাথা নত করে চুপ করে যায় গৌতম।

—এতে লজ্জা পাবার কী আছে, গৌতম ? তাছাড়া ওপথে দেশের মুক্তি আসবে না। বৃটিশের মত দুর্ধর্ষ শক্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে আয়ারল্যাণ্ডের পথে যেতে হবে আমাদের—

—সে আবার কী ?

—আমি পারব না সে কথা বুঝিয়ে বলতে। যেতে হবে আমাদের মাস্টারদার কাছে। যাবে ?

—মাস্টারদা ? কে তিনি ?

—তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ে আমাদের প্রয়োজন নেই। শুধু জানি, তিনি আমাদের নেতা—সবাকার মাস্টারদা—

ক্লাসে যাবার ঘণ্টা বেজে উঠে। ধীরে ধীরে সেদিনকার মত দুই বন্ধু ক্লাসের দিকে পা বাড়ায়।

॥ দুই ॥

পরদিন কলেজে কমল বলে, মাস্টারদাকে আমি তোমার কথা বলেছি, তিনি সময় দিয়েছেন কাল সন্ধ্যার পর। মায়ের অনুমতি পাবে তো সন্ধ্যায় বাইরে থাকবার ?

—অনুমতি যে ভাবেই হোক্ আমি নেবো। তার জন্যে তুমি ভেবো না।

—বেশ, তাহলে কাল সন্ধ্যেবেলায় কলেজের গেটে তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করব। কিন্তু একটা কথা,—যেতে হবে একায় এবং তোমার চোখ বেঁধে—রাজী ?

—চোখ বেঁধে কেন ?

—মাস্টারদা'র সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় এটাই আমাদের নিয়ম।

মায়ের অনুমতিটা অতি সহজেই পেয়ে যায় গৌতম। রাতের বিছানায় আকাশ-পাতাল এলোমেলো ভাবনা তার মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। কমল তাকে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে কে জানে ? পাশের ঘরে সুর করে মহাভারত পড়ছেন মা। এটাই মার চিরন্তন অভ্যাস। শোবার আগে হয় 'মহাভারত' নয় 'রামায়ণ' থেকে খানিকটা না পড়ে কিছুতেই বিছানায় যাবেন না তিনি। একটানা মায়ের সুরটা ঘিরে কাটা কাটা ভাবনার সুতোগুলো যেন তার মনটাকে জড়িয়ে ফেলে। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে গৌতম। কখন যেন ঘুমিয়েও পড়ে।

সকালে ঘুম ভাঙ্গে মায়ের ডাকে। বেলা প্রায় আটটা। মা বলেন,—এত বেলা তো তুই কখনো করিস্ না? শরীর ঠিক আছে তো?

—সব ঠিক আছে মা, তুমি কোন চিন্তা ক'রো না। যা গুমোট গেছে কাল রাতে, তাই শেষ রাতের ঘুম ভাঙ্গতে একটু বেলা হয়ে গেল।

—যা', তাড়াতাড়ি হাতমুখটা ধুয়ে আয়। চা তৈরী।

কমল কলেজে আসেনি। কী জানি সন্ধ্যার এন্‌গেজমেণ্ট রাখবে কী না। একটু চিন্তিত মনেই কলেজ থেকে বিকেলে বাড়ি ফেরে গৌতম।

কমল কিন্তু যথাসময় কলেজের গেটে হাজির। গৌতম আসতেই বলে, 'এক্কা রেডি, চ', আর দেরি নয়—এক্কায় উঠেই গৌতমের চোখ দুটো রুমাল দিয়ে বেঁধে দেয় কমল। অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে একসময় গাড়িটা থামে। ভাড়া মিটিয়ে গৌতমের হাত ধরে এগিয়ে চলে কমল। অবশেষে সন্তর্পণে একটা বেঞ্চের ওপর বসিয়ে বলে,—বোস্, আমি এক্ষুণি আসছি—।

মিনিট পাঁচেক পর মানুষের পদধ্বনি শোনা যায়। ওপর থেকে কারা যেন নামছে। গৌতম যেখানে বসেছিল তারই সামনা-সামনি এসে দাঁড়িয়ে যায়। গম্ভীরস্বরে কে একজন বলেন. এবার চোখ খুলে দিতে পারো।

প্রথমটা গৌতম কিছুই দেখতে পায় না। সব অন্ধকার। ঘরের এককোণে একটা কেরোসিনের বাতি মিটমিট করে জ্বলছে। তাতে অন্ধকারটা যেন আরও জমাট বেধে যায়। একজন বাতিটা আড়াল করে একটা চেয়ার টেনে বসেন। অন্ধকারে চোখ দুটো ততক্ষণ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। গৌতম দেখে সামনে যিনি বসেছেন তাঁর প্রশস্ত ললাট, গভীর একজোড়া চোখ আর দৃঢ় প্রত্যয়ব্যঞ্জক দুটি ঠোঁট।

মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে গৌতম স্তব্ধ হয়ে যায়। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা সরীসৃপ যেন নেমে আসে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে সেই মূর্তি গৌতমের দিকে। মনে হয়, সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মোহনী আকর্ষণে তার মনের অব্যক্ত প্রশ্নগুলো যেন আস্তে আস্তে সেই আয়নার মত প্রশস্ত ললাটে প্রতিফলিত হয়ে উঠছে। দু' একবার কথা বলবার চেষ্টায় গৌতমের ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে থেমে যায়।

অবশেষে ছায়ামূর্তি নিজেই প্রশ্ন করেন—দেশকে তুমি ভালবাস ?

—হ্যাঁ, বাসি।

—দেশের জন্যে প্রাণ দিতে পার ?

—পারি।

—প্রয়োজন হলে মরবার আগে মারতে পারবে ?

হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পায় গৌতম। অন্তরাত্মা তার বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়। দেশকে ভালবাসার মূল্য হিসাবে যদি মরতে হয়, সে প্রস্তুত, কিন্তু মারবার কথা আসছে কেন ? কী একটা জবাব দিতে যাবে, তার আগেই ছায়ামূর্তি প্রশ্ন করে আবার,—কী, চুপ কেন ? জবাব দাও।

—মরতে পারি, কিন্তু মারব কেন ? সাহস করে মনের কথা বলতে পারায় গৌতম বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

অপরপক্ষ থেকে জবাব আসে, না মেরে মরায় কোন পৌরুষ নেই বলে—

—কাকে মারবার কথা বলছেন ? প্রশ্ন করে গৌতম।

—দেশের যারা শত্রু, সে সাদাই হোক্ বা কালোই হোক্—

—কিন্তু গান্ধীজী তো বলেন—ভালবাসা দিয়েই শত্রুকে জয় করতে হবে, হিংসা দিয়ে নয়।

—সে চেষ্টা তো করেছেন তিনি। তাঁর ডাকে দেশবাসী

সাড়াও দিয়েছিল অকুতোভয়ে। কিন্তু ফল কিছু পাওয়া গেছে কী? নিরস্ত্র জনতার বুকের ওপর দিয়ে ঘোড় সওয়ার পুলিস নির্মমভাবে দলিত-মথিত কবে এগিয়ে যায়নি কী? করেনি কী তাদের উন্মুক্ত বুকেব ওপর রাইফেল-এর গুলিবর্ষণ? দেয়নি কণ্ঠে 'বন্দে মাত৺ম্' ধ্বনি স্তব্ধ করে?

উন্নত ললাট কুঞ্চিত হয়ে উঠে। তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে যেন অগ্নিবর্ষণ হয়। দাঁত দিয়ে অধবোষ্ঠ কামড়াতে থাকে। গৌতমের স্মৃতিপটে ভেসে উঠে স্কুলের গেটের সামনের দৃশ্য। ধূলিশয্যায় শায়িত ছাত্রদের বুকেব ওপর দিয়ে ঘোড় সওয়ার পুলিসের অমানুষিক অভিযান। তবে কী অস্ত্রেব জবাব অস্ত্র? মরার জবাব মারা?

প্রদীপটা হাওয়ায় দুলছে, আব তার সাথে দেয়ালে দুলছে দুটি ছায়া। গৌতমের মন কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়। একটা চাপা নৈঃশব্দ ভঙ্গ করে আবার একটা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ভেসে আসে—বল, তোমার আর কিছু বলবার আছে?

গৌতমের গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। অনেক কষ্টে একটু কেশে নিয়ে বলে—সবই সত্যি; কিন্তু আজকের সত্যি কাল তো মিথ্যে হয়ে যেতে পারে।

—মানে? তুমি কী বলতে চাও, আজকের পশু, কাল মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারে? তা হয় না, গৌতম। ইতিহাসই তার প্রধান সাক্ষী। আয়ারল্যাণ্ডে ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ম্যাক্‌সুইনী আমরণ অনশন ব্রত করেছিলেন, আমাদের গান্ধীজীরই মত। ইংরেজ মরতে দিয়েছিল তাঁকে, স্বাধীনতা দেয়নি। পরবর্তীকালে আইরিশ রিপাব্লিকান পার্টির অস্ত্রবলের কাছে ইংরেজকে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। পরাধীন আয়ারল্যাণ্ড আজ স্বাধীন রাষ্ট্র। বলপ্রয়োগ ছাড়া কোন পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে তার নজির ইতিহাসে নেই। এমন কী,

আজকের দুর্ধর্ষ রাষ্ট্র আমেরিকার ইতিহাসও তাই বলে। ভারতও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। সুতরাং মরবার আগে মারবার প্রয়োজন হবে আমাদেরও। পারবে ?—

কোন জবাব খুঁজে পায় না গৌতম। একটা মন তার বলতে চায়, পারব। আরেকটা মন বলে,—ও পথ বেছে নেবার সময় তোমার এখনো আসেনি,—সাবধান গৌতম।

অন্তর্ভেদি দৃষ্টি নিয়ে ছায়ামূর্তি তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর স্মিতহাস্যে বলেন, মন তোমার প্রস্তুত হয়নি এখনো। আবার একদিন এসো—বলেই ডান হাতটা তুলে কাকে যেন ইঙ্গিতে কী বলেন।

সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে তাব চোখ দুটো রুমাল দিয়ে আবার বেঁধে দেওয়া হয়।

এক্কাতে যে ব্যক্তি তার পাশে বসে, অনুভবে বোঝে সে কমল নয়। পথে কয়েকবার কথা বলবার চেষ্টা করেও কোন সাড়া পায়নি গৌতম। বাড়ির সামনে এসে গৌতমের চোখ খুলে দিয়ে তড়াক করে পেছন ফিরে নেমে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায় সে। একবার মনে হয়, স্কুলের গেটে মাটিতে শায়িত ছেলেদের বুকের ওপর দিয়ে যে ছেলেটি ঢুকতে চেষ্টা করেছিল এ যেন সেই। সদর মহকুমা হাকিমেব ছেলে দিলীপের সঙ্গে তার যেন অপূর্ব মিল। অথচ বর্তমান পরিবেশে দিলীপের উপস্থিতি যেন কল্পনা করা যায় না। গাড়োয়ানকে ভাড়াব কথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই গাড়ি ঘুরিয়ে সে-ও চলে যায়।

হতবাক গৌতম ধীরে ধীরে বাড়ির ভেতর ঢোকে।

॥ তিন ॥

রাত তখন ন'টা বেজে গেছে। সাড়া পেয়ে পাশের ঘর থেকে মা প্রশ্ন করেন, গৌতম ফিরেছিস্?

—হ্যাঁ, মা।

—তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নে। রাত অনেক হ'ল—

খাওয়া সেরে পড়তে বসে। বইয়ের পাতা খোলাই থাকে। মন বসে না। শুধু কানে ভেসে আসে মাস্টারদার ছোট্ট দুটি কথা,—মন তোমার প্রস্তুত হয় নি এখনও। আবার এসো—

প্রথম যৌবনের অঙ্কুরোদ্গম পৌরুষের মুখে এ কথা দুটো যেন চাবুক মারে। নাক মুখ গরম হয়ে ওঠে। দুম করে বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। কালই কমলের সঙ্গে এ অপমানের একটা ফয়সালা করতে হবে। বুঝিয়ে দেবে তাকে দেশের কাজে মারার চেয়ে মরবার সাহস কিছু কম নয়।

পরদিন কমল কলেজে আসেনি। অভ্যাসমত টিফিনের সময় কলেজের পেছন দিক্‌কার গাছটার কাছে যেতেই দেখে কমলের জায়গাটা দখল করে বসে আছে দিলীপ। মুখ ঘুরিয়ে ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়ায় গৌতম।

—কী ভাই, আমি কি অস্পৃশ্য? এসো—

—তুমি এখানে কেন?—

—কমলই পাঠিয়েছে তোমার সঙ্গে পরিচয়টা একটু ঝালিয়ে নিতে। একসঙ্গে কাজ করতে হলে একজনের দিকে আর একজন মুখ ফিরিয়ে থাকলে তো চলবে না ভাই। এস, বস।

অগত্যা গৌতমকে বসতেই হয়। মুখ গুম্ করে বসে থাকে।

দিলীপই মুখ খোলে—কাল সন্ধ্যায় মাস্টারদা'র কথাগুলো একটু ভেবে দেখেছ কী ?

—না, ভাবিনি। কেন যে হিংসার পথে যেতে হবে তা আমার কাছে এখনও পরিষ্কার নয়—

—সেটা মাস্টারদা'ই বুঝিয়ে বলবেন।—আওয়ার্স ইজ্ টু ডু এ্যাণ্ড, ডাই, নট্ টু কোশ্চেন্ হোয়াই ?—

—প্রশ্ন না করে শুধু শুধু নরহত্যাই বা কবব কেন ?—

—কথায় বলে, আগুনের ও শত্রুর শেষ রাখতে নেই, তাই।

—তা'ছাড়া, সবকিছু বিচারের ভার একজনের হাতেই ছেড়ে দেব কেন ?

—'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' হয়, তাই যুদ্ধ অহিংসই হোক বা স-হিংসই হোক্ একজনের হাতে চরম সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে না দিলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। জয় হবে দুঃসাধ্য। তাই অহিংস যুদ্ধেও গান্ধীজীর ওপরই চরম সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দিয়েছে কংগ্রেস।

—কিন্তু অহিংস যুদ্ধে যে মানুষ জনতার বুকের ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে দ্বিধা করে না, হিংসাত্মক যুদ্ধে তার এত আগ্রহ কেন ?

দিলীপকে সরাসরি আক্রমণ করবার লোভ দমন করতে পারে না গৌতম।

দিলীপ মোটেই অপ্রস্তুত হয় না। বলে, যখনকার কথা বলছ তখন কোন সংগ্রাম সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণাই ছিল না আমার। পরবর্তীকালে কমল আব মাস্টারদা'র সান্নিধ্য পাবার সৌভাগ্য মিলে যায়। বুঝতে পারি দেশের জন্যে জীবনদান করবার অর্থ কী ? প্রয়োজনে মরবার আগে মারবারই বা তাৎপর্য কী ? আজ না হোক্ একদিন তুমিও বুঝতে পারবে সবই। যদি কমল ও মাস্টারদা'র সঙ্গে সংযোগ রেখে চল।

কলেজের ঘণ্টা বেজে ওঠে। ক্লাসের দিকে পা বাড়ায়।

ক্লাসে বসে প্রফেসরের কথাগুলো যেন কানে ঢুকছে না গৌতমের। শুধু ভাবে, আমি কেন কমল বা দিলীপের মত মন ঠিক করতে পারছি না। কোথায় আমার বাধা? দিলীপ যদি পারে, আমি কেন পারব না?

ছুটির পর দিলীপের সঙ্গ নেয়! হাঁটতে হাঁটতেই প্রশ্ন করে, আচ্ছা দিলীপ, তুমি যে মাস্টারদা'র দলে যোগ দিয়েছ, একথা তোমার বাবা-মা জানেন?

—না, এসব কথা কাউকে বলতে নেই।

—কিন্তু পুলিস তো একদিন টের পাবেই। তখন তোমার বাবার চাকরি যাবে না?

—হয়তো যাবে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই যাবে।

—যদি তখন তুমি পথভ্রষ্ট হও?—

—পথভ্রষ্ট হব কিনা জানি না তবে এটা জানি যে পথভ্রষ্ট হলে ঐ কমলই হয়তো আমাব বুকে পিস্তলেব গুলি চালাতে দ্বিধা করবে না।

—সেই ভয়েই কি পথটা তুমি আঁকড়ে থাকতে চাও—

দিলীপের চোখ ছ'টো দপ করে জ্বলে ওঠে। বলে,—এ প্রশ্নের জবাব শুধু মুখের কথা দিয়ে বোঝানো যাবে না। কাজের ভেতর দিয়ে এর জবাব দিতে হয়। সেদিন এখনো আসেনি। যেদিন আসবে আমি নিজেই তার জবাব নিশ্চয়ই দেব। বলেই সে হন্ হন্ করে অন্য পথ ধরে।

কিছুক্ষণ গৌতম অপসৃয়মান মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ কোথা থেকে কমল এসে হাজির হয়। বলে কি দেখছিস, গৌতম।

—মন আমার ঠিক হয়ে গেছে কমল, মাস্টারদা'র কাছে নিয়ে চল।

—কিন্তু একজামিন ?

—একজামিন ? তার সঙ্গে এ ব্যাপারের সম্পর্ক কি ?

—মাস্টারদা' বলেছেন সামনে তোর পরীক্ষা। ভাল রেজাল্ট করতে হবে এবং স্কলারশিপ্ পেতে হবে। তারপর তিনি তোর সঙ্গে দেখা করবেন। তার আগে নয়।

অনন্যোপায় গৌতম লেখাপড়ায় মন ডুবিয়ে দেয়। তার একমাত্র সাথী হয় পাঠ্যপুস্তকগুলো।

মাস ছয়েক পর রেজাল্ট বেরুলে দেখা যায়, গৌতম চট্টগ্রাম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

একদিন কমল এসে বলে—চল এবার মাস্টারদা'র ডাক এসেছে।

—চোখ বাঁধাবাঁধি করলে আমি কিন্তু যাব না, কমল—।

—না, এবার আর বাঁধবার দরকার হবে না।—

সন্ধ্যার পর গৌতমকে মাস্টারদা'র সামনে হাজির করে দেয় কমল। নিজে আসন গ্রহণ করে গৌতমকে বসতে বলেন মাস্টারদা। স্থির দৃষ্টে তার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে প্রশ্ন করেন—কি করবে এবার ঠিক করেছ ?

—ডাক্তারি পড়ব ভাবছি—

—ডাক্তারি কেন ?—

—আর্তের সেবার সুযোগ পাব বলে—

—দেশের সেবা কি আর্তের সেবা নয় ? বিশেষ করে পরাধীন দেশে ?—

—মানুষ নিয়েই যদি দেশ, তা'হলে আর্ত মানুষের সেবা কি প্রকারান্তরে দেশের সেবা নয় ? বিশেষ করে সে মানুষ যদি হয় পীড়িত ?

দেবী সরস্বতী যেন গৌতমের কণ্ঠে ভর করেছেন। মাস্টারদা'র সামনে বসে একটুও সংকোচবোধ করছে না সে। কথার পৃষ্ঠে কথা

বলতে একটুকুও বাধছে না আজ। পরম তৃপ্তির সঙ্গে মাস্টারদা বলেন,—চমৎকার। হ্যাঁ, তুমি পারবে।

কি পারবে তা' বুঝতে না পেরে একটা প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকায় মাস্টারদা'র দিকে। তিনি বলেন,—আমাদের মেডিকেল কোরের ভার নিতে পারবে তুমি।

—কিন্তু সে তো চার পাঁচ বছর পরের কথা। আপাতত আমাকে আর কোন কাজের ভার দেবেন না?

—না, তাতে বিপদ আসতে পারে। নির্দিষ্ট কাজের জন্যে তৈরি হওয়াই এখন তোমার প্রধান কাজ।

রাতে খেতে বসে কথাটা মাকে বলে, গৌতম। সে ডাক্তারি পড়বে। ঢাকা মিট্‌ফোর্ড মেডিকেল স্কুলের খুব নামডাক। সেখানেই পড়বার ইচ্ছে তার।

—এখানেও তো মেডিকেল স্কুল রয়েছে। ঢাকা কেন?—ধরা গলায় বলেন মা।

—ঢাকার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, মা।

—তোকে ছেড়ে আমি যে থাকতে পারব না, বাবা—অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, মা।

—কাঁদছো কেন মা—ব্যথিত স্বরে বলে গৌতম,—তুমি কি ভেবেছ একা এখানে তোমায় ফেলে রেখে আমি চলে যাব? আমার সঙ্গে তুমিও যাবে।

—তুই থাকবি হোস্টেলে মেসে। আমি থাকব কোথায়?—

—সে ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি। জানো তো, দিলীপের বাবা মাস চারেক হয় ঢাকা বদ্‌লি হয়ে গেছেন। দিলীপকে আমি চিঠি দিয়েছি মিট্‌ফোর্ডের কাছাকাছি আমাদের জন্যে ছোট্ট একটা বাসা যেন ভাড়া করে রাখে।

—উঃ, এতো কাণ্ড করেছিস্ তুই, আর আমাকে একটুও জানাসনি—

—আগে থেকে জানালে যদি বাগড়া দাও। তাই সব ঠিক করে তোমাকে জানাব ভেবেছিলাম।

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু এবাড়িটা?

—এ বাড়িটার জন্যে একজন ভাড়াটে ঠিক হয়েছে, মাসিক পঁচিশ টাকায়। ও টাকায় আমাদের ঢাকার বাড়িটার ভাড়া মিটে যাবে।

সবিস্ময়ে গৌতমের দিকে একটু তাকিয়ে মা হেসে ফেলেন, বলেন, বাব্বা! তুই যে এখুনি পাকা হিসেবী হয়ে উঠেছিস্, এবার একটা বউ আনব।

—অর্থাৎ, আমার মাথাটা খাবে। ওসব কথা ডাক্তার হবার পর, এখন নয়।

যথাসময় ঢাকার পথে চাঁদপুর ঘাটে মাকে নিয়ে গৌতম স্টিমারে চেপে বসে। শেষরাতের আঁধার তখনো কাটেনি।

ধীরে ধীরে সে আঁধার কেটে উষার আলো ফুটে ওঠে। স্টিমারের আশে-পাশে নদীর বুকে ছোট ছোট ডিঙ্গিগুলো এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। মালবাহী কয়েকটা বড় নৌকাও মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছে মাথায় সাদা রঙের পাল খাটিয়ে। উদীয়মান সূর্যের আলোটা নদীর জলে চিক্‌মিক্ করে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়! দোতলার ডেকের রেলিং ধরে গৌতম চারিদিকে তাকায়। এ যেন নদী নয়, সমুদ্র। ভূগোলে মেঘনা নদীর নাম সে পড়েছে। সে যে এত বড় তা ভাবেনি, কোনদিন। দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত শুধু জল—আর জল।

চাঁদপুর থেকে উত্তর দিকে এগুলে সাত আট মাইল দূরেই মেঘনা আর পদ্মার সঙ্গম। অপূর্ব সে দৃশ্য, অনির্বচনীয় তার অনুভূতি। মেঘনার নীল জলে আছড়ে পড়ছে পদ্মার শুভ্র জলরাশি। ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণের বুকে যেন রক্তবর্ণা শ্রীরাধিকা ঢলে ঢলে পড়ছেন। খরস্রোতা পদ্মা তার সমস্ত আবেগ নিয়ে সেই নীল বারিধিতে মিশে যেতে চায়। কিন্তু নীল মেঘনা তার দুর্ভেদ্য বন্ধ প্রাচীর নিয়ে প্রতি-

রোধ করে চলেছে সেই স্রোতের দুর্বার গতিকে। তাই পদ্মার শুভ্রতা মেঘনার নীলিমায় এতটুকুও দাগ কাটতে পারে না। শ্রীরাধিকার শাশ্বত বিরহের বেদনা নিয়ে তরঙ্গায়িত পদ্মা নীল মাধবের বুকের ওপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে যেন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে গৌতম সেই নীল আর সাদার গভীর তরঙ্গলীলার দিকে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে—প্রকৃতি তুমি এত ভয়ংকরী, অথচ এত সুন্দরী!

বেলা দশটায় ঢাকা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নামতেই দিলীপ এসে সামনে দাঁড়ায়। মাকে প্রণাম করেই বলে, আপনাদের জন্যে আর্মানিটোলায় একটা দু'কামরার ছোট্ট বাড়ি ঠিক করে রেখেছি। মাসিক ভাড়া বিশ টাকা। একটা ঠিকে ঝিও রাখা হয়েছে, সে সকাল থেকেই ঘরদোর পরিষ্কারের কাজে লেগে গেছে।

মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন,—আমি জানি তুমি যখন রয়েছ কোন অসুবিধে হবে না।

স্টেশন গেটটা পার হয়ে রাস্তায় পা বাড়াতেই ভীমরুলের মত চারদিক থেকে গৌতমদের ঘিরে ধরে ঘোড়াগাড়ির এক পাল গাড়োয়ান। সবাই প্রায় একসঙ্গে হাঁকে,—কই যাইবেন, বাবু?

—আর্মানিটোলা—বলতেই কুলির মাথায় বোঝাটা টেনে ধরে বলে,—আহেন, আহেন। পংখীরাজ ঘোড়া, একেবারে উড়াইয়া লইয়া যামু, আহেন।

—আগে ভাড়াটা কত বল,—

এক টাকা বলতেই গৌতম অপর একজনের দিকে তাকায়। সে বলে উঠে—ঐডা মরা ঘোড়া বাবু, মরা ঘোড়া। দেহেন না, কেমন হারগিলার মত হাড় বাইরইয়া রইছে—

প্রথম গাড়োয়ানটা খেঁকিয়ে ওঠে—এই হালার পো হালা, মু হামলাইয়া কথা ক,—তর ঘোড়াটা কন্ জংগলের ঐরাবত রে—

গোলমাল দেখে দিলীপ এগিয়ে এসে বলে,—ওসব বাজে কথা রাখ, মিঞা। চাইর আনায় যাবা?

গাড়োয়ানটা বুঝতে পারে এ বাবু সেয়ানা। ঢাকার হালচাল জানেন। তবু চোখ কপালে তুলে বলে, চাইর আনা, কন কি বাবু, চাইর আনা? যা কইছেন, কইছেন, আর কইয়েন না, ঘোড়ায় হাসবো শুনলে।

—কুত্তার গাড়ি লিবেন, কুত্তার?—ঐ দেহেন, ঐ যে,—বলেই রাস্তার ওপারে লোহার চাকাওয়ালা চৌকা একটা টিনের গাড়ির দিকে আঙুল দেখায়। গৌতম তাকিয়ে দেখে ওটা মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা টানার একটা ছ্যাকরা গাড়ি। তাই থেকে কি একটা পচা পদার্থ টেনে বের করে দু' তিনটা ঘেও কুকুর কামড়াকামড়ি-খেয়োখেয়ি করছে।

গৌতম কি বলতে চায়, তার চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। ওকে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে আসে দিলীপ,—ওসব আমাদের দেখাতে হবে না, মিঞা। বাজে কথা ছাড়ো। আট আনায় যাবে তো চলো, নইলে পথ দেখো।

গাড়োয়ান রাজী হয়ে যায়। গাড়িতে উঠে দিলীপ বলে। এদের বলে কুট্টি। এক আদিম জাত। জাতে মুসলমান। এমন কথার ফুলঝুরি, সবাইকে হাসিয়ে মারে।

মা বলেন,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি মজা দেখছিলাম। সত্যি, রাগ হলেও না হেসে উপায় নেই, ওদের কথায়।

নতুন বাড়িতে গুছিয়ে বসতে দিন দুই চলে যায়। ইতিমধ্যে গৌতম মিটফোর্ডে ভর্তি হবার ব্যাপারটাও চুকিয়ে নিয়েছে। এক রবিবার দিলীপ এসে বলে,—চ' একবার বুড়িগঙ্গার পাড়টায় খানিক বেড়িয়ে আসি। সন্ধ্যাবেলায় খুব ভাল লাগবে।

খোঁচা দিয়ে গৌতম বলে, যতই বলিস না কেন, চাটগাঁ শহর ঢাকার চেয়ে অনেক সুন্দর।

—অর্থাৎ, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী,' এই তো, তোর দেশ চাটগাঁ, আমার দেশ ঢাকা। তাই তোর কাছে সুন্দর চাটগাঁ,

আমার কাছে ঢাকা। বৃহত্তর জন্মভূমিকে উদ্দেশ করে যদিও কবি জন্মভূমিকে স্বর্গের শ্রেষ্ঠ বলেছিলেন এবং আমরাও অসহযোগ আন্দোলনের সময় সেই বৃহত্তর জন্মভূমির উদ্দেশ্যেই অনেক গান গেয়েছি, তবু দেখ আমরা কেমন যেন যার যার ছোট্ট গণ্ডিটুকুর বাইরে বেরিয়ে আসতে পারিনে।—যাক্ সে কথা, এখানে যখন পাহাড় নেই, কর্ণফুলি নেই, তখন বুড়িগঙ্গাই আমাদের সম্বল।

গৌতম বুঝতে পারে দিলীপ মনে একটু আঘাত পেয়েছে। অনুতাপের সুরে বলে—কিছু মনে করিস্‌নে, ভাই। আমি ওরকম কিছু ভেবে কথাটা বলিনি—

দিলীপ কিন্তু আপন মনেই বলে চলে, আমি স্বীকার করি, পাহাড়, টিলা, আর তারই সঙ্গে কর্ণফুলির আঁকাবাঁকা গতি সব কিছু মিলে চাটগাঁকে দিয়েছে তার অনির্বচনীয় রূপ। কিন্তু একই প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ চোখে না দেখলে তার রূপবৈশিষ্ট্য বোঝা যায় না, গৌতম। কর্ণফুলির বুকে সাম্পানগুলো যেন পানকৌড়ির মেলা, আর বুড়িগঙ্গার বুকে বজরাগুলো যেন রাজহাঁসের মহোৎসব। সেই মহোৎসব দেখবার জন্যেই তোকে আজ আহ্বান জানাচ্ছি। চ, আর দেরি নয়। সন্ধ্যে হয়ে এলো—নিজেকে সামলে নিয়ে বলে দিলীপ।

স্ট্রাণ্ড রোড-এ খানিকক্ষণ বেড়িয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় বিশ্রামের জন্য বসে দুই বন্ধু। বুড়িগঙ্গার বুকে ধীরে ধীরে ভেসে বেড়ায় আলো ঝলমল বজরার মিছিল। ক্ষণে ক্ষণে বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসে গানের সুর আর নূপুরধ্বনি। আধো আলো আধো অন্ধকারের এক মায়াপুরী যেন।

—কেমন লাগছে,—হঠাৎ প্রশ্ন করে দিলীপ—

গৌতম পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে নতুন সজ্জায় সজ্জিত বুড়িগঙ্গার রূপ মাধুর্যের দিকে। ধরাগলায় বলে, মনে হয় প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি শহর যেন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর বৈচিত্র্য নিয়ে নানা রঙে সাজিয়ে রেখেছে ধনধান্যে পুষ্পে ভরা শস্যশ্যামল আমাদের এই

মাতৃভূমিকে। সেই রঙ-এর তুলি দিয়ে নতুন করে আঁকতে হবে, গড়ে তুলতে হবে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষকে। মাস্টারদা'র নেতৃত্বে তাই যেন পারি আমরা।

অকস্মাৎ একটা কল-কোলাহলে মোহ ভেঙে যায় দুই বন্ধুর। চেঁচামেচি-চীৎকার,—কোথাও আগুন লেগেছে যেন। পেছন ফিরে দেখে নিকটে কোথাও সত্যি আগুন লেগেছে—তার লেলিহান জিহ্বার আভাস দেখা যায়। স্ট্যাণ্ড-এ ভ্রমণরত সবাই সেদিকে ছুটছে। দুই বন্ধুও ছুটে যায়।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে কামরার খোলা জানালার দিকে তাকান ডাঃ চৌধুরী। আগুন নয়। তাঁর চোখের সামনে ফুটে ওঠে আলো ঝলমল একটা স্টেশন। ধীরে ধীরে ট্রেনটা শেডে ঢাকা বিরাট একটা প্লাটফর্ম-এ দাঁড়িয়ে যায়। নীল জামাপরা একটা লোক হেঁড়ে গলায় হেঁকে চলেছে,—বিলাসপুর—বিলাসপুর—।

॥ চার ॥

বিলাসপুর স্টেশন থেকে ট্রেনটা আবার ঝাঁপ দেয় উন্মুক্ত প্রান্তরে। অন্ধকার প্রান্তরের বুকে অজগর সাপের মত আবার ছুটে যেন নতুন শিকারের সন্ধানে। বার্থটায় আবার গা এলিয়ে দেন ডাঃ চৌধুরী।

মনে পড়ে সেদিন রাতে আর্মানিটোলার বাড়িতে গৌতমের কিছুতেই ঘুম আসে না। শুয়ে শুয়ে ভাবে, ঢাকায় আজ যেমন আগুন নেভাতে ছুটে যায় দুই বন্ধু, চাটগাঁয়ও তেমনি একদিন আগুন নেভাতে ছুটেছিল রিয়াজুদ্দি বাজারে। সঙ্গে ছিল দিলীপ ছাড়াও কমল এবং আরও অনেকে। মাস্টারদা নিজে তাদের দিয়ে গিয়েছিলেন। আজ দিলীপ ছাড়া আর কোন সাথী নেই তার।

পরদিন বিকেলে মিট্‌ফোর্ড থেকে ফিরেই মাকে বলে, মা আমি একটু দিলীপদেব' বাড়ি ঘুরে আসি। চা' খাওয়াটা ওখানেই সেরে নেবো। মা শুধু বলেন, ফিরতে বেশি রাত করিস নে যেন।

দিলীপ তখন কলেজ থেকে ফিরে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে। গৌতমকে দেখে খুশি হয়। বেয়ারাকে বলে কিছু খাবার আর চা নিয়ে আয়।

চা খেতে খেতে স্মিতহাস্যে বলে দিলীপ,—এখন থেকে তোদের বাড়িটাই আড্ডাখানা করলে কেমন হয়?

—আড্ডাখানা মানে?

—গোর্কির মাদার পড়েছিস?

—না—

দিলীপ তার পড়ার ঘর থেকে একটা বই এনে গৌতমের হাতে

দেয়। বলে—এটা পড়িস্, তাহলেই বুঝতে পারবি আড্ডাখানা বলতে আমি কি বলতে চাই।

—নামটা পড়ে নেয় গৌতম—গোর্কির "মাদার"।

দিলীপ বলে, শেষ করতে তোর তিন চারদিন লাগবে হয়তো। এ কদিন তোকে ডিস্টার্ব করবো না। যাব সামনের রোববার সকালে।

বইটা নিয়ে দিন কয়েক মসগুল হয়ে থাকে গৌতম।

মা জিজ্ঞাসা করেন, অনেকদিন হয়ে গেল দিলীপ আসছে না কেন রে, গৌতম?

আসবে, মা, আসবে, কোন চিন্তা করো না—

—কাছেই তো থাকে। একদিন না হয় তুই-ই যা না। খবরটা নিয়ে আয়।

গৌতম যদিও জানে সামনের রোববারই দিলীপ আসবে তবু সে কথা চেপে গিয়ে কৌতুকের সুরে বলে,—কেন, একা আমাকে নিয়ে বুঝি তোমার মন ভরে উঠছে না, মা?

—শুধু আমি কেন, তোর জন্যেও বলছি। সত্যি করে বল তোরও কী ভাল লাগছে? হাসি মুখে জবাব দিয়ে মা কী একটা কাজে পাশের ঘরে চলে যান।

বইটা আবার তুলে নেয় গৌতম। কিন্তু পড়া যেন আর এগোয় না। থেকে থেকে চোখের সামনে ভেসে ওঠে গোর্কি অংকিত "মাদার"-এর জীবন্ত ছবিটা। পৃথিবীতে হাজারো জাতির বাস, কিন্তু সেখানে মায়েদের কোন জাত নেই। ভারতীয় মা, ব্রিটিশ মা, জার্মান মা, ফরাসী মা, রাশিয়ান মা সব মায়েরই জাত এক। সন্তানের আনন্দে সবাই আনন্দিত, সন্তানের বিপদে সবাই তাঁরা আতংকিত, সন্তানের দুঃখে সবাই তাঁরা ব্যথার ব্যথী। তাই দেখি, বিভিন্ন ভাষায় "মা" ডাকে অদ্ভুত একটা ছন্দের মিল। মা, আম্মা, মাম্মি—কে বলবে এই ডাকে একই ভাষার রূপান্তরের ধ্বনি

নেই? গোর্কির সৃষ্ট "মা"-কে ঘিরে রাশিয়ায় বিপ্লবের যে কেন্দ্রবিন্দু গড়ে উঠেছিল, গৌতম কল্পনা করে—তার মাকেও ঘিরে হয়তো গড়ে উঠবে ভারতের একটা মুক্তি-সেনার দল। একথা ভাবতেও তার মনে কেমন একটা আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। বুঝতে পারে দিলীপ কেন বলেছিল তাদের বাড়িটাকেই আড্ডাখানা করে তুলবে। এই ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু তারই মা। মাতৃগর্বে বুকটা তার ফুলে ওঠে।

প্যাভেল ও তার বন্ধুদের কথাবার্তা আর আলোচনার ভেতর দিয়েই তার মা যেমন সচকিত হয়ে উঠেছিলেন সর্বহারাদের ব্যথা-বেদনার শরিকরূপে, গৌতম বা তার বন্ধুরা তেমন কোন আলোচনা আজও তার মায়ের সামনে করেনি। এমন কি গৌতম নিজেও তো তাদের গোপন কথা আজও মাকে বলেনি? অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়। দিলীপ আড্ডাখানার চটুল কথার ভেতর দিয়ে তার ভুল ধরিয়ে দিয়েছে আজ। মনে মনে তাকে অসীম ধন্যবাদ জানায় গৌতম। মুখে ডাকে—মা—

ওঘর থেকে মা সাড়া দেন। গৌতম বলে, একবার এদিকে আসবে?

হাত মুছতে মুছতে মা এসে সামনে দাঁড়ান। গৌতমের বেদনাভরা মুখটার দিকে তাকিয়ে বলেন,—তোর শরীরটা কী ভাল নেই গৌতম? বলে তাঁর হাতটা ছেলের কপালে ঠেকান।

গৌতম চোখ বুজে উপভোগ করে মায়ের হাতের শীতল স্পর্শ। আর এই অনুভূতির সঙ্গেই বুকে তার কে যেন হাতুড়ি পিটতে থাকে। ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দেয়, না মা অসুখ করেনি। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, বসো। মা খাটটায় বসে পড়েন। গৌতম চেয়ার ছেড়ে মায়ের গা ঘেঁষে বসে।

বুকে হাতুড়ির ঘা-টা সামলে নিয়ে গৌতম বলে, আজ এমন একটা খবর তোমায় জানাব, যা তোমারই কল্পনার বাইরে—

—উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মা বলেন, তুই কোন "কিন্তু" করিস নে, বাবা। আমায় খুলে বল যা বলবার।

একটু কেশে নিয়ে ধীবে ধীবে একটানা বলে যায় সব কথা। কমলের সঙ্গে চাটগাঁয় প্রথম আলাপেব দিন থেকে আজ পর্যন্ত যা' ঘটেছে, মাস্টারদা, কমল, দিলীপ সবার কথা। কথা শেষে মা যেন গুম্ হয়ে বসে থাকেন। ওদিকে পড়ার টেবিলের ওপর টাইম-পিস্‌টা টিক্ টিক আওয়াজ করে চলেছে অনর্গল। অপলক দৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে আছেন মা। ঘরের ভিতর যেন একটা বদ্ধ হাওয়া বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তারই উষ্ণ চাপ সইতে না পেরে গৌতমই প্রশ্ন করে, রাগ করলে মা?

চাপা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গৌতমের দিকে মুখ ফেরান। গৌতম দেখে দু' চোখে তাঁর অশ্রুকণা চিক্‌চিক্ করছে। গৌতম হঠাৎ মায়ের কোলে মুখ লুকোয়। ছেলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেন,—কেন আমাকে এতদিন একথা জানাসনি, বাবা?

—এদ্দিন না জানানোটা অন্যায় হয়েছে বুঝেই আজ তোমায় সবকথা বললাম—মুখ তুলে বলে গৌতম—কিন্তু কাজটা কি অন্যায়, মা।

—দশের আব দেশেব কাজে কোনটা অন্যায়, আর কোনটাই বা ন্যায় সেসব ভাববার কোন সুযোগ আমার আজও হয়নি, গৌতম। তোব বাবা চলে যাবার পর থেকে তুই ছাড়া আর কোন চিন্তাই আমি করিনি, এ্যাদ্দিন। তবে যে পথে পা বাড়িয়েছিস্ তাতে যে অনেক বিপদ, বাবা—

—সত্যিকারের দেশের কাজ করতে গিয়ে বিপদ এড়াবার কোন উপায় যে নেই, মা। বিশেষ কবে রাজশক্তির সঙ্গে সংঘাত যেখানে অনিবার্য—

—কী জানি, আমার কেমন যেন—

দেয়ালে টিক্ টিক্ করে ওঠে একটা টিকটিকি। মা সেদিকে তাকান। গৌতম বলে, কোন কিন্তু করো না, মা। আস্‌ছে রোববার দিলীপ আসছে। আমার চেয়ে সে আরও ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারবে তোমাকে।

প্রতিশ্রুতি মত রোববার সকালে দিলীপ আসে। সঙ্গে আরও দু'জন। একটি মেয়ে, অপরটি ছেলে। সবাই সমবয়েসি হবে। ঢুকেই দিলীপ বলে,—একটা দুঃসংবাদ গৌতম। কলকাতার রাস্তায় 'মাস্টারদা' গ্রেপ্তার হয়েছেন।

সংবাদটার আকস্মিকতায় গৌতম দিলীপের সঙ্গীদের স্বাগত জানাতে ভুলে যায়।

দিলীপের গলা শুনেই মা ঘরে ঢোকেন। নতুন দুজন অতিথি দেখে প্রশ্ন করেন,—এরা দুজন কে, বাবা?

দিলীপ পরিচয় করিয়ে দেয়,—এ প্রবীর সেন—আর ইনি মণিকা দত্ত। দুজনই চাটগাঁ থেকে ঢাকা এসেছে বি. এ. পড়বার জন্যে। ওরা দুজনেই উপুড় হয়ে মাকে প্রণাম করে।

মা মাথা ছুঁয়ে আশীর্বাদ করেন। হাসিমুখে বলেন—তোমরা সব বসে গল্পসল্প করো, আমি চা নিয়ে আসছি—

আমিও যাব আপনার সঙ্গে,—বলে মণিকাও মায়ের অনুসরণ করে।

দিলীপ ও প্রবীরকে নিয়ে তক্তপোষটায় বসে গৌতম। উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে প্রবীরকে প্রশ্ন করে—মাস্টারদা'র অভাবে দলের ক্ষতি হবে না?

প্রবীর বলে,—তা কেন হবে? অম্বিকাদা, অনন্তদা—তাঁরা সবাই এখনও আছেন।

মা ও মণিকা চা নিয়ে ঘরে ঢোকে। মাকে চেয়ারে বসিয়ে দেয় মণিকা।

তারপর সবাইর হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে নিজেও এক কাপ নিয়ে তক্তপোষটার এক কোণে বসে।

কথায় কথায় গৌতম মণিকাকে বলে,—চাটগাঁয় অমন ভাল কলেজ থাকতে ঢাকায় কেন ?

মণিকা বলে,—আপনি যদি চাটগাঁ ছেড়ে ঢাকা আসতে পারেন, আমার বেলা আপত্তি কেন ?

গৌতম কোন জবাব খুঁজে পায় না। মা বলেন—ঠিক বলেছ মা, আমিও একদিন ওই প্রশ্ন করেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝছি, বাইরে না বেরুলে সংসারের অনেক কিছুই অজানা থেকে যায়।

কথার মোড় ঘোরাবার জন্যে দিলীপ বলে,—শুনেছেন মাসীমা ? মাস্টারদা' কলকাতায় গ্রেপ্তার হয়েছেন ?

মায়ের মুখখানা কেমন বিবর্ণ হয়ে যায়। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলেন,—খুবই দুঃখের কথা। শিগ্গীর তিনি ছাড়া পেয়ে বাইরে আসুন, এ প্রার্থনাই জানাই ভগবানের কাছে। কিন্তু আমার ভয় কী জানো ? কুচক্রী ইংরেজ তোমাদের সব গ্রেপ্তার করেই বসে থাকবে না। স্বাধীনতাকামীদের চলার পথ পিছিল করে দেবে,—ছলে, বলে, কৌশলে। মহাভারতের কৌরবেরা যেমন করেছিল পাণ্ডবদের বেলা। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা তো বেধেই আছে। ঐ আগুনে নিরলস ইন্ধন যোগাবে ওরা। আমাদের করে দেবে বিভ্রান্ত।

দিলীপ বলে,—সব বিভ্রান্তি ঘুচিয়ে আমরা একদিন জয়ী হবই, মাসীমা: পাণ্ডবদের হাতে দুর্যোধনকেও যেমন পরাজয়' স্বীকার করতে হয়েছিল, তেমনি আমাদের হাতে ইংরেজকেও পরাজয় স্বীকার করতে হবেই একদিন।

—সে কথা ঠিক। কিন্তু ভুলে যেও না বাবা, তাঁদের পথপ্রদর্শক ছিলেন—যুগাবতার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

প্রবীর বলে—শ্রীকৃষ্ণের বাণী যদি সত্যি হয় মাসীমা, তবে দুষ্কৃত দমনের জন্য এ যুগেও যুগাবতারের আবির্ভাব হবে।

মণিকা বলে ওঠে—'হবে' নয় প্রবীরদা, বল 'হয়েছেন'—

—তার মানে ?

—মানে খুবই সহজ। চোখ মেলে যুগাবতারের আবির্ভাব যদি দেখতে না পাও, চোখ বুঁজে ধ্যান কর, তাঁর আবির্ভাব নিশ্চয়ই অনুভব করবে।

—ওসব হেঁয়ালি ছেড়ে সোজা ভাষায় বুঝিয়ে বল।

—সোজা ভাষায়ই তাহলে বলছি। মহাত্মা গান্ধীজীকে কী মনে হয় তোমাদের ?

—আর যাই হোক, অন্ততঃ যুগাবতার বলে মনে হয় না—বলে দিলীপ।

—আমি যদি বলি, তাই—

এবার জবাব দিল গৌতম—একথা আমরা মানতে রাজী নই। আমাদের আদর্শ মাস্টারদা, গান্ধীজী নন্।

গৌতম বোধহয় প্রথম পরিচয়-মুহূর্তে মণিকার দেওয়া খোঁচাটা হজম করতে পারছিল না। তাই সে সুযোগ পেয়ে আরও খোঁচা দিয়ে বলে—গান্ধীজীই যদি আপনার দৃষ্টিতে যুগাবতার, তাহলে মাস্টার-দার দলে এলেন কেন ? খদ্দরের দলে ভিড়ে গেলেই তো পারতেন।

—ক্ষমতা থাকলে তাই হয়তো যেতাম। কিন্তু মার খেয়ে আঘাতকারীকে ক্ষমা করতে হলে যে মনোবলের প্রয়োজন, ততটুকু আমার নেই। তাই আপাতত "মারের বদলে মার"-এর দলই বেছে নিতে বাধ্য হয়েছি—দৃপ্ত ভঙ্গিতে জবাব দেয় মণিকা।

আবার আসরে দিলীপ এগিয়ে এসে বলে—আপাততঃ মানে ? সুযোগ বুঝে দল ছেড়ে পালিয়ে যাবেন নাকি ?

কথার মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে গৌতমও বলে উঠে—যাবেন নয়, পা বাড়িয়েই আছেন—বলতে পার।

মণিকার চোখে-মুখে কে যেন একছোপ কালি মেখে দেয়।

মা এতক্ষণ চুপচাপ আলোচনা-সমালোচনা শুনছিলেন। গৌতমের কথার ঢং-এ তিনি লজ্জিত হয়ে বলেন—ছিঃ গৌতম,

যেখানে মহৎ ব্যক্তিদের আদর্শ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সেখানে এভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ মোটেই উচিত নয়। তাছাড়া, মণিকা আমাদের অতিথি।

নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে গৌতম লজ্জায় মাথা নত করে তাড়াতাড়ি উঠে মণিকার কাছে গিয়ে অনুনয়ের সুরে বলে—আমায় মাপ করবেন, মণিকা দেবী, আমি ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেলেছি।

কিছু না বলে মণিকা শুধু একবার গৌতমের দিকে তাকায়। গৌতম দেখে যেন জলভরা আকাশে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মতো সে চোখে আগুন লুকিয়ে আছে। টানাটানা চোখদুটোয় বুঝি বা দু'এক ফোঁটা অশ্রু টলটল করছে। আর তারই মধ্যমণি ঘন কালো তারা ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চায় আগুনের ফুল্‌কি। সেই দৃষ্টির সামনে গৌতমের সত্বা কেমন যেন কুঁকড়ে যেতে চায়। সারা মনে তার একটা অনুশোচনা জাগে। সারা ঘরময় কেমন যেন একটা থম্‌থমে ভাব।

লজ্জায় মাথা আরও নিচু করে আস্তে আস্তে গৌতম আবার বলে—বলুন মণিকা দেবী, আপনি আমায় মাপ করেছেন।

মণিকা কিছু বলবার আগেই প্রবীর বলে—এই দেখুন তো, সামান্য একটা কথা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করাটা আমাদের মোটেই শোভা পায় না, গৌতমবাবু। সবাই আমরা জানি যে দল আমাদের ব্যক্তিসত্বার অনেক উপরে। গান্ধীবাদ আর আমাদের বিপ্লববাদ আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। উভয় পন্থীর উদ্দেশ্যই এক, শুধু পথ আলাদা। একে অপরের পরিপূরক, একথা মেনে নিতে কোন বাধা আছে কি? আর তাই যদি মেনে নিই, তবে দল ছেড়ে পালাবার প্রশ্ন অবান্তর। আর আমরাও তো সবাই কংগ্রেস দলেই রয়েছি। যার অবিসংবাদিত নেতা গান্ধীজী। কী বলেন, মাসীমা?

প্রবীরের প্রশ্নে সবাই মায়ের দিকে তাকায়। একটা জটিল

সমস্যার সমাধান যেন মায়ের জবাবের উপরেই নির্ভর করছে। বিবদমান যৌবন যেন প্রৌঢ়ত্বের নিবিড় ছায়াতলে আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ধীরে ধীরে মা বলেন—এসব কথা ভেবে দেখবার প্রয়োজন আমার এর আগে কোনদিন হয়নি, প্রবীর। প্রথম যেদিন গৌতম আমায় সব কথা খুলে বলল, সেদিন থেকেই একটা অজ্ঞাত আশংকায় বুক আমার কেঁপে কেঁপে উঠছে। ছেলেমেয়েদের কাছে অকপটে তা স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমার। কিন্তু তবু আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি—ওপথে পা বাড়াসনি গৌতম। নিজের মনকে শুধু এই বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছি যে—দেশের স্বাধীনতাই যেখানে একমাত্র কাম্য ধন, সেখানে পথের চিন্তা অপ্রাসঙ্গিক। আর মনে মনে সান্ত্বনা খুঁজেছি মহাভারতের সেই মহাসাগরে।

চারটি চঞ্চল তরুণ চিত্ত পিপাসার্ত হৃদয় নিয়ে মায়ের মুখনিসৃত অমৃতধারা উদ্বেল আবেগে আটটি হাতের আঁজলা পুরে পান করার জন্য যেন অধৈর্য অপেক্ষায় রয়েছে। দম নেবার জন্য একটু চুপ করতেই অধীর আগ্রহে প্রবীর আবার প্রশ্ন করে—সে মহাসাগরে কিছু খুঁজে পেলেন কি মাসীমা?

একটু হেসে মা বলেন—হ্যাঁ, পেয়েছি বাবা, ঊর্ধ্বে পেয়েছি যুধিষ্ঠির; তলায় পেয়েছি দুর্যোধন, আর মধ্যমণি রূপে পেয়েছি শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন। প্রথমজনের মধ্যে দেখেছি জাগতিক সব আশা-আকাঙ্ক্ষা আর ভোগলিপ্সার অসীম নির্লিপ্ততা; দ্বিতীয় জনে দেখেছি স্বার্থসিদ্ধ আর ভোগ-বাসনার প্রচণ্ড আসক্তির বীভৎস রূপ, আর মধ্যমণিতে দেখেছি নির্লিপ্ততা ও আসক্তির গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশাল ভারত গড়ে তুলবার অনির্বাণ স্বপ্নময় চঞ্চলতা।

বলতে বলতে মা যেন অনেক দূরে চলে গেছেন। তন্ময় মন্ত্রমুগ্ধ চারটি তরুণ চিত্ত মহাসমুদ্রের মহাধ্বনিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে। আরও অনেক জানতে চায়, আরও বুঝতে চায় ওরা।

প্রশ্ন করে দিলীপ—আপনার এই দর্শনের দর্পণে আমাদের স্থান কোথায় মাসীমা ?

নিশিতে পাওয়া স্বপ্নালুকণ্ঠে জবাব দেন মা—সে-যুগের মধ্যমণি "শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন"-ই আজকের যুগে গান্ধী-মাস্টারদা।

আবার প্রশ্ন তোলে দিলীপ—কিন্তু সেদিন অর্জুন তো যুদ্ধ করতে নারাজ ছিলেন, মাসীমা। শ্রীকৃষ্ণই তাঁকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেছিলেন। আর এযুগে মাস্টারদা বাজাচ্ছেন ভেরী, গান্ধীজী শোনাচ্ছেন শান্তির বাণী। কে তবে শ্রীকৃষ্ণ, আর কেইবা অর্জুন ?

—একের সঙ্গে অপরের তুলনা চলে না, দিলীপ, তাতে সাধারণ মানুষের মনে সৃষ্টি হবে শুধু বিভ্রান্তি। আমাদের কাছে সে-যুগের শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন যেমন সত্যি এ-যুগের গান্ধী-মাস্টারদা তেমনি প্রত্যক্ষ। কার কথা মেনে চলবে সেটা নির্ভর করবে আপন আপন অনুভূতি আর শক্তির গভীরতায়, তবুও আমি বলব—শ্রীকৃষ্ণের আসল পরিচয় যেমন তাঁর বিশ্বরূপে, গান্ধীজীর আসল পরিচয়ও তাঁর সার্বজনীন শান্তি কামনায়। আর অর্জুনের আসল পরিচয় যেমন তাঁর সামরিক বীর্যবত্তায়, মাস্টারদার আসল পরিচয়ও তেমনি তাঁর বিশ্বাসের একাগ্রতায়, সকলেই আমাদের বরণীয়, সকলেই আমাদের পূজনীয়।

চোখ বুঁজে আছেন মা। মনে হয়—এতক্ষণ কথাগুলো তাঁর অন্তরের মহাসমুদ্রের অন্তস্থল থেকে তরঙ্গায়িত হয়ে বাইরে এসে আছড়ে পড়ছিল। তাঁর কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে চার-চারটা তাজা তরুণ হৃদয় যেন সেই তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যুগপৎ মায়ের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে তাঁর চরণযুগল স্পর্শ করল।

হঠাৎ চরণ স্পর্শে মায়ের যেন স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান মা। দিলীপ, প্রবীর, গৌতম আর মণিকাও উঠে দাঁড়ায়। পরম স্নেহভরে মা তাদের সবার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তারপরই তাঁর খেয়াল হয় যে কথায় কথায়

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বলেন—ইস্ দেখেছো, সন্ধ্যাবাতির সময় গড়িয়ে গেল যে। তোমরা বসো, আমি আলো দিয়ে তোমাদের জন্য আবার একটু চা করে আনছি—সন্থ শোনা ভারি কথাগুলো একটু ভিজিয়ে নেবে।—বলেই তিনি অন্দরের দিকে পা বাড়ান। মণিকাও তাঁর পেঁছন পেছন ভেতরে চলে যায়।

পাঁচ

মায়ের কথাটা ছ'মাস যেতে না যেতেই যে এভাবে দৈববাণীর মতো ফলে যাবে একথা সেদিন গৌতমরা কেউ ভাবতেও পারেনি। খবরটা নিয়ে এল দিলীপ। তার বাবার অফিসঘরে বসে সেদিন কোতোয়ালীর অফিসার-ইন্-চার্জ যা রিপোর্ট করছিল তার বাবার কাছে, তারই সারমর্ম পেশ করে সে তাদের আসরে। তবে তার আগে মাস্টারদার গ্রেপ্তারের একটা কিছু প্রতিশোধ নেওয়া প্রয়োজন এবং সে' প্রতিশোধটা কিভাবে নেওয়া যায়, তারই একটা কর্মসূচী আলোচনার জন্য ওরা সবাই এসে মিলিত হয়েছে। ওদিকে হঠাৎ পার্টির কি একটা গোপন নির্দেশ নিয়ে চাটগাঁ থেকে প্রবীরও ঢাকায় এসেছে তার আগের দিন সন্ধ্যাবেলায়। সেও এসে মিলেছে গৌতমদের বাড়িতে, যেখানে গৌতম, দিলীপ আর মণিকারা সবাই বসেছিল। প্রবীরের কাছ থেকে পার্টির গোপন নির্দেশটা শুনবার পরই দিলীপ বলে উঠে—কিন্তু আমার মনে হয় যে তার আগেই হয়তো এখানকার ফায়ার ওয়ার্কস্ শুরু হয়ে যাবে।

—তার মানে? প্রশ্ন করে প্রবীর।

দিলীপ তখন বলে—সেদিন কোতোয়ালীর বড়বাবু, মানে দারোগাবাবু, এসে বাবাকে বলছিলেন যে এবার জন্মাষ্টমীর মিছিলে একটা দাঙ্গা বাধতে পারে। তাই শুনে বাবা বলেন—তাহলে দাঙ্গা রোধ করবার জন্য দারোগাবাবুকে নিশ্চয়ই সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে

হবে। যদি দরকার হয় তিনি যেন পুলিস সাহেবের কাছ থেকে অতিরিক্ত পুলিসবাহিনী তলব করে নেন। শুনে দারোগাবাবু মাথা নেড়ে বলেন—সে-সুযোগ কি আমার মিলবে, স্যার? বাবা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—কেন নয়? তিনি একটু মৃদু হেসে বলেন—আমার মাণিকগঞ্জে বদলীর হুকুম এসে গেছে। আর আমাব জায়গায় আসছেন মৌলবী তায়ের আলী সাহেব। এখন তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তো, স্যার্?

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলেই প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে গৌতম, প্রবীর ও মণিকার মুখের দিকে তাকালো দিলীপ।

প্রবীর প্রশ্ন করে—তোমার বাবা কী বল্‌লেন?

—কী আর বল্‌বেন তিনি? শুধু একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—সবই বুঝতে পারছি, নগেনবাবু। সবটাই যেন একটা সুষ্ঠু পবিকল্পনা ঘটিত ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। তবে দুঃখ এই যে সবকিছু বুঝেও এই অন্যায় প্রতিরোধ করবার মত কোনই শক্তি নেই আমাদের। চিরকাল জন্মাষ্টমীব মিছিল যেভাবে চলে এসেছে, এবার দেখছি তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হবে। এই মিছিলকে উপলক্ষ্য করে যুগ যুগ ধরে হিন্দু-মুসলমান হাতে হাত মিলিয়ে কী আনন্দই না করেছে; আব আজ কিনা ধুয়া উঠল নবাবপুব মসজিদের সামনে এই মিছিলের বাজনা বন্ধ রাখতে হবে। এটা কী অন্যায় আব্‌দাব বলুন তো নগেনবাবু? গলা নামিয়ে নগেনবাবু বলেন—আস্কাবা, বুঝলেন সার, সবটাই আস্কারা। আস্কাবা যদি পায়, আদায় করতে ছাড়বে কেন ওরা? সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট আব পুলিস সুপার, এই দু-জনেই তো এই আবদারের বুদ্ধিটা বাতলে দিয়েছেন জনকয়েক ইংরাজের খয়ের খাঁ খান্‌বাহাদুব আর খানসাহেবকে তাঁদের ঘবে ডেকে এনে। এখন খুঁটির জোরে ওরা যদি শিং বাঁকিয়ে দাঁড়ান, তো ওদের আর দোষ কি, বলুন স্যার?

দিলীপের কাহিনী শুনে সবার চোখে-মুখে একটা গম্ভীর থম্‌থমে

ভাব জমাট বেঁধে উঠে। এরই মধ্যে চা নিয়ে ঘরে ঢুকে মা অনুভব করলেন, কী একটা আবেগ ও আক্রোশে যেন ছেলে-মেয়েগুলো ফেটে পড়তে চাইছে। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করেন—কি আবার হল রে তোদের ?

—শুনেছ মা, গৌতম ভীষণ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে—জন্মাষ্টমীর মিছিলে এবার নাকি নবাবপুরের মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধ রাখতে হবে।

মা বলেন—করতে যদি হয় তো হবে। তার জন্য এত দুর্ভাবনা কিসের ?

—এতদিন চলে আসা প্রথাটা একটা খামখেয়ালীর জন্যে তুলে দিতে হবে, তাই বলে ? উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করে প্রবীর।

—তোমাদের কাছে যেটা খামখেয়ালী, আর একজনের কাছে হয়তো, সেটাই ধর্মের বিধান।

—এতদিন সে ধর্মটা ছিল কোথায় মা ?

—এ প্রশ্নের জবাব তারাই শুধু দিতে পারে বাবা, যারা আপত্তি তুলেছে।

—না মাসীমা, তারা জবাব দেবে কোত্থেকে ? যারা আপত্তি তুলছে, তাদের আব্দারে ইন্ধন যোগাচ্ছে রাজশক্তি—বলে দিলীপ।

—কি রকম ?

—সাহেব জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ এবং জেলা পুলিস সুপারই নাকি এই কুবুদ্ধিটা ওদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন; একথাই সেদিন কোতোয়ালীর দারোগাবাবু বাবাকে বল্‌ছিলেন।

—হুঁ তা'হলে কুচক্রী ইংরেজ তার জাল ফেলতে শুরু করেছে. এবার তা'হলে সত্যিকারের সংগ্রামও শুরু হবে তোমাদের। তাহলে ভ্রাতৃ-রক্তে আবার রাঙা হয়ে উঠবে তোমাদের জন্মভূমির পথ-ঘাট, যেমন একদিন হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের রণভূমি। জানিনা, এর শেষ কোথায়! শুধু বলতে পারি, খুব সাবধান বাবা, খুব সাবধান—

প্রবীর বলে—না মাসীমা, শুধু সাবধানতা দিয়েই এই বিষবৃক্ষের মূল উচ্ছেদ করা যাবে না। যে হাতে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হচ্ছে, সে হাতকে একেবারে পঙ্গু করে দিতে হবে। তবেই হবে তার উপযুক্ত জবাব।

—জানিনা, কী করে তা সম্ভব হবে। তবু তোমাদের এই সঙ্কল্পে বাধা দেবার মতো কোন যুক্তিও নেই আমার। যুগ যুগ ধরে মানুষ তার ভিতরকার আদিম হিংস্রতাকে জয় করার চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু প্রতিবারই তার সেই শুভ প্রচেষ্টা পাথরে মাথা খুঁড়ে মরেছে। আদিমতার কাছে মনুষ্যত্বের গৌরব বার বার হয়েছে অপমানিত ও লাঞ্ছিত। তবুও বলব, সে লাঞ্ছনার হাত থেকে সভ্য সমাজকে রক্ষা করবার সুযোগ যদি আসে, তবে আমার ছেলেমেয়েরা নির্ভয় চিত্তে যেন সে সুযোগ নিতে পারে।

সবাই একসঙ্গে বলে উঠে—তোমার আশীর্বাদে সে সুযোগ আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।

মৃদু হেসে প্রসন্নচিত্তে মা ভেতরে চলে যান।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে ওরা চারজনে মিলে অনেক শলা-পরামর্শ করে স্থির করে যে মাস্টারদার গ্রেপ্তারের এবং হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধাবার চক্রান্তের প্রতিশোধ একই সঙ্গে সাহেব জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস সুপারের ওপর নিতে হবে, আর জন্মাষ্টমীর পুণ্য-মিছিলের জনতার ভিড়ে নিশ্চয়ই সেই সুযোগ পাওয়া যাবে। বিশেষ করে, মসজিদের সামনে বাজনা বাজাবার প্রশ্ন নিয়ে কিছু একটা গণ্ডগোল বাধবার সম্ভাবনা যখন রয়েছে।

এই গুরুদায়িত্বভার নিয়ে একটা মতদ্বৈধ দেখা দেয়। এ ব্যাপারে ওরা চারজনেই এগিয়ে যেতে চায়। তখন প্রবীর বলে—তোমরা তো পার্টির নির্দেশ জান, এখানে দুয়ের বেশী জীবন বিপন্ন করা চলবে না। অথচ, কেউই যখন পিছিয়ে যেতে রাজী নও তখন লটারি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, অগত্যা তাই করা হল।

লটারিতে গৌতম আর মণিকার নাম উঠতেই তারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। অনেক রাত পর্যন্ত চারজনে বসে কাজের খুঁটিনাটি ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করার পর দিলীপ, প্রবীর আর মণিকা গৌতমের কাছে বিদায় নিয়ে যখন রাস্তায় এসে দাঁড়াল, রাত তখন বারোটা।

আবদ্ধ ঘরের গুমট গরম থেকে মধ্যরাতে মুক্ত হাওয়া ওদের ভালই লাগে। রাস্তায় তখন নোংরা কুকুরগুলো খেয়োখেয়ি করছে। কখনও বা একটা ডাস্টবিনের মধ্যে চার-পাঁচটা কুকুর একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ছে, আবার তারপরই নিজেরা কামড়াকামড়ি করে রাস্তায় গড়িয়ে পড়ছে। অন্যদিকে, পাশের বাড়ির ভাঙ্গা দেওয়ালটার উপর দুটো বিড়াল মুখোমুখি হয়ে গা ফুলিয়ে আর লেজটা মোটা করে পরস্পরের প্রতি তর্জন-গর্জন শুরু করেছে। দেখেই মনে হয় যেন একে অপরকে দলে-পিশে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চায়। অথচ, কে আগে আক্রমণ চালাবে তা ঠিক করতে না পেরে, থেকে থেকে শুধু চিৎকার করেই যাচ্ছে। একের আওয়াজকে অন্যে দাবিয়ে দেবার একটা জীবন্ত প্রতিযোগিতা যেন, দূরে সদরঘাটের দিক থেকে একটা ঘড়ির আওয়াজ হাওয়ায় ভেসে আসে—ঢং-ঢং-ঢং। সেই একটানা শব্দটাকে স্তব্ধ করে দিয়ে একটা স্টিমারের ভেঁপু বেজে ওঠে। দিলীপই প্রথম কথা বলে—উঃ, একটু পা চালাও। রাত বারোটা বেজে গেল যে।

প্রবীর বলে—হ্যাঁ, আমাদের সংগ্রামের "জিরো আওয়ার" ঘোষণা করে গেল, বোধ হয়—কী বল, মণিকা?

মণিকা যেন একটু অন্যমনস্ক ছিল। প্রবীরের প্রশ্নে চমকে উঠে বলে—কী বললে প্রবীরদা?

প্রবীর তার কথার পুনরুক্তি করতেই মণিকা বললে—আমি শুধু ভাবছিলাম ওই কুকুর আর বিড়ালগুলোর কথা।

—কেন, ওরা আবার কী করল? জিজ্ঞেস করে দিলীপ।

—খেয়োখেয়ি,—যেমন আমরা করছি। মানে হিন্দুতে আর মুসলমানে।

হুঁ, ভাববার মতো কথা বটে।

পরদিন দিলীপের কাছে গৌতম কথাগুলো শুনে মাকে বলতেই তিনি বলেন—মণিকা কিছু মিথ্যা বলেনি। উচ্ছিষ্টের পেছনে ইংরেজ আমাদের লেলিয়ে দিচ্ছে। আমবা তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে দিনরাত খেয়োখেয়ি করছি, আর সেই ফাঁকে ওরা ওদের কাজগুছিয়ে নিচ্ছে।

—বেশীদিন আর এ'খেলা চলবে না মা, তুমি দেখে নিও।

ছেলের কথা শুনে মা শুধু মুচ্‌কি হেসে বলেছিলেন—সে সুদিন আমি দেখে যেতে পারব কিনা জানিনে, তবে আশীর্বাদ করি, তোরা যেন দেখে যেতে পারিস্।···

ট্রেনের নির্জন কামরায় বসে পেছনে ফেলে আসা সেই সব দিন-গুলোব কথা মনে পড়তেই ডাঃ চৌধুরীর বুকটা আবার টন্‌টন্ করে ওঠে। বাঁহাতটা বুকে চেপে ধরে আবার তিনি ভাবতে থাকেন—মা সত্যিই সেই সুদিন দেখে যেতে পারেন নি। সাতদিন যেতে না যেতেই ঢাকা সহরে যে সাম্প্রদায়িক খেয়োখেয়ি সুরু হল, তারই পংকিল আবর্তে তলিয়ে গেলেন মা। নিয়তি বিড়ম্বিত জন্মাষ্টমীর মিছিলের দিনটিতে নির্ধারিত কাজের ভার নিয়ে যথাসময়ে গৌতম নবাবপুর ব্রিজের পশ্চিমপ্রান্তে একটু জায়গা দখল করে দাঁড়াল। সমুদ্রের দুর্বার স্রোতের মতো মানুষের পর মানুষ তরঙ্গায়িত হয়ে রাস্তা ধরে চলেছে। সকলের মুখেই যেন একটা অনাগত আতংকের ছায়া। সারা শহরটায় কেমন থম্‌থমে ভাব ছড়িয়ে আছে। এই জনসমুদ্রের মধ্যে হঠাৎ চকিতের মতো গৌতম যেন একবার দেখতে পেল মণিকাকে। ঝট্ করে ডানহাতটা পকেটে ঢুকিয়ে গোলাকার জিনিষটার অস্তিত্ব অনুভব করে গৌতম। বুকটা একটু দুরু দুরু কেঁপে উঠল যেন। আর তারই প্রতিধ্বনি তুলে দূর থেকে সেই মিছিলের বাজনা ভেসে এল-দুম্-দুম্-দুম্-দুম্।

রাস্তার দু'ধারে অপেক্ষমান জনতা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কেননা, ওরা জানে যে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম—মস্‌জিদের একশ গজ আগে বাজনা থামাতে হবে, তারপর একশ' গজ পরে আবার বাজানো চলবে। এই হুকুম অমান্যকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। জনতা তাই রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করছে। বাজনার আওয়াজ ও ক্রমবর্দ্ধমান মিছিলটা এগিয়ে আসে। সবার মনে একটা "কি-হয়, কি হয়" ভাব, কিন্তু মস্‌জিদের কাছে এসেই যেন কোন্ যাদুবলে বাজনাটা বন্ধ হয়ে যায়। "যাক বাঁচা গেল,"—মনে মনে সবাই যেন একথাই বল্‌ছে। জনতার মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়। তারা দেখতে পায়—মিছিলটার সামনে ও পিছনে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী, অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে রয়েছেন পুলিশ সুপার নিজে, পশ্চাদবর্তী বাহিনীর সঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ স্বয়ং। পুলিশ সুপারের দলটি পুলের উপর চলে এসেছে। ঠিক এমনি সময় পুলের পশ্চিম দিক থেকে ভেসে এল একটা বিকট আওয়াজ। গৌতম ভাবল—মণিকা তাব কর্ত্তব্য পালন করেছে, এবার তার পালা। নিজেকে সে একটু সংযত করতে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ বাজনাটা আবার সরব হয়ে উঠে ঠিক মসজিদটার সামনে এসেই। দেখতে না না দেখতে আকাশ থেকে যেন ইষ্টকবৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। চারিদিকে শুরু হয় বাঁধভাঙ্গা বন্যাস্রোতেব মতো চমকে উঠা বিক্ষিপ্ত জনতার দিকবিদিকহীন ছুটোছুটি আর ধাক্কাধাক্কি।

গৌতম দেখতে পায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঘোড়া ছুটিয়ে তার দিকেই যেন আসছেন। বৈদ্যুতিক সুইচ্ টিপলে মেশিন যেমন তার নির্ধারিত রীতিতে চলতে থাকে, হঠাৎ প্রাণবন্ত হয়ে গৌতমের ডান-হাতটাও ঠিক পকেট থেকে বেরিয়ে এসে গোলাকার পদার্থ টা ছুঁড়ে ফেলে দিলে ঘোড়াটাকে লক্ষ্য করে। আবার একটা কান-ফাটা আওয়াজ।—চেঁচামেচি আর ছোটাছুটি। তারই একটা ধাক্কায় গৌতম ছিট্‌কে পড়ে যায়। অতি কষ্টে উঠে দাঁড়তেই তার মনে পড়ে

যায়, এই সময় তাকে হাসপাতালে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ডিউটিতে থাকবার জন্য আগের দিনই সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জরুরী নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই তার কৃতকর্মের ফলাফল দেখবার জন্য আর অপেক্ষা না করে হাসপাতালের পথে দ্রুত পা চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মিড্‌ফোর্ড হাসপাতাল,—এমার্জেন্সি ওয়ার্ড—। তখন প্রায় সন্ধ্যা নেমে এসেছে। এম্বুলেন্সের পর এম্বুলেন্স এসে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ভিড় করছে। হতাহতের ভিড়ে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডও কর্মব্যস্ততায় মুখরিত। চারিদিকে কর্মীদের ছুটাছুটি, আর লোকের মুখে মুখে গুজবের মুখরতা—নবাবপুর অঞ্চলে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। ১৪৪ ধারা ও কার্ফিউ জারী করেছেন ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব। আরও গুজব,—কে বা কারা যেন বোমা ছুঁড়েছিল মিছিলের ভিড়ে অল্পের জন্য পুলিশ সুপার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বেঁচে গেছেন। জনতার মধ্যে কয়েকজন বেশ জখম হয়েছে। একজন মহিলার জখম খুবই গুরুতর।

গৌতমের মনে হল, এ যেন নিয়তির পরিহাস। প্রকৃত দোষীরা বেকসুর খালাস, আর নির্দোষ মানুষের কারাবাস। মনে ধিক্কার জাগে। ঠিক এমনি সময় একটা এম্বুলেন্স থেকে স্টেচারে করে যাকে নামিয়ে আনা হল, আবছা আলোতে একবার তার মুখখানা দেখেই পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে যায় গৌতম।—মণিকা না?—তাইতো,—কি হয়েছে ওঁর? চোখ দুটো বুজে আছে সে, সারা দেহটা তার অসাড়ের মতো পড়ে আছে স্ট্রেচারের উপর। পরনের জামা-কাপড় রক্তে রাঙা। একজন সার্জেন্ এসে পরীক্ষা করে বলেন—তলপেটের বাঁদিকে একটা স্প্লিণ্টার ঢুকে অজস্র রক্তপাত ঘটাচ্ছে। গৌতম আঁৎকে ওঠে—স্‌প্লিণ্টার্—কিসের স্‌প্লিণ্টার্? জবাবে সার্জেন বলেন—অপারেশন না করে সঠিক কিছুই বলার উপায় নেই। সার্জেনের নির্দেশই তাই স্ট্রেচারবাহকেরা মণিকাকে অপারেশন্ রুমে

নিয়ে গেল, আর সার্জেনও চলে গেলেন সেদিকে, গৌতম শুধু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অপারেশন রুমের বন্ধ দরজাটার দিকে। কিছু বুঝবার বা কিছু ভাববার শক্তিও যেন সে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে।

আবার একটা এম্বুলেন্স এসে দাঁড়ায় গৌতমের পাশে। যন্ত্রচালিতের মতো ঘুরে দাঁড়ায় সে। গাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে স্ট্রেচারবাহকরা আরেকজন মহিলাকে নামিয়ে আনে। এবার সেদিকে তাকিয়েই চীৎকার করে উঠে গৌতম—মা,—মা-কী হয়েছে তোমার? স্ট্রেচারে শায়িতা গৌতমের মায়ের ঠোঁটের কোণে মলিন একটু হাসি যেন চকিতের জন্য ফুটে উঠে। একবার যেন চোখ খুলে গৌতমকে দেখলেনও তিনি। তারপরই চোখ দুটি আবার বুজে যায়।

গৌতমের চোখের সামনে সব বাতিগুলো যেন একসঙ্গে দপ্ করে নিভে যায়—সমস্ত এমার্জেন্সি ওয়ার্ডটা যেন তার মাথার উপর ভেঙে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে গৌতম সংজ্ঞা হারায়।

যখন চোখ খুলে তাকায়, তখন সে একটা টেবিলের উপর শুয়ে আছে। কয়েকজন সহপাঠী তার চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। একজন তারই মধ্যে একটা স্মেলিং সল্টের শিশির মুখ খুলে নাকের সামনে ধরে আছে। চোখ খুলেই গৌতম উদ্বিগ্নকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে —মা,—মা কোথায়?

একজন জবাব দেয়—মা ওয়ার্ডে আছেন, তুমি কোন চিন্তা করো না, ভাই।

তড়াক্ করে গৌতম উঠে বসে। বলে—আমায় নিয়ে চলো সেখানে। দু'জনে তাকে শক্ত করে ধরে নিয়ে যায় ফিমেল্ ওয়ার্ডে। সেখানে ২নং বেডে সে তার মাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে যেতেই মাথার কাছে দাঁড়ানো নার্স গৌতমকে বলে—একটু শান্ত হোন্। এখনো ওঁর জ্ঞান ফেরেনি। বুকের বাঁদিকে ছোরার আঘাতটা বেশ গভীর।

পাড়ার লোকেদের কাছে গৌতম পরে দুর্ঘটনার বিবরণ যা শুনেছে, তাতে একদিকে যেমন মাতৃগর্বে তার মন ভরে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি মায়ের অভাবটা সে তীব্রভাবে অনুভব করেছে দিনের পর দিন।

নবাবপুরের সেই বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে মহল্লায় মহল্লায় বিদ্যুৎগতিতে। সন্ধ্যার দিকে তাদের গলিতে কি একটা গোলমাল শুনে মা বাইরের দরজার কপাটটা খুলে কি হয়েছে দেখবার চেষ্টা করতেই সঙ্গে সঙ্গে সামনের বস্তির কয়েকটি মুসলমান মেয়ে কোলে-পিঠে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ভীতা-ত্রস্তা হরিণীর মতো চীৎকার করতে করতে তাদের বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে, কিছু জানবার বা কিছু বুঝবার আগেই গুণ্ডা চেহারার দু'তিনটি লোক ছোরা উঁচিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করে। দু'হাত উঁচিয়ে মা তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করলে একটা ছোরা মায়ের বুকের বাঁদিকে বসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মা বোয়াকে লুটিয়ে পড়েন।

এই তো মানুষ,—এই তার সভ্যতা! এক নিরপরাধ মহিলার বুকে ছোরা বসাতে তার হাত এতটুকুও কাঁপে না!—সেই ট্রেনটার কামরায় অর্ধশায়িত ডাঃ চৌধুরী আজ আবার নতুন করে সে'কথাই ভাবতে থাকেন। উর্ধশ্বাসে ছুটেছে ট্রেন তার নির্দিষ্ট গতিপথে, সে যে কতখানি গতিমান সেটা সোচ্চারে জানাবার জন্যই যে মাঝে মাঝে অতিকায় ক্যানাডিয়ান্ এঞ্জিনটা তার গুরুগম্ভীর হুইস্‌ল্‌টার আওয়াজ তোলে। গাড়িটাও গতিবেগে ঠকাঠক্ শব্দ করে কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিন্তু মানুষ? মানুষ চলেছে কোন পথে—? তারও তো চলার বিরাম নেই,—কিন্তু তার গন্তব্যস্থলের কোন হদিসই তো আজও মিলল না?—মিলবে কি কোনদিন?

আবার ডাঃ চৌধুরীর মনটা ফিরে যায় মিড্‌ফোর্ড হাসপাতালে সেই ঘরটায়। যেখানে রক্তঝরা বুক নিয়ে শুয়েছিলেন তাঁর মা। দুর্বল নিশ্বাসে বুকটা তাঁর ঈষৎ ওঠা-নামা করছে বটে, কিন্তু কোন

জ্ঞান নেই। যে গৌতম সামান্য চোখের আড়াল হলেই মা কতো অস্থির হয়ে উঠতেন, সেই গৌতম আজ তাঁর চোখের চির আড়ালে পড়ে রইল সম্পূর্ণ এক অপরিচিতের মতো। তবু কোথাও কোন অস্থিরতার লক্ষণ দেখা যায় না। আস্তে আস্তে গৌতম মায়ের কপালে তার ডান হাতটা রাখে, টেম্পারেচার একটু উঠেছে অনুভব করেই নার্সের দিকে তাকায়। নার্স নিঃশব্দে বেড-কার্ডটা গৌতমের হাতে তুলে দেয়। মাত্র পাঁচ মিনিট আগে টেম্পারেচার নেওয়া হয়েছে—১০২°। মুখ তার পাংশুবর্ণ হয়ে যায়। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায়। রুমাল দিয়ে মুখ চেপে পাশের টুলটায় বসে পড়ে। কতক্ষণ এভাবে যে বসেছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ মনে হয়, মা যেন কেমন করছেন। তাঁর গলায় কেমন বিশ্রী একটা ঘড়্-ঘড়্ আওয়াজ হচ্ছে, আর থেকে থেকে শরীরটা কেঁপে উঠছে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনির মতো, লাফিয়ে উঠে গৌতম মাকে চেপে ধরে। অপরদিক থেকে নার্সও তাড়াতাড়ি এসে গৌতমকে সাহায্য করে। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে যেন ধরে রাখা যাচ্ছে না। মায়ের কোমরটা বেঁকে উপর দিকে ঠেলে উঠতে চায়, দিগ্‌বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে গৌতম ছুটল রেসিডেন্ট্ সার্জনের ঘরে। যাবার সময় দেখতে পায় অপারেশন্ রুম্ থেকে চাদর ঢাকা কার দেহ যেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খণিকের জন্য মণিকার কথা মনে পড়ে যায়। মণিকা,—এ্যাঁ—তাহলে মাণিকার কি সব শেষ হয়ে গেল? ওঃ—ভাবতে পারে না আর গৌতম।

রেসিডেন্ট সার্জেন্‌কে নিয়ে ওয়ার্ডে যখন ফিরে এল গৌতম, তখন সব শেষ হয়ে গেছে। নার্স মাথা গুঁজে মায়ের একটা হাত ধরে বসে আছে। সার্জন্ রোগিনীর গায়ের চাদরটা টেনে তার আপাদমস্তক ঢেকে দেয়, পাশে দাঁড়িয়ে সবই দেখছে গৌতম, তবু যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। যা দেখছে, তাও যেন তার বিশ্বাস হচ্ছে না। "স্যরি চৌধুরী"—বলে গৌতমের কাঁধে একটু হাত বুলিয়ে

রেসিডেন্ট্ সার্জন্ যাবার জন্য পা বাড়াতেই গৌতম তাঁর হাতটা চেপে ধরে। বিহ্বল দৃষ্টিতে সার্জেনের মুখের দিকে তাকিয়ে অসহায় গৌতম যেন একটা অবলম্বন চায়। সার্জন তার পিঠে মৃদু চাপ দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যান। কয়েক মুহূর্ত শূন্য দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে গৌতম এবার মায়ের বুকে লুটিয়ে পড়ে। বুকভাঙা নীরব কান্নায় গৌতমের সারা দেহটা ফুলে ফুলে উঠছে। গৌতমের অসহায় অবস্থা দেখে নার্স রুমালে চোখ মুছতে মুছতে পরবর্তী বেডের দিকে এগিয়ে যায়।

॥ ছয় ॥

পরদিন বুড়িগঙ্গার তীরে পাশাপাশি দু'টি চিতার আগুনই জ্বলেছিল। একটি মায়ের—অপরটি মণিকার, সেদিনের সেই দৃশ্য আজ যেন গভীর কুয়াশায় ঢেকে গেছে। ভাল করে মনেও পড়ে না সেদিন কি ভাবে মা ও মণিকাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বা গৌতমের ভূমিকাই বা কী ছিল।

শ্মশানের কাজ শেষ করে তিন বন্ধুতে যখন গৌতমের বাসায় ফিরে আসে তখন বেলা বেশ গড়িয়ে গেছে। এভাবে গৌতমের পক্ষে একা থাকা সম্ভব নয় ভেবে দিলীপ প্রবীরের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করে গৌতমের হবিষ্যের নিয়মিত ব্যবস্থা করবার জন্য একজন পাকা লোক ঠিক করা দরকার। দিলীপদের বাড়ির পাচক-ঠাকুরের ছোটভাই আজ দিন তিনেক হল দেশ থেকে ঢাকায় রান্নার কাজের খোঁজে এসেছে। ঠিকে-ঝির বদলে তাকে এখানে লাগিয়ে দেওয়া যাবে। কাল থেকে না হয় সে ব্যবস্থা হতে পারে—কিন্তু আজ—আজ কী হবে?

প্রবীর বলে—কেন, আজকে তো আমি রয়েছি। দরকার হয় আরও দু'চারদিন না হয় এখানেই থেকে যাব।

এমনি করেই শুরু হল গৌতমের নতুন জীবন। বাবার মতো মাও যে একদিন এমন হঠাৎ তাকে ছেড়ে চলে যাবেন, কোনদিন সে কল্পনাও করতে পারেনি। তবুও সেই অকল্পনীয় ভবিতব্য রূঢ় বাস্তব হয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। মায়ের ঘরে ঢুকে সে দেখে যেখানকার জিনিস ঠিক তেমনিভাবে সেখানে সাজানো রয়েছে।

মা বোধহয় বিছানা করতে কবতেই বাইরে গোলমাল শুনে সদব দরজায় এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাই বিছানাটা আগোছালো ভাবেই তক্তপোষটাব উপর নেতিয়ে আছে। সন্ধ্যাদীপের সলতেটা পুড়ে পুড়ে অকল্যানের একটা কালো বেখাপাতের মতোই যেন প্রদীপটাব বুকের কাছে এসে আর্ত দীর্ঘশ্বাসে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এই সব দৃশ্যে গৌতমের বুকের ভিতরটা আবার ফুঁপিয়ে ওঠে,— "মা-মাগো" বলেই সে বিছানাটার উপর পড়ে যায়। পিছন থেকে প্রবীর এসে তার মাথায় আব পিঠে হাত বুলিয়ে বৃথাই সান্ত্বনা দিতে থাকে।

কথামত পবদিনই দিলীপ বান্নার ঠাকুরকে সঙ্গে করে নিয়ে এল, দু'দিন পর প্রবীর চাটগাঁ চলে যাবে। বাড়িতে এখন শুধু গৌতম আর ঠাকুর। দিলীপ নিয়মিত সকাল সন্ধ্যায় আসে। যতক্ষণ সে কাছে থাকে, গৌতম কেবল মায়ের কথাই বলে।

দিলীপ তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে বলে—দুঃখ করিসনে, গৌতম। ভেবে দেখ—এমন মা ক'জনের হয়। আশ্রিতকে বক্ষা কববার জন্যই মাসীমা তাঁব অমূল্য জীবন বিসর্জন দিয়ে গেলেন। বাংলার ঘবে ঘরে এমন মা যেদিন দেখা দেবে, সেদিনই আমাদেব স্বপ্ন সফল হবে, গৌতম! কাঁদিসনে—ববং প্রার্থনা কব, সেই সুদিন যেন আমবা দেখে যেতে পারি।

দিলীপেব কথায় অবিশ্যি সাময়িক সান্ত্বনা মেলে, কিন্তু তবুও যেন বুকের গভীরে একটা অব্যক্ত বেদনা লুকিয়ে থাকে। এরই সঙ্গে মাঝে মাঝে মণিকাব কথাও হয়। গৌতম যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে তখন।

এমনি করেই গৌতমের হবিষ্যের একমাস কেটে যায়। একদিন দিলীপ এসে এ'কথা সে'কথার পর বলে,—আমারও যে ঢাকার পাট এবার উঠল, গৌতম।

চমকে উঠে গৌতম বলে—কীরকম?

দিলীপ বলে—তোর মন খারাপ হবে ভেবে এতদিন তোকে বলিনি। কিন্তু আগামী সপ্তাহেই আমাদের রংপুর চলে যেতে হবে। বাবা বদলি হয়েছেন।

—এই তো সবেমাত্র এক বছর হ'ল। এরই মধ্যে আবার বদলি কেন?

—এবারকার বদলির কারণ বোধ হয় আমি।

— তার মানে?

—মিছিলের দিনে বোমা ফাটার ব্যাপার নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে।

—কী—কী হয়েছে?—আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে গৌতম।

—পুলিশের সন্দেহ, এর পিছনে নিশ্চয়ই বিপ্লবী দলের হাত আছে,—প্রধান লক্ষ্য ছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্, পুলিশ সুপার,—হয়তো বা উভয়েই। নেহাৎ সৌভাগ্যবশতঃ তাঁদের কিছু হয়নি। বিপ্লবীদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার জন্যই ওঁরা বেচে গেছেন।

তা—তাঁদের সন্দেহটা তো মিছে নয়। কিন্তু তুই এর কারণ হলি কেন?

—মিছে না হলেও এব্যাপারে তারা তো কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি। তাই, হাঙ্গামা সৃষ্টি করার জন্যেই কোন অজানা দুষ্কৃতকারী জনতার মাঝখানে বোমা ছুড়েছিল—এ'ভাবে রিপোর্ট করে ব্যাপারটা তারা আপাততঃ ধামাচাপা দিয়েছে। নইলে অনেকেরই যে চাকরীতে টান ধরতো।

—সবই বুঝলাম, কিন্তু এর সঙ্গে তোর বাবার বদলির সম্পর্কটা কোথায়?

—কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও পুলিশ নাকি ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেবের নিকট আমার গতিবিধিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। তাই ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব একদিন বাবাকে ডেকে খুব সাবধান করে

দিয়েছেন। বাবাও এসব বাজে ঝামেলা এড়াবার জন্য বদলির দরখাস্ত করেছিলেন,—সুতরাং—

—সুতরাং এই বদলি, আর ঢাকা শহর থেকে তোরও প্রস্থান—গৌতম এ'কথা বলেই গুম হয়ে যায়।

সাতদিন পর সত্য সত্যিই দিলীপরাও যখন চলে গেল, তখন গৌতম একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। সে শুধু ভাবছে যে পৃথিবীতে এই নিঃসঙ্গ জীবন কাটানোই বোধ হয় তার বিধিলিপি।

দিলীপদের বিদায় জানাতে গৌতম যথারীতি স্টেশনে গিয়েছিল—গাড়িটাও তার নির্দেশিত সময়েই ছেড়ে দিল। যতক্ষণ দেখা গেলো, গৌতম শুধু বিস্ফারিত ছল্‌ছল্‌ দৃষ্টিতে ট্রেনটার গতিপথের দিকে তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ না গাড়িটা দূরদিগন্তে বাঁকের মুখে মিলিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে আসতেই ভাবে এই কঠিন পৃথিবীতে সত্যিই সে বড় একা—বড় অসহায়।

বাড়ি ফিরে এসে মনে হয় যেন সমস্ত পৃথিবীটা এই বাসাটার মতোই একদম ফাঁকা! নিজের শূন্য ঘরে ঢুকেই বিছানার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ তার নজরে পড়ে যে ঘরের ঐ কোণের দিকটায় এক মাকড়সা অবিশ্রান্ত জাল বুনে চলেছে। সেদিকে তাকাতেই গৌতমের মনে হয় সেও যেন এমনি একটা মাকড়সা মাত্র। তাই সে নিজের মনে শুধু চিন্তার জাল বুনে চলেছে। কিন্তু মাকড়সার তবু আশা আছে যে তার এই জালে একটা-না-একটা মাছি বা মশা ধরা দেবেই আর সেটাই হবে তার খাদ্য। কিন্তু আমি—আমি এই চিন্তার জাল বুনে চলেছি কিসের আশায়। আমার এই জালে আর কেইবা ধরা দেবে? একে একে পাওয়ার চেয়ে হারাবার অঙ্কই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাবা মা চলে গেলেন; কমল এল, দিলীপ এল, প্রবীর এল, তারা সবাই আমার বিষাক্ত কক্ষপথ থেকে ছেড়ে চলে গেল। কে জানে, কখনও তাদের কারও সঙ্গে আবার দেখা হবে কিনা। মণিকা?—হ্যাঁ, মণিকাও

এসেছিল, সেও চলে গেল—তাও সে এমনভাবেই গেল যে তার সঙ্গে এ'জীবনে আর দেখা হবে না,—যেমন দেখা হবে না আর কখনও তার বাবা-মার সঙ্গে। হায়রে জীবন!

মা ও মণিকার স্মৃতি একসঙ্গে জেগে উঠতেই অনেকদিন পর আজ ডাঃ চৌধুরী তাঁর মনে একটা যেন অস্বস্তি বোধ করে। বার্থটার উপর একটু সোজা হয়ে বসে সেই নিঃসঙ্গ দিনে হঠাৎ যে অনুভূতিটা তাঁর অবচেতন মনকে ভেদ করে সম্পূর্ণ নগ্নমূর্তিতে সামনে এসে ধরা দিয়েছিল তারই জন্য এই অস্বস্তি। নিজের অজ্ঞাতে গৌতম সেদিন আবিষ্কার করেছিল যে মণিকার প্রতি তার একটা অহেতুক আকর্ষণে কোথায় যেন তার মায়ের প্রতি আকর্ষণের সঙ্গে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মায়ের সান্নিধ্যে অনুভব করত যে একটা পরম প্রশান্তি, আর মণিকার সান্নিধ্যে অনুভব করত এমন একটা চপল চাঞ্চল্য, যার কোন ব্যাখ্যা আজও সে খুঁজে পায়নি। যখন মায়ের কাছে এসে মনে হত তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতে পারলে আর কিছুরই প্রয়োজন নেই, তখন মণিকার কাছে এলেই মনে পড়ত তার সেই সেদিনটির কথা—যেদিন মণিকা দিলীপের সঙ্গে প্রথম তাদের বাসায় এসেছিল, আর সেই প্রথম দিনেই সামান্য একটা কথা নিয়ে মণিকার চোখে সে যুগপৎ অশ্রু ও অগ্নিকণার সৃষ্টি করেছিল। বাসনা জাগত মণিকাকে বিপুল আবেগে জড়িয়ে ধরে আর গালে গাল রেখে বলে,—'ওগো, ভুল—সব ভুল। যা বলেছি তা আমার মনের কথা নয়। সে'কথা যদি জানতে চাও, তাহলে বলব—ওগো, তুমি যে আমার; তাই একান্তভাবে তোমাকে আমি চাই।" এই একান্তভাবে চাওয়াটা যে কী, তরুণ গৌতম তখনও ঠিক তা বুঝে উঠতে পারেনি। নীরবে শুধু অনুভব করেছে বুকের গভীরতম কোন এক অজ্ঞাত স্থানে অব্যক্ত একটা টন্‌টনে বেদনা আর সারা দেহে বিদ্যুৎ শিহরণ। বিশ বছর বয়সের তরুণ গৌতম এটুকুই বুঝেছিল মণিকাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে পারার ভেতর যেন একটা

তৃপ্তির সার্থকতা অপেক্ষা করছে। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পর সেদিনকার সেই ব্যাখ্যাহীন অনুভূতিটা নতুন করে ডাঃ চৌধুরীর মনকে দোলা দিয়ে যায় চলমান ট্রেনটার অবিশ্রান্ত দোলানিটারই মতো।

একটু সচেতন হয়ে ডাঃ চৌধুরী ভাবছেন,—তাইতো—কতক্ষণ ধরে ট্রেনটা ছুটে চলেছে, তার বিরাম নেই? সেই যে কখন বিলাসপুর ছেড়েছে রাত আটটায়, তারপর অনেকক্ষণ কেটে গেছে,—মনে হয় এক যুগ। মনে হতেই হাত ঘড়িটার দিকে তাকালেন ডাঃ চৌধুরী—সাড়ে ন'টা। এতক্ষণে মোটে দেড়ঘণ্টা কাটল? আর এটুকু সময়ের মধ্যে জীবনের কত অধ্যায়ই না কেটে গেল ডাঃ চৌধুরীর? মনের গতি আর সময়ের গতির মধ্যে যে এত ব্যবধান —এই মুহূর্তেই যেন ডাঃ চৌধুরী সেটা প্রথম আবিষ্কার করেন।

পরবর্তী স্টেশন ঝারসোগুড়া পৌঁছুতে এখনো প্রায় আরও এক ঘণ্টা বাকী। জানালাটা খুলে বাইরে আকাশটার দিকে ক্লান্ত দৃষ্টি ফেলে তিনি দেখেন সুদূর আকাশের বুকে ঝিক্‌মিকি সহস্র কোটি তারকার সভায় ঐ একফালি অষ্টমীর চাঁদটি স্বীয় শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবে বাঁকা হাসি হাসছে। প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ দেখে তিনি আবার আত্মহারা হয়ে যান। অলস আবেশে বার্থটায় এলিয়ে পাড়ি দেন আবার চিন্তা সাগরে।

বাসাবাড়ির নিঃসঙ্গতা এড়াবার জন্য শেষ পর্যন্ত গৌতম মেডিকেল মেসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। অতীতের স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে তাই আজ মনে পড়ছে—এমনি করেই সেদিনও এই এক ফালি চাঁদ হাসি ছড়াতো সেই মেডিকেল মেসের জানালা দিয়ে। সেখানে ঘর-কুনো বলে সবাই তার সঙ্গ এড়িয়ে চলত।

গৌতম আশা করেছিল—কমল ও প্রবীর নিয়মিত না হলেও অন্ততঃ মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে তার খবর নেবে,—আর দিলীপ? দিলীপ তো নিশ্চয়ই সপ্তাহে একখানা করে চিঠি দেবেই; অন্ততঃ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে গাড়িটা যখন ছাড়ো ছাড়ো করছে,

গৌতমকে জড়িয়ে ধরে কথা দিয়েছিল সে। অবশ্য প্রথম একটা মাস কথা রেখেছিল দিলীপ। দ্বিতীয় মাসে তা সাতদিন গড়িয়ে পনের দিনে দাঁড়িয়েছিল—তৃতীয়ে মাসে তা কমে হল মাত্র' একখানা। তারপর থেকে নীরবতার দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পর পর দশখানা চিঠি লিখেও কোন জবাব পায়নি গৌতম। কমল ও প্রবীরের দিক থেকেও সমান নীরবতা—কোন সাড়া নেই। গৌতম বলে যে কেউ ওদের একজন সঙ্গী ছিল কোনদিন, কেমন করে যে ওরা তা বেমালুম ভুলে গেল, সেকথা কিছুতেই বুঝতে পারে না গৌতম। অভিমানী মন তার তাই নিজেকে নিজের খোলাসে ঢুকিয়ে আত্মগোপন করেছে।

এদিকে মেসের সহপাঠীদের অনেকেই চেষ্টা করে গৌতমের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমাবার জন্য। তাদের কাউকেই আমল দেয় না গৌতম। শুধু ভাবে—এরাও তো প্রত্যেকেই কমল, প্রবীর আর দিলীপের মতোই ভুলে যাবে একদিন যে গৌতম নামে কোন এক বন্ধু তাদের ছিল।

এইটুকু বয়সে গৌতম বেশ বুঝতে পেরেছে যে সবার চেয়ে তার অকৃত্রিম বন্ধু একমাত্র ঐ মোট মোটা মেডিকেল বইগুলো। এদের কণ্ঠস্বর নেই, মুখ নেই এবং মানুষের মতো এরা অযথা কথা বলে না। কিন্তু আক্ষরিক ভাষার মাধ্যমে যে সব কথা ওরা বলে তাতে কিন্তু কোন খাদ নেই। তাই ওদের যদি কিছুমাত্র অস্তিত্ব থাকে, অন্ততঃ তার সঙ্গে ওদের বক্তব্যের কোন পার্থক্য নেই—এটুকুই সান্ত্বনা। কেবলমাত্র সেজন্যই এদের অকৃত্রিম বন্ধু বলে বিশ্বাস করতে গৌতমের মনে কোন দ্বিধা জাগে না।

তাছাড়া বাবাকে একদিন কথা দিয়েছিল গৌতম সে ডাক্তার হবে। ডাক্তার হয়ে আহত আর অসুস্থ মানুষকে সে ব্যথা-বেদনার হাত থেকে রক্ষা করে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলবে—তাকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু জন্মাষ্টমীর মিছিলের দাঙ্গায় যা ঘটে গেল, তা যেন গৌতমের সেই উচ্চ আকাংক্ষাকে লক্ষ্য করে

নিয়তির একটি তীব্র উপহাস। আততায়ীর ছোরার তীক্ষ্ণ আঘাত গৌতমের কাছ থেকে তার মাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। নিজের হাতের বোমার আঘাতে মণিকা প্রাণ হারাল। অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি সে। সে শুধু দেখেছে যে সেদিন ডাক্তাররা কেমন করে হেরে গিয়েছিল নিয়তির কাছে। আর ভেবেছে,—তাকেও কি এমনি করেই হার মানতে হবে একদিন?

—"না, কিছুতেই না"—দৃঢ় প্রতিজ্ঞ গৌতম মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে। এমন ডাক্তার হয়ে বেরুবে সে, যার কাছে নিয়তিকেও একদিন হার মানতে হবে—গৌতম ভাবে, আর ডুবে যায় সেই মোটা মোটা বইগুলোর ভেতর।

এমনিভাবে কেমন করে যে চার বছর কেটে গেল, নিজেই তা টের পায়নি গৌতম। হুঁস হল তার সেদিন, যেদিন খবর পেল যে ফাইনাল পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান অধিকার করতে পেরেছে, আর সার্জারিতে পেয়েছে রেকর্ড মার্কস। প্রিন্সিপাল নিজে এসে তাকে এই সুখবরটা দিয়ে অভিনন্দন জানালেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন যে তিনি আশা করছেন যে গৌতম মিড্‌ফোর্ডেই হাউস্ সার্জেন্ হয়ে কাজ শুরু করতে রাজী হবে। ব্যাপারটা আকস্মিক হলেও গৌতমের মোটেই অপ্রত্যাশিত মনে হয়নি। সে ঘাড় নেড়ে শুধু সম্মতি জানিয়েছিল প্রিন্সিপালের সহৃদয় প্রস্তাবে।

সেই রাত মেসের নির্জন ঘরটায় বসে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল গৌতম—বাবা আর মায়ের কথা ভেবে। আজ বেঁচে থাকলে কতই না খুশি হতেন ওঁরা। তাঁদের গৌতম কথা রেখেছে—ডাক্তার হয়েছে। এই সুসংবাদে আরও একজন হয়ত খুশি হত—সে মণিকা। কথায় কথায় মণিকাকে একদিন বলেছিল গৌতম, কেন সে ডাক্তারি পড়ার লাইনটা বেছে নিয়েছে। শুনে মণিকাও খুব খুশি হয়েছিল; আর মিছিলের আগের দিনই সে

বলেছিল—"গৌতমবাবু, কাজ সমাধা করতে গিয়ে যদি আমি আহত হই, তাহলে আপনি রইলেন আমার ডাক্তার। আর আপনি যদি হন আহত, আমি রইলাম আপনার নার্স, কী বলেন? বলেই একটা মৃদু চাপ দিয়েছিল গৌতমের হাতে। সারা অঙ্গে গৌতমের একটা বিদ্যুৎপ্রবাহের শিহরণ জেগেছিল। সেই মণিকাও আজ নেই।

ডাক্তার হয়েছে আজ গৌতম। কিন্তু কই মাকে বা মণিকাকে কাউকে তো ডাক্তাররা বাঁচাতে পারে নি। সে নিজেও কী পারত'? না। তার বাবাকেও তো কেউ আতলান্তিকের অতল থেকে তুলে আনতে পারে নি। এই-ই যদি মানুষের শক্তির সীমা, তবে কেন তার অহমিকা? ডাক্তার হয়ে মানুষের বেদনা লাঘব করতে পারবে বলেই সে ডাক্তার হতে চেয়েছিল। আজ যেন আর কোন উৎসাহ নেই তার। একা ঘরের ক্লান্ত নিঃসঙ্গতা মনকে দমিয়ে দিচ্ছে। বিছানায় শুয়ে এমনিভবে অতীতের স্মৃতিমন্থনে গৌতম যখন আত্মনিমগ্ন, মেসের দারওয়ান এসে খবর দেয় সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সাহেব তাকে ডাকছেন।

সার্জারির প্রফেসর ডাঃ ঘোষই মেসের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। গৌতম তার প্রিয় ছাত্র। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে গৌতম ডাঃ ঘোষের ঘরে যেতেই তিনি সহাস্যে এগিয়ে এসে করমর্দন করে তাঁকে টেনে নিয়ে জোর করে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। বললেন, কন্‌গ্রাচুলেশনশ্‌ মাই বয়। সার্জারিতে তোমার হাত যেমন পরিষ্কার, অমি জানতাম তুমি রেকর্ড মার্কস পাবে। শুধু তাই নয়, তুমি পাবে যে কোন সদ্য পরীক্ষোত্তীর্ণ মেডিকেল স্টুডেণ্ট-এর পরম কাম্য 'গোল্ড মেডেল'। প্রিন্সিপাল সাহেব তোমাকে যে প্রস্তাব দিয়েছেন তাও আমি শুনেছি। আর ইউ হ্যাপি?

গৌতম মাথা নেড়ে স্মিতহাস্যে জানায় সত্যি সে খুশি। একটু ইতস্ততঃ করে বলে—কিন্তু—

—এতে আবার কিন্তু কী?—জিজ্ঞাসা করেন ডাঃ ঘোষ।

—এমন কিছু নয়, তবে শুনলে হয় তো আনি হাসবেন।

—বলই না, শুনি।

আমতা আমতা করে মনের সব কথা খুলেই বলে সেদিন ডাক্তার ঘোষকে। অনেকটা হালকাও বোধ করে।

সব শুনে তিনি বলেন,—তোমার কথা সব বুঝেছি আমি। তবে কী জান প্রকৃতির আমোঘ শক্তির সামনে আমরা নগণ্য শিশু মাত্র। ডাক্তার হয়ে পীড়িত মানুষের ব্যথা বেদনার এতটুকুও যদি লাঘব করতে পারি তাই হবে আমাদের পরম সান্ত্বনা। অধিক লাঘব অসম্ভব। তাই বলব—হ্যাভ্ ফেইথ অন ডেস্টিনি। বী সেটিস্ফাইড্ উইথ হোয়াট লিট্‌ল্ ইউ ক্যান ডু ফর আওয়ার ফেলো-বীংস। উইস্ ইউ বেস্ট অব্ লাক্।

অনেকদিন পর সেই রাতে গৌতম অঘোরে ঘুমিয়েছিল।

॥ সাত ॥

পরদিন সকালবেলাটা গৌতমের কাছে সত্যি একটা আবিষ্কার। আজ পর্যন্ত কোনদিন এমন হাল্কা সে বোধ করেনি। পূবদিকের জানালা দিয়ে খানিকটা প্রভাতী কিরণ রঞ্জন-রশ্মির মতো তার বিছানাটাকে রাঙিয়ে তুলেছে। টেবিলের সামনে বসে দাড়ি কামাতে কামাতে সে দৃশ্যে নজর পড়তেই কে যেন অস্ফুট স্বরে তারই মুখ দিয়ে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতার প্রথম কটি লাইন আবৃত্তি করিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গৌতমের "স্বপ্নভঙ্গ" হতেই সে বুঝতে পারে যে আজ থেকেই শুরু হবে তার নতুন জীবন—ডাঃ চৌধুরীর জীবন। যেহেতু 'গৌতম' বলে ডাকবার মত আজ আর কেউ তার কাছে নেই। সবাই ডাকবে "ডাঃ চৌধুরী" বলে।

হঠাৎ আবৃত্তি বন্ধ করে সচকিত হয়ে উঠে গৌতম। হাতের ক্ষুরটা নামিয়ে রেখে আয়নাটার দিকে বিস্ময়াবিষ্টের দৃষ্টিতে তাকায়, —বুঝতে চেষ্টা করে, নবরূপে যার প্রতিবিম্বটা সামনের ঐ আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে, তাকে আজ কী বলে ডাকা যায়,—গৌতম, না ডাঃ চৌধুরী?

—"ডাঃ চৌধুরী" মনে মনে এই সিদ্ধান্তই করে নেয় গৌতম।

—কেন, গৌতম নয় কেন? নিজেকেই সে আবার জিজ্ঞাসা করে।

তারপর খেই হারিয়ে নিজেই তার জবাব খুঁজে বেড়ায়।

—সে-ও কি আবার বলে দিতে হবে? ভিতর থেকে কে যেন প্রশ্ন করে।

কে যেন আবার এই প্রশ্নেরই জবাব দেয়—আদর করে "গৌতম" বলে ডাকতেন তার বাবা আর মা, বন্ধুর ভালবাসা নিয়ে "গৌতম" বলে ডাকত কমল, দিলীপ, আর প্রায় নারীর সহজাত কুণ্ঠা নিয়ে "গৌতমবাবু" বলে ডাকত মণিকা। একে একে সবাই তারা "গৌতম"কে ফেলে সরে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হল গৌতমের, জন্ম নিলেন ডাঃ চৌধুরী।

—না, গৌতম আর নেই। তার মূর্তি নিয়ে আয়নাটার সামনে যিনি বসে আছেন, তাঁর নাম—ডাঃ চৌধুরী।

চলমান ট্রেনে কম্পমান বার্থটা ছেড়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠেন ডাঃ চৌধুরী। "I. R." ছাপ মারা সামনের আয়নাটার দিকে একবার তাকান। সেদিনকার সেই ডাঃ চৌধুরী, আর আজকের এই ডাঃ চৌধুরী কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় কিনা—বোঝার চেষ্টা করেন তিনি। অতীত আর বর্তমানের কোন মিল নেই দেখে হতাশ হয়ে আবার তাঁর বার্থটায় শুয়ে পড়েন। দুয়েতে কোন মিল থাক বা না-থাক, একথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে যে মিড্‌ফোর্ডের মেডিকেল মেসে সেই সকাল বেলাটায় তিনি আবিষ্কার করেন—যেন গৌতমের জায়গা দখল করে বসে আছেন একজন ইম্পস্টার—তার নাম ডাঃ চৌধুরী।

প্রাতরাশ সেরে নিয়ে ডাঃ চৌধুরী হাসপাতালের দিকে চলে যান। হাউস্ সার্জেন হিসেবে আজই তাঁকে জয়েন করতে হবে—শুরু হবে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়—চাকুরী জীবন। যথারীতি জয়েনিং রিপোর্ট দাখিল করে নতুন কাজের ফিরিস্তিটা বুঝে নিলেন সিনিয়রের কাছ থেকে। বেলা একটায় মেসে ফিরে এলেন মধ্যাহ্ন ভোজনের তাগিদে।

ইতিমধ্যে ঘরের সামনে কাগজের হকার যথারীতি দৈনিক খবরের কাগজটা রেখে গেছে। কাগজটা তুলে নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনামটায় নজর পড়তেই ডাঃ চৌধুরী চমকে উঠল। বড় বড়

হরফের শিরোনামটা তাঁর চোখের সামনে যেন উদ্দাম নৃত্য শুরু করে দেয়। ডাঃ চৌধুরীর কাছে সংবাদটা যুগপৎ পরম কাম্য, কিন্তু অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়—

"চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। শহব বিপ্লবীদের দখলে।"

—একি সত্যি? কমল, দিলীপ, প্রবীর ও মণিকার সঙ্গে যে বিপ্লবের স্বপ্ন একদিন ডাঃ চৌধুরীকে—না, গৌতমের মনকে চঞ্চল করে তুলত, সত্যি কি চট্টগ্রামে আজ তা স্বপ্ন রাজ্য ছেড়ে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসেছে? তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকে চেয়ারটায় বসে কাগজটার মধ্যে ডুবে গেলেন ডাঃ চৌধুরী।

ঠাকুর এসে খবর দেয়—ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখেন—বেলা দুটো বেজে গেছে। অথচ, আড়াইটায় আবার ডিউটিতে বেরুতে হবে। নেহাৎ অনিচ্ছা সত্বেও উঠতে হল। পেট এবং ডিউটি উভয়েব তাগিদে।

হাসপাতালেও সবার মুখে একই কথা। চাটগাঁ ইংরেজের হাতছাড়া হয়ে গেছে। শহর আজ বিপ্লবীদের দেখলে। অসামরিক ইংরেজ মেয়ে-পুরুষ পালিয়ে কর্ণফুলির বুকে স্টিমারে আশ্রয় নিয়েছে। উদ্দেশ্য—সমুদ্রপথে ওরা কলকাতা পালাবে। এমনি সব নানা গুজবে শুধু হাসপাতালই নয়, সমস্ত ঢাকা-শহরটাই গম্‌গম্‌ করছে। পল্টনের মাঠ নাকি গুর্খা সৈন্যে ভর্তি হয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা—চাটগাঁর মত এখানেও একটা লঙ্কাকাণ্ড বেধে যেতে পারে। তাই আগে থাকতেই নিরাপত্তার প্রস্তুতি চলছে। আরও কত কী।—

চার পাঁচদিন পর উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়। জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে সরকারী পল্টনদের খণ্ডযুদ্ধের কাহিনী সব কাগজেই প্রথম পাতার শীর্ষে প্রকাশ পায়।

ডাঃ চৌধুরী এই সব খবর শুনছেন, দেখছেন, আর হুতাশ মনে ভাবছেন—তিনিও তো এই বিপ্লবীদেরই একটা অংশ; অথচ,

কোন কিছুরই আঁচ পাচ্ছেন না কেন? না-ই বা হলেন তিনি কোন সক্রিয় সভ্য। মাস্টারদাই তো একদিন বলেছিলেন, এখানেও তাঁর কাজ করার অনেক কিছু সুযোগ মিলবে। কিন্তু কই, চাটগাঁয়ে এতসব কাণ্ডের পরও তাঁর যে কিছু করণীয় আছে, এমন কোন ইঙ্গিতও তো কোনদিক থেকে পাচ্ছেন না! স্বভাবতই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে—ঢাকার পার্টি শাখা কি তাহলে একেবারেই মৃত? প্রবীর বা দিলীপ এখানে থাকলে তবু না-হয় কিছু খবরাখবর পাওয়া যেত। এ যেন কোন এক অন্ধগলিতে ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। আশেপাশে এমন কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না, যার কাছ থেকে সঠিক নিশানা জেনে নেবেন। সবাই যেন তাদের সব দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। কারো দরজায় ঘা মারতেও ভয় হয়—পাছে গোয়েন্দা বা এমনি একটা কিছু মনে করে গোলমাল তুলে দেয়। তাই নিজের মনেই নিজে গুমরে মরেন ডাঃ চৌধুরী।

কিন্তু বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয়নি ডাঃ চৌধুরীকে। পাঁচ মাস যেতে না যেতেই একদিন সচকিত হয়ে উঠে ঢাকা শহরটাও। আই-জি লোম্যান ও পুলিশ সুপার হডসন্‌কে লক্ষ্য করে গর্জে উঠে বিপ্লবীর রিভলভার সেই মিডফোর্ড স্কুলেরই চত্বরে। সে আজ বত্রিশ বছর আগেকার কথা।

হাওড়াগামী বম্বে মেলের কামরাটায় বসে আজও যেন রূপালি পর্দায় বহু যুগ আগে সেলুলয়েডে ধরে রাখা সিনেমা ছবির মতো। সেদিনকার দৃশ্যগুলো ডাঃ চৌধুরীর চোখের সামনে ভেসে উঠে।

ভাদ্রের অপরাহ্ণ। গুমোট একটা আবহাওয়া শরীরটাকে যেন অবসন্ন করে দিচ্ছে। ডিউটি টেবিলে বসে পকেট থেকে রুমাল বের করে বার বার মুখের ও কপালের ঘাম মুছে দেহটাকে চাঙ্গা করবার চেষ্টা করছেন ডাঃ চৌধুরী। কিন্তু সব চেষ্টাই বৃথা। প্যাচ প্যাচে ঘামে গায়ের জামা শরীরের সঙ্গে যেন লেপ্টে গেছে। কিছুতেই যেন স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে না।

বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন ডাঃ চৌধুরী। হাসপাতালের সদর গেটের দিক থেকে পর পর কয়েকটা আওয়াজ ভেসে আসে, রিভলভারের গুলির মতো। আঁৎকে উৎকর্ণ হয়ে ওদিকে তাকান ডাঃ চৌধুরী। দেখতে পান একটা বেয়ারা ছুটে তাঁর দিকেই আসছে। সামনে ডাঃ চৌধুরীকে দেখতে পেয়ে সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল—"সাব খতম্ হো গয়া।"

—ক্যা বোলা?—কিছু বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করেন ডাঃ চৌধুরী।

—আই. জি. সাব্ ঔব্ পুলিশ সাব্—বলেই সে ছুটে অদৃশ্য হয়ে যায়।

হতভম্বের মতো পালিয়ে যাওয়া মূর্তিটার দিকে একবার তাকিয়ে গেটের দিকে পা বাড়াতে যাবেন এমন সময় আর একজন বেয়ারা সামনে এসে বলল—ডগ্ডর সাব্, ঘোষ সাব্ সেলাম দিয়া—

—কঁহা?

—অপরেশন কম্‌বেমেঁ—

তাড়াতাড়ি অপারেশন থিয়েটারের সামনে পৌঁছেই একটা কর্মচাঞ্চল্য ডাঃ চৌধুরীর নজরে পড়ল। চার-পাঁচজন নার্স এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে, সেই ঘোলাটে পরিবেশে তিনি হতচেতনের মত অন্যমনস্কভাবে করিডর ধরে এগিয়ে চলেন। পাশের ঘর থেকে ছুটে আসা একজন নার্সের সঙ্গে হঠাৎ মুখোমুখি সজোরে ধাক্কা লাগতেই দুজনেই পিছনে সরে যান যন্ত্রচালিতের মতো। ডাঃ চৌধুরী তাঁর নাকে প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করেন। এভাবে মুখোমুখি কলিশন্ এর জন্য ওঁরা দুজনের কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই অভ্যাসবশত "স্যরি" বলেই পকেট থেকে তাড়াতাড়ি রুমালটা বের করে নিজের নাকটা চেপে ধরেন ডাঃ চৌধুরী। রক্তে ভিজে গেল রুমালটা। বেশ খানিকটা টনটনে বেদনাও অনুভব করেন।

ধীরে মুখ তুলে সামনে তাকিয়ে দেখেন—কপালে হাত চেপে পাশের টুলটাতে বসে পড়েছেন কর্মব্যস্ত নার্সটি। চোখাচোখি হতেই দেখলেন, টানা টানা এক জোড়া বেদনাকাতর চোখ জলে টইটুম্বুর হয়ে যেন তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। আর সেই অপলক সজল দৃষ্টির মাঝখানে যেন ফুটে আছে দুটি নীলপদ্ম। গভীর অনুশোচনায় ডাঃ চৌধুরী রক্তরাঙা রুমালটা আবার চেপে ধরেন নিজের নাকে। কোন কথা না বলে নিঃশব্দে এগিয়ে যান টয়লেট রুমটার দিকে। বেসিনের কলটা খুলে নিজের নাকে-মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়ে রক্তস্রোতটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করেন। হঠাৎ পিঠে কার হাতের ছোঁয়ায় চমকে উঠে তিনি দেখেন সেই নার্সটি তার বাঁ-হাতটা ডাঃ চৌধুরীর পিঠে রেখে খুব আহতকণ্ঠে বলে ওঠে—"আই এ্যাম্ ভেরি সরি ডক্। ওড্ ইউ এ্যলাউ মি টু নার্স ইউ—প্লীজ।" ডাঃ চৌধুরীর কিছু বলবার অপেক্ষা না করেই নার্স তার নিজস্ব ছোট্ট রুমালটা ভিজিয়ে নিয়ে ডাঃ চৌধুরীর আহত নাকটায় মৃদু মৃদু চাপ দিয়ে রক্তপড়া বন্ধ করার প্রচেষ্টায় সচেষ্ট হয়ে উঠে। জলের শীতলতার চেয়েও ততোধিক স্নিগ্ধ সুগন্ধী রুমালের সেন্টের গন্ধ ডাঃ চৌধুরীর মনে একটা অদ্ভুত আমেজ ধরিয়ে দেয়। বুকের ভিতর একটা অজ্ঞাত প্রলয়ের দাপাদাপি অনুভব করেন তিনি। ম্লান হেসে নার্সের দিকে তাকান। অস্ফুট কাতরকণ্ঠে সে প্রশ্ন করে—খুব জোর লেগেছে, না?

ও কথার কোন জবাব না দিয়ে ডাঃ চৌধুরী বলেন—আপনার কপালটাও কিন্তু বেশ ফুলে উঠেছে, বলেই জলে ভেজা আর রক্ত মাখা ওঁর নিজের রুমালটাই দীপালির কপালের ফোলা জায়গাটায় চেপে ধরেন। আস্তে আস্তে তাঁর হাতটা সরিয়ে দিয়ে নার্স নিজের রুমালটা দিয়ে কপালটা মুছে নেয় এবং তারপরই সেটা ডাঃ চৌধুরীর নাকে চেপে ধরে। ডাঃ চৌধুরীর মনে হয়, নার্সের নিঃশ্বাসটাও যেন অস্বাভাবিকভাবে দ্রুত বইছে, যেমন বইছে তাঁর নিজের

নিঃশ্বাস। একে অন্যের অজান্তে দুদিক থেকে একই জিনিস চুরি করতে এসে দুটি শিশু যেন পরস্পরের কাছে ধরা পড়ে গেলে যেমনটা হয়।

সলজ্জভাবে দুজনেই পরস্পরের দিকে তাকায়। হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতেই নার্স কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

—"উঃ, সর্বনাশ"!—বলেই আর কোনদিক না তাকিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে করিডর ধরে ছুটতে থাকে সে।

ডাঃ চৌধুরীরও মনে পড়ে যায় যে ডাঃ ঘোষ তাঁকে তলব দিয়েছেন অপারেশন থিয়েটারে। তাই তিনিও দ্রুত পা চালিয়ে দেন সেদিকে।

কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার,—কিন্তু মনে হয়, যেন কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে। হয়ত অনেক দেরী হয়ে গেছে। কে জানে ডাঃ ঘোষ কি বলবেন—ভাবতে ভাবতে অপারেশন থিয়েটারে প্রবেশ করেন ডাঃ চৌধুরী।

এক নজরে দেখে নেন ঘরের ভিতরকার পরিবেশটা—ঘরের দুদিকে দুটি অপারেশন টেবিলে রক্তাক্ত দেহে শুয়ে আছেন দুজন ইংরেজ। চিন্তাক্লিষ্ট মুখে একজনকে পরীক্ষা করছেন প্রিন্সিপাল নিজে, সঙ্গে রয়েছেন রেসিডেণ্ট সার্জেন ডাঃ ধর। অপর টেবিলের পাশে ঝুঁকে রয়েছেন ডাঃ ঘোষ। ডাঃ চৌধুরীকে দেখেই নিঃশব্দ ইঙ্গিতে ডাঃ ঘোষ তাঁকে ডাকেন। ডাঃ ঘোষের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি ফিস্‌ফিস্ করে বলেন—Pretty serious case, অপূর্ব সুযোগ মিলবে তোমার এই একটা Complicated অপারেশন কেসে সাহায্য করতে। Attend to it—বলেই ডাঃ ঘোষ প্রিন্সিপালের সঙ্গে কন্সালটিং রুম্-এর দিকে চলে যান। ডাঃ ধর আর ডাঃ চৌধুরী রইলেন দু'জন আহতের পাহারায়। মিনিট পাঁচেক পরই আবার ওঁরা ফিরে এলেন অপারেশন থিয়েটারে। সঙ্গে সঙ্গে অপারেশনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। সন্ধ্যার দিকে কলকাতা

থেকে এসে পৌঁছুলেন কর্নেল এণ্ডারসন্—লাটসাহেবের খাস সার্জেন। স্থির হ'ল যে লোম্যানের অপারেশন করবেন কর্নেল এণ্ডারসন্, আর হড্‌সনের অপারেশন করবেন ডাঃ ঘোষ। এদিকে ডাঃ চৌধুরী থাকবেন ডাঃ ঘোষের সাহায্যকারী হিসাবে, আর কর্নেল এণ্ডারসনের সঙ্গে থাকবেন ডাঃ ধর।

ওদিকে সারা শহর জুড়ে শুরু হয়েছে পুলিশী তাণ্ডব। ঢাকা শহরের বুকের উপর দাঁড়িয়ে পুলিশের বড় দুই কর্তার উপর এমন অসমসাহসিক আক্রমণ—এ যেন সমস্ত পুলিশবাহিনীকে লক্ষ্য করে এক অসহ্য বিদ্রূপের অট্টহাসি। জবরদস্ত ইংরেজ সরকারের ততোধিক জবরদস্ত পুলিশের কাছে এই বিদ্রূপ অসহ্য। তাই ঘরে-বাইরে, রাস্তা-ঘাটে যেখানে-সেখানে পুলিশের শক্ত বেড়াজাল পাতা হয়েছে। যুবক মাত্রেই পুলিশের প্রশ্নবাণে জর্জরিত। কথায় বা চলনে একটু বেসামাল হলেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার, আসলে যাকে বলে—"reign of terror"—বিভীষিকার রাজত্ব।

ডাঃ চৌধুরী ভাবছেন—'মাস্টারদা' যদি তাঁকে এ্যাকটিভ সার্ভিসে রাখতেন, তাহলে আজকের এই জয়তিলক পরবার সৌভাগ্য তাঁরও হতে পারত। কিন্তু নিয়তির কী নির্মম পরিহাস! যিনি আজ হতে পারতেন আততায়ী, তাঁকেই হতে হবে জীবনদাতা! অপারেশন টেবিলে শায়িত হড্‌সন্ সাহেবের দিকে কুঞ্চিত দৃষ্টিতে তিনি তাকান আর ভাবেন,—এই বিতর্কিত বিদেশীর অপারেশনটা সাক্‌সেস্‌ফুল করা না-করা তো এখন—কে যেন তাঁর মনে ধাক্কা মারে সজোরে।

—না, না,—একি সব ভাবছেন তিনি?—অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়। ডাঃ ঘোষ, যাঁর কাছে সার্জারিতে হাতে খড়ি, তাঁর বলা সেদিনকার কথাগুলো মনে পড়ে যায়। তিনি বলেছিলেন—"পীড়িত মানুষের কষ্টের এতটুকুও যদি আমরা লাঘব করতে পারি, তাই হবে আমাদের পরম সান্ত্বনা।

কোন ডাক্তারের পক্ষে এভাবে একটা সিরিয়াস্ অপারেশন সাকসেসফুল্ না করার চিন্তাটাও মহাপাপ। তবু,—তবু যেন চিন্তাটাকে একেবারে দাবিয়ে রাখা যায় না। যে জাতির মানুষ প্রাণচঞ্চল একটা দেশকে এমন ভাবে দাবিয়ে রাখতে চায়, যাদের ভাড়াটে পুলিশবাহিনী সারা ঢাকা শহরকে তছনছ করে বেড়াচ্ছে, তাদের প্রতি কোনমতে করুণা দেখাবার জন্য মনের মধ্যে কোন তাগিদই যেন সাড়া দেয়না। কর্তব্য—শুধু কর্তব্য,—একজন ডাক্তার হিসাবে শুধু করণীয় তাগিদ ছাড়া আর কোন দায়িত্ব আছে—এ'কথা ভাবতেও যেন কষ্ট হয়।

ডাঃ ঘোষ তৈরী হয়ে এসেছেন। এনেসথেসিস্ট্ তার সহকারীদের নিয়ে প্রস্তুত। নার্সের হাত থেকে এপ্রন্ আর মাস্কটা নিয়ে ডাঃ চৌধুরীও তৈরী হয়ে নিলেন। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে যন্ত্রচালিতের মতো চলল অপারেশনের কাজ। একঘণ্টা পর হাতের শেষ সেলাইটা সেরে নিয়ে ডাঃ ঘোষ সোজা হয়ে দাঁড়ান। রোগীকে নির্ধারিত কেবিনে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে ডাঃ চৌধুরীর কাঁধে হাত দিয়ে মৃদু একটা চাপ দেন ডাঃ ঘোষ। তারপর ধীর পদে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। ডাঃ চৌধুরীও তাঁর পিছু পিছু বেরিয়ে টয়লেট্ রুমের দিকে এগিয়ে যান। অপারেশন থিয়েটারের অন্য টেবিলে কর্নেল এণ্ডারসন্ তখনও অপারেশনের কাজে ব্যস্ত।

টয়লেট্ রুমের দরজাতেই আচমকা আবার সেই নার্স-এর সঙ্গে দেখা।

—"আপনাকে বড্ড টায়ার্ড দেখাচ্ছে, ডাঃ চৌধুরী"—

হঠাৎ তার কণ্ঠস্বরে চমকে তাকাতেই ডাঃ চৌধুরীর হৃদপিণ্ডটা যেন তড়াক্ করে লাফিয়ে ওঠে। কে জানে, কী মায়া জড়ানো আছে ঐ কণ্ঠস্বরে। ম্লান হেসে তাই জবাব দেন ডাঃ চৌধুরী—অপারেশনটা সত্যি খুব টায়ারসাম্ ছিল, মিস্—

—বাগ, মিস্ দীপালি বাগ—সম্পূর্ণ পাদপূরণ করে দেয়

দীপালি। তারপরই আবার প্রশ্ন করে—কিরকম মনে হয়?—সাক্সেস্ফুল—মানে, মিঃ হুড্সন্ ভাল হয়ে উঠবেন তো?

—এ যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেলেন বলেই তো মনে হচ্ছে, তবে কি জানেন, আমাদের যতটুকু সাধ্য, ততটুকুই করতে পারি। ফলাফলের উপর কোন হাত আছে কি-না বলা শক্ত।

হৃদ্পিণ্ডের দাপাদাপিটা যেন একটু সহজ হয়ে আসে। তাই কথাও সহজভাবেই বলা যায়।

—ডাঃ ঘোষের খুব হাতযশ আছে। তাছাড়া আপনিও তো সার্জারিতে কীর্তিমান—

দীপালির মুখে এভাবে নিজের প্রশংসা শুনে হৃদ্পিণ্ডটা যেন আবার অশান্ত হয়ে উঠে। সেটাকে চাপা দিয়ে স্মিতহাস্যে বলেন চৌধুরী—

—কী যে বলেন; কোথায় ডাঃ ঘোষ,—আর কোথায় আমি—

বলেই চট্ করে টয়লেট রুমে ঢুকে পড়েন ডাঃ চৌধুরী উত্তাল হৃদ্পিণ্ডটাকে শান্ত করতে। বেসিনে হাত মুখ ধুতে ধুতে ভাবতে থাকেন—অমন লাজুকের মতো পালিয়ে না এসে আরো একটু কথা বললে ক্ষতি ছিল কি? তার এভাবে চলে আসায় মিস্ বাগ কী ভাবল, কে জানে? হয়তো ভাববে—লোকটা নিরেট গোবেচারি—একেবারে সেকেলে। সঙ্গে সঙ্গেই আবার নিজেকে সান্ত্বনা দেন—ভাবুকগে সে যা খুশি—তাতে তার বয়েই গেল। হাত-মুখ ধুয়ে মুছে বেসিনের আয়নাটার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ নিজের প্রতিবিম্বটার দিকে তাকিয়ে রইলেন ডাঃ চৌধুরী।

চোখে ঘুম নেই। বিছানায় শুয়ে সেই রাতে কিছুতেই ঘুম আর আসে না তাঁর চোখে। দীপালি আর হড্সন্,—হড্সন্ আর দীপালি,—দুয়ে মিলে সব ঘুম যেন কেড়ে নিয়েছে। ভাদ্রের এই ভ্যাপসা গরমে তিনি রীতিমত ঘেমে উঠেছেন। পাখার হাওয়াও কোন আরাম দিতে পারছে না। বিরক্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে

বারান্দায় এসে দাঁড়ান। আকাশের তারাগুলো তাঁর এই দুরবস্থা দেখে যেন মিটিমিটি হাসছে। রাস্তার বাতিগুলো বোকার মত আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে নীরবে। তিনি একান্তে ভেবে চলেন—কে জানে,—হয়ত এরই পিছনে কোন একটা অজানা বাড়ির ছোট্ট একটা ঘরে দীপালি পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। হাসপাতালের নির্দিষ্ট সেই কেবিনটায় সংজ্ঞাহীন হড্‌সন্‌ও ঘুমিয়ে আছে। শুধু ঘুম নেই ডাঃ চৌধুরীর চোখে।

হড্‌সন্ হয়তো বেঁচে যাবে,—তখন ডাঃ ঘোষের হবে জয়জয়কার। সেই জয়ের অংশীদার অবশ্যি ডাঃ চৌধুরীও হবেন। কিন্তু সত্যি এটা জয়—না পরাজয়? যে বৈপ্লবিক স্বপ্ন নিয়ে কলেজ জীবন শুরু করেছিলেন, তার কি আজ এই পরিণতি? যে হড্‌সন্‌কে মেরে একজন হাসিমুখে যাবে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে, সেই হড্‌সন্‌কে বাঁচিয়ে তোলার ভাগীদার হলেন ডাঃ চৌধুরী—ভাবতেও যেন কেমন লাগে। দলের প্রতি এ তাঁব চরম বিশ্বাসঘাতকতা! এ তাঁর পরাজয়—নিয়তির কাছে তাঁর চরম পরাজয়। এই পরাজয়ের লজ্জাকে ঢেকে দেবার জন্যই বুঝি দীপালি এসে দাঁড়ালো নীল চোখের আবেগ নিয়ে।—ট্রেনের এই নীল বাতিটার মতোই পরম একটা প্রশান্তি নিয়ে। তাঁব বাবার সেই নীল চোখের মতোই গভীর একটা দরদ নিয়ে। ঘুমন্ত এই শহরটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ডাঃ চৌধুবীর উত্তপ্ত মস্তিষ্কটা যেন কিছুটা শান্ত হয়ে আসে। ধীরে ধীরে তিনি ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েন।

মেসে আর থাকা চলে না। ছাত্রজীবন শেষ করে কর্মজীবন শুরু হয়েছে, তাই দুদিন বাদেই চলে যেতে হয় তাঁর জন্য রক্ষিত নির্দিষ্ট ছোট্ট কোয়ার্টারে। হাসপাতালের ওয়ার্ড-বয় নরেন্দ্রও থাকে এই কোয়ার্টারেরই অপর একটা ঘরে। নিজের রান্নাবান্না নিজেই করে সে। ডাঃ চৌধুরীর রান্নার ভারও সে নিজের হাতে তুলে নেয়। পাশেই নার্সদের মেস—দীপালি সেখানেই থাকে। রাত্রির স্তব্ধতায়

দীপালির দ্রুত নিঃশ্বাসের স্পন্দন যেন অনুভব করেন ডাঃ চৌধুরী তাঁর শূন্য বিছানাটায় শুয়ে শুয়ে। অনুশাসনের সব গণ্ডি ভেদ করে তার প্রতিটি অঙ্গ আজ দীপালির সান্নিধ্য কামনা করে। দীপালির সঙ্গে সেদিনকার সেই আকস্মিক সংঘর্ষ চকমকি পাথরের মতো যে আগুনের টুকরো ছিটিয়ে দিয়েছিল, আজ তাই ডাঃ চৌধুরীর প্রতিটি শিরায়-উপশিরায় লেলিহমান আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, আর তারই উত্তাপে আহোরাত্র দগ্ধে মরছেন তিনি। এই মরণেও যেন কতো আনন্দ। তাই কী এক নতুন অনুভূতিতে যেন একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েন। রাতের অন্ধকারে যে কামনার তাড়না তিনি অনুভব করেন, দিনের আলোতে সেই উত্তাপ তাঁকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় হাসপাতালের করিডরে করিডরে,—দীপালির একটু দর্শন লালসায়। মাঝে মাঝে অবশ্য দেখতে পান যেন চকিত হরিণীর মতো কর্মরতা দীপালি ছুটে বেড়াচ্ছে—এঘর থেকে ওঘরে। ইচ্ছা করে তাকে কাছে ডেকে দুটো কথা বলেন। কিন্তু কর্মব্যস্ততার মধ্যে বাধা দেওয়া অশোভন ভেবে নিশ্চেষ্ট হয়ে যান। মনে মনে তিনি নিজেকে ধিক্কার দেন—তুমি কাপুরুষ,—তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। দ্বিধা আর দ্বন্দ্বে মনটা এক-একবার বিদ্রোহ করে উঠতে চায়। দ্রুতপদে করিডর দিয়ে এগিয়ে যান তিনি দীপালির পথরোধ করে দাঁড়াবার জন্য, কিন্তু হাত দুটো তুলে একটু অভিবাদন জানিয়েই দীপালি পাশের ঘরটায় অদৃশ্য হয়ে যায়, আর তিনি শুধু তাকিয়ে থাকেন।

একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে ডাঃ চৌধুরী ফিরে যান তাঁর নিজের ডিউটিতে। এলোমেলো অতীতের আর বর্তমানের সংঘর্ষময় অনেক ছোটখাটো ঘটনার কথাই তাঁকে চঞ্চল করে তোলে। সবার উপরে মনে ভেসে ওঠে সেদিনের সেই মণিকার মুখ। বড় অল্প সময়ে সে বিলীন হয়ে গেল। কিন্তু আজকের দীপালি কেন আবার তার মনে এমন আলোড়নের ধাক্কা দিচ্ছে! তাকে একটু দেখা, একটুকু কাছে পাওয়া, প্রাণখুলে দুটো কথা বলার জন্য দিবারাত্র ডাঃ চৌধুরীর মনে

এ কিসের বুভুক্ষু ব্যাকুলতা? কেন মানুষের এমনটা হয়? তবে কি তিনি দীপালিকে—ধ্যাৎ, এসব ভাবতেও কেমন লজ্জা করে। যাই হোক, দীপালির দর্শন আকাঙ্খায় তিনি ক্রমশঃ বড়ই অশান্ত হয়ে উঠতে থাকেন। মনটা কেমন হাহাকার করে।

এমনি নানা টুকরো চিন্তায় ডাঃ চৌধুরী যখন বিভোর, তখন একদিন সত্যিই হাসপাতালের করিডরে দীপালি মৃদু হেসে ডাঃ চৌধুরীর সামনে এসে সোল্লাসে বলে উঠে—কন্‌গ্রাচুলেশনস্‌ ডাঃ চৌধুরী।

—মানে?—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন ডাঃ চৌধুরী। এদিকে তাঁর অশান্ত বুক গুরু গুরু শুরু করে দিয়েছে। অসহায় দৃষ্টিতে তিনি তাকান—

মানে, হড্‌সনের অপারেশনটা সাকসেসফুল হয়েছে শুনলাম।

—তার জন্যে কন্‌গ্রাচুলেশনটা তো ডাঃ ঘোষেরই প্রাপ্য।

—আমি যদি বলি—আপনার মতো একজন সুযোগ্য সহকারী ছিলেন বলেই ডাঃ ঘোষের এই সাক্‌সেস্‌।

—একথা আর কেউ বললে আমি ভীষণভাবে প্রটেস্ট্‌ করতাম্‌, হেসে জবাব দেন ডাঃ চৌধুরী।

আর, আমি বলছি বলে,—মুচকি হেসে দীপালি জানতে চায়।

—মেনে নিচ্ছি.—হেসেই জবাব দেন ডাঃ চৌধুরী।

—কেন?—দীপালি উদগ্রীব হয়ে শুধোয়।

জবাব দিতে গিয়ে একটু ইতস্ততঃ করেন ডাঃ চৌধুরী। দীপালি তাঁর এই ভাবটা লক্ষ্য করে একটু জোর দিয়েই জানতে চায়—বলুন না, কেন?

একটা ঢোঁক গিলে ডাঃ চৌধুরী বলেন,—সেদিনই তো আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়, তারই সুফল।

—হ্যাঁ, পরিচয় তো সেদিন হয়েছিল বিরাট সংঘর্ষের মাধ্যমে। বাব্বাঃ যা রক্তপাত হয়েছিল আপনার, ভাবতেও ভয় হয়—বলেই

হেসে ওঠে দীপালি। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে আবার বলে,—উঃ, অজান্তে কী ব্যথাটাই না সেদিন দিয়েছিলাম আপনাকে, বাপ্‌স্‌—

—নাক দিয়ে রক্তপাত ঘটিয়েছিলেন বলেই না সেদিন আমার ভোঁতা মগজটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। আর তাইতো অপারেশন টেবিলে ডাঃ ঘোষকে নির্ভুল সাহায্য দিতে পেরেছিলাম—দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে জবাব দেন ডাঃ চৌধুরী।

দুজনেই একসঙ্গে হেসে ওঠেন।

—ইস্‌, এত মিষ্টি করে কথাও বলতে পারেন আপনি—চোখে-মুখে আনন্দের ঝিলিক মেরে বলে ওঠে দীপালি। তারপর ওয়ার্ডের দিকে পা বাড়ায়।

—তুমিই বা কম কিসে? আই মিন,—ঝট্ করে আপনি থেকে তুমি বলে ফেলে লজ্জায় পড়ে দীপালির দিকে তাকাতেই—

—থাক্, খুব হয়েছে, বলেই দীপালি তার নীল চোখের মধুর দৃষ্টিতে ডাঃ চৌধুরীর সারা দেহে অদ্ভুত একটা শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ে।

ধীরে ধীরে ডাঃ চৌধুরীও ডিউটি রুমে ফিরে যান। মাঝখানে যে পর্দাটা ছিল, সেটা সরিয়ে দিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে টেবিলে চাপা দেওয়া কাগজ-পত্রে মনোনিবেশ করেন।

তৃষ্ণার্ত দুটি প্রাণ যত গোপনেই মিলিত হবার চেষ্টা করুক না কেন, ব্যাপারটা বেশীদিন চাপা রইল না। কেন না, ঢাকা শহর তেমন কিছু বড় নয়। এখানে কে কখন কোথায় যায়, কে কী দিয়ে ভাত খায়, কখন বাড়ি থেকে বেরোয়, আর কখনই বা বাড়ি ফেরে, মোট কথা, পরস্পরের হাঁড়ির খবর প্রায় সবাই জানতে পারে। কাজেই, মিড্‌ফোর্ডের সেই ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে একে অন্যের খবর রাখা আরও সহজ।

বছরখানেক ঘুরতে না ঘুরতেই প্রথমে শুরু হল মৃদু গুঞ্জন,

তারপর চোখ চাওয়া-চাওয়ি এবং ক্রমশঃ প্রকাশ্যে মুচকি হেসে অনেকে ছায়ার মত ডাঃ চৌধুরী আর দীপালিকে হাসপাতালের করিডর থেকে করিডরে অনুসরণ করতে থাকে।

নবাবপুরের "ও-কে" রেস্তোরাঁয় চায়ের টেবিলে একদিন ডাঃ চৌধুরী বাধ্য হয়ে নিজেই কথাটা বলে—দীপালি, কিছু মনে করো না, এভাবে মেলা-মেশা করাটা বোধহয় আমাদের উচিৎ হচ্ছে না।

—মানে, এরই মধ্যে ঘেন্না ধরে গেল নাকি? দুষ্টুমির হাসি হেসে খোঁচা দেয় দীপালি।

—না-না, ঘেন্না নয়, একটু কেশে নিয়ে আবার বলেন—এবার ভাবছি গাঁটছড়াটা একটু শক্ত করেই বাঁধবো—

তার মানে? কিছু না বোঝার ভান করে প্রশ্ন করে দীপালি।

মানে খুবই সহজ। কু-লোকের মুখ চাপা দেবার ওটাই একমাত্র অস্ত্র।

সলজ্জ দৃষ্টিতে মুখ তুলে দীপালির সমর্থন কামনা করেন ডাঃ চৌধুরী।

দীপালির মুখখানা হঠাৎ মরার মতো ফ্যাকাসে হয়ে যায়। গভীর দুটো নীল চোখে জেগে উঠে কেমন যেন একটা ভয়বিহ্বল ভাব। যে ভয়টাকে এতদিন এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছে, এবার বুঝি সেটা নগ্ন মূর্তিতে তার সামনে দাঁড়ায়। কোন কথা বলতে পারে না। ঠোঁট দুটো অবাধ্য হয়ে কেঁপে কেঁপে উঠে।

অধৈর্যভাবে ডাঃ চৌধুরী বলেন—চুপ করে আছো কেন? কিছু একটা বলো।

ক্ষীণস্বরে দীপালি বলে, তুমি আমার অতীত পরিচয় কিছুই জানো না। না জেনে শুনে এদিকে তোমার পা বাড়ানো উচিৎ নয়, এটুকুই শুধু আমি বলতে পারি গৌতম। তার চেয়ে বন্ধুভাবে মেলামেশা করছি, সেভাবেই থাকা ভালো নয় কী?

আমি তো অতীতের দীপাকে বিয়ে করছি না, বিয়ে করছি

বর্তমানের দীপাকে। তা ছাড়া আমাদের এতদিনকার মেলা-মেশাটা বন্ধুত্বের গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক গভীরে শিকড় গেড়েছে সেটা কী তুমি অস্বীকার করতে পারো, দীপা? হাসপাতাল মহলে আমাদের নিয়ে যে গুঞ্জন চলছে সেটাও তোমার অজানা নেই। এখন আর পিছু ফেরা আমাদেব তুজনের পক্ষেই অসম্ভব। তুমি আর আপত্তি করো না দীপা।

কোন জবাব না দিয়ে দীপালি শুধু মাথা নিচু করে চায়ের কাপে অকারণ চামচটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে।

হঠাৎ গৌতম তার মুখটা তুলে ধরে দেখে ডাগর ডাগর তু' চোখে জল টলটল করছে নীলপদ্মে টলটলায়মান শিশিরবিন্দুর মত। তুঃখিতভাবে বলেন, আমার কথায় কী আঘাত পেলে দীপু?

বাঁ হাতের রুমালটা দিয়ে চোখ তুটো মুছে নিয়ে ধীরে ধীরে দীপালি বলে—না, তোমাব কথায় নয়, আমারই ভাগ্যের কথা ভেবে। আজই আমি মতামত কিছু দিতে পারব না। দয়া করে কয়েকটা দিন সময় দাও।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গৌতম বলে—বেশ, তাই হবে। চলো আজকে যাই।

নিঃশব্দে টেবিল ছেড়ে রেস্তোঁরার দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

। আট ।।

লোম্যানকে বাঁচানো গেল না। অকৃতকার্যতার ব্যর্থতা নিয়ে কলকাতা ফিরে গেলেন ইংরেজ সার্জেন কর্ণেল এণ্ডারসন। বেঁচে উঠলেন হড্‌সন্, কিন্তু চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে তাঁকে বিদায় নিতে হল বাংলা, তথা ভারতের রঙ্গমঞ্চ থেকে। অসময়ে রিটায়ারিং লীভ নিয়ে পাড়ি দিতে হলো স্বদেশের মুখে।

সার্জারিতে কালা আদমীর কাছে সাদা আদমীর পরাজয় ঘটল, কিন্তু তা সত্বেও ডাঃ চৌধুরী যেন গর্ববোধ করছেন না একটু। বরং দিনরাত একটা অপরাধবোধ যেন তাঁকে তাড়িয়ে বেড়ায়। এই ঢাকা শহরের বুকেই সেদিন জন্মাষ্টমীর মিছিলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে লক্ষ্য করে তিনি বোমা ছুঁড়েছিলেন। আর আজ পাঁচমাস যেতে না যেতেই বিপ্লবীর পিস্তলে আহত ইংরেজ পুলিশ সুপারের অপারেশন টেবিলে তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হল। আর এই সেই পুলিশ সুপার যাঁকে লক্ষ্য করে বোমা ছুড়তে গিয়ে মণিকা নিজের প্রাণ দিয়ে গেল। ছিঃ—ছিঃ এর চেয়ে মৃত্যুও ছিল তাঁর অনেক ভালো—ভাবেন ডাঃ চৌধুরী, আর ইচ্ছে করে তাঁর হাতটাকে নিজেই কেটে ফেলে দেন। তদুপরি এ ব্যাপারটা এমনি ধরণের যা অপরকে বলে মনটা একটু হালকা করবারও উপায় নেই। এমনি অসহায়, এমনি নিঃসঙ্গ তিনি।

পার্টিও যেন আজ কোন এক অজ্ঞাত কারণে ভুলে গেছে তাঁকে। কোনদিক থেকে কোন ঈপ্সিত ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। কানে কানেও কেউ বলে গেল না তাঁকে—একাজে তুমি হাত দিও

না, গৌতম। বললে না যদি কেউ, দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে তাঁকে সরিয়ে দিচ্ছে না কেন, এ জগৎ থেকে। একে একে যেন সবাই ছেড়ে গেল তাঁকে একটা বিষাক্ত সরীসৃপ ভেবে। এমন কী দীপালিও কেমন যেন সন্তর্পণে তাঁর সান্নিধ্য এড়িয়ে চলে। বিয়ের প্রস্তাব সম্পর্কে কয়েকদিন ভেবে নেবার জন্য সময় চেয়েছিল সে। কয়েকদিন ছেড়ে আজ দু'মাস কেটে গেল, কোন সাড়া নেই তার। হাসপাতালের করিডরে যদি বা কখনো দেখা হয়ে যায়, দীপালি এমন ভাব দেখায় যেন ডাঃ চৌধুরীকে জীবনে সে কখনো দেখেনি। পাছে ডাঃ চৌধুরী কোন প্রশ্ন করেন, তাই তাঁকে দেখামাত্র দীপালি পাশের রুমে ঢুকে পড়ে। অযাচিতভাবে একদিন তাঁকে কনগ্রাচুলেশনস্ জানিয়েছিল দীপালি হড্সনের অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছিল বলে। কিন্তু আজ একটু মৌখিক সৌজন্য জানাবার জন্যও এগিয়ে আসে না সে। মাটিতে মিশে যেতে চায় ডাঃ চৌধুরীর মন। অথচ, দীপালিকে সব কথা খুলে বলার জন্যে মন তাঁর পাগল হয়ে ঘুরে বেড়ায়। মরিয়া হয়ে একদিন করিডরে দীপালির পথরোধ করে দাঁড়িয়ে পড়েন ডাঃ চৌধুরী, বলেন—সন্ধ্যা সাতটায় "ও-কে"-তে আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্যে, দেখা পাবো কি ?

—আমার সময় হবে না। পথ ছাড়ুন, কেউ দেখে ফেললে আবার গাল-গল্প শুরু হবে—আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই পাশ কাটিয়ে দীপালি তার ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ে।

ডাঃ চৌধুরীর চোখ-মুখে কেউ একমুঠো ছাই ছুড়ে মারলেও বোধহয় এতটা অপমানবোধ করতেন না তিনি। সেই অপমানের বোঝা বুকে বেঁধে আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিলেন তাঁর ডিউটি রুমে। চেয়ারে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবেন ডাঃ চৌধুরী—দেখা করতে শুধু তীব্র আপত্তিই নয়, সম্ভাষণের "তুমি" থেকে আবার "আপনি"-তে চলে গেছে। দীপালির এই ভাবান্তরের কোন

কারণ খুঁজে না পেয়ে নিজের মনেই গুমরে মরেন ডাঃ চৌধুরী। একবার ভাবেন, মুখে আপত্তি জানালেও দীপালি ঠিকই যথাসময় "ও-কে"-তে হাজির হবে। আবার ভাবেন—না, দীপালি বোধহয় তাঁর সঙ্গে সব সম্পর্ক তুলে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু সত্যি যদি দীপালি "ও-কে"-তে হাজির হয়? তা হলে ভালই হবে, ডাঃ চৌধুরীর অনুপস্থিতিই হবে দীপালির অবজ্ঞার উপযুক্ত জবাব। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে শেষ পর্যন্ত না-যাওয়াই ঠিক করে ডিউটি শেষে কোয়ার্টারে ফিরে ক্লান্ত দেহটাকে বিছানায় এলিয়ে দেন।

পরদিন টেবিলে রাখা প্যাডের ব্লটিং পেপারটা পাল্টাতে গিয়ে হঠাৎ একটা জিনিস আবিষ্কার করেন ডাঃ চৌধুরী। ছোট্ট একটা শ্লিপে ছোট্ট করে লেখা একটি লাইন,—"ডেট্ দিয়ে অনুপস্থিত থাকাটা অত্যন্ত আন্‌ম্যানারলি।" বুঝতে অসুবিধা নেই কার লেখা ছোট্ট এই লাইনটি। বুকটা আবার টন্‌টনিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় একটু দুষ্টু বুদ্ধিও খেলে যায়। তিনি একটি শ্লিপে লেখেন—"ওয়মান, দাই নেম ইজ ফ্রেইলটি"। তারপর পাল্টানো ব্লটিংটার নীচে সেটা আবার চাপা দিয়ে রাখেন। বিকেলের ডিউটিতে এসে আবিষ্কার করেন যে তাঁর লিখে রাখা শ্লিপটা উধাও হয়েছে। জবাবে সেখানে আরেকটা শ্লিপ পাওয়া যায়। তাতে লেখা রয়েছে—"ম্যান, দাই নেম ইজ ভেনিটি।"

মাসখানেক এমনি করে ছেলেমানুষের মতো লুকোচুরি খেলা চলে দুজনাতে। তারপর একদিন "ও-কে" রেস্তোঁরায় সন্ধি স্থাপিত হয়ে যায় কোন এক মধুসন্ধ্যায়। সন্ধির শর্ত হল—আগের মতোই দুজনের স্বাভাবিক মেলামেশা চলবে। কোন পক্ষই কখনই বিয়ের প্রস্তাব আনতে পারবে না।

এ বিষয়ে দীপালিরই যেন ধনুর্ভঙ্গ পণ—কিছুতেই তার নড়চড় হবার উপায় নেই। নিঃসঙ্গ জীবনের একঘেয়েমির হাত থেকে

নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেই অগত্যা ডাঃ চৌধুরী দীপালির সব শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হন।

কিন্তু মন মানে তো হৃদয় মানে না। যুক্তি দিয়ে মনকে যদি বোঝাতে চায় গৌতম, তো হৃদয় ভীষণভাবে বিদ্রোহ করে। দীপালির অনিচ্ছাকে প্রশ্রয় দিতে রাজী নয় সে কিছুতেই। কেন? —নিজেকেই প্রশ্ন করে সে।—বিবাহে দীপালির আপত্তিটা কোথায়? দীপালির স্বামী হবার মতো যোগ্যতা তার নিশ্চয়ই আছে। তবে কেন দীপালির এত আপত্তি?

অন্তরের এ বিদ্রোহকে বেশীদিন চাপা রাখা সম্ভব হয় না। তাই বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ডাঃ চৌধুরী আবার প্রস্তাব জানায় দীপালিকে। কিন্তু দীপালি অনড়। বিয়ের প্রস্তাব শুনলেই চোখে মুখে তার মেঘের ছায়া নেমে আসে। শুধু বলে—আবার কেন ওকথা গৌতম?

—এভাবে আর দিন কাটাতে পারছিনা দীপা—আমি পাগল হয়ে যাব—বলেই তার হাতটা চেপে ধরে ডাঃ চৌধুরী।

আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দীপালি বলে—আমার পক্ষেও এই অবস্থাটা কম বেদনাদায়ক নয় গৌতম। কিন্তু—

—'কিন্তু টা' কি? আমায় একটু খুলে বলো। আমি জানতে চাই—এই মিলনে কোথায় তোমার বাধা।

মোহাবিষ্টের মতো দীপালি জবাব দেয়—তুমি সত্যিই জানতে চাও?

দীপালির কণ্ঠস্বর এত মৃদু হয়ে যায় যে গৌতমের মনে হয়—যেন অনেক দূরে সরে গেছে দীপালি। তাই তার কথা যেন হাওয়ায় ভেসে আসছে।

তাই দেখে গৌতম বলে—বেশ, বলতে তুমি না চাও, তো আমিও জানতে চাই না। কিন্তু তোমাকে আমার চাই-ই চাই। নইলে আমি বাঁচব না।

—পাগল ছেলে। আচ্ছা—আমার সম্বন্ধে তুমি কতটুকু জান, গৌতম। তুমি জান না—তোমাকে নিয়ে আমার কত বেদনা—

জানি, আমি সব জানি। সবার উপরে জানি—তুমি আমার দীপা, আর আমি তোমাকে ভালবাসি। তাব বেশী কিছু জানবার প্রয়োজন আমার নেই—

—আছে গৌতম, আছে। যাকে নিয়ে আজীবন ঘর করতে চাও, তার সব কিছু জানবার প্রয়োজন তোমার আছে। ভুলে যেয়ো না যে তুমি একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ডাক্তার—আর—। যাক্ সে সব কথা। আচ্ছা—কাল দুপুরে তো তোমার 'অফ্-ডিউটি' ?

—হ্যাঁ।

—আমারও তাই।

—তাতে কি ?

—কাল দুপুরে আমার ওখানে তোমার নেমন্তন্ন রইল।

—তোমার ওখানে ?—মানে—নার্সদের হোস্টেলে ?

—এই দেখো ; আমাকে এত ভালবাস, অথচ, আমি কোথায় থাকি, সে খবরটুকুও তুমি রাখ না ? বেশ ছেলে যা হোক।

দীপালির কথায় গৌতম যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। লজ্জিত হয়ে সে আবার জিজ্ঞাসা করে,—কেন, তুমি নার্সদের হোস্টেলে থাক না ? হোস্টেল ছাড়লে কবে ?

—তোমাকে উপলক্ষ্য করে হোস্টেলের মেয়েরা আমায় পাগল করে তুলেছিল। তাই আমি বাধ্য হয়েই মাসখানেক হল হোস্টেল ছেড়ে দিয়ে আর্মানিটোলায় একটা ঘর ভাড়া করে আছি এবং বেশ ভালই আছি।

—কই, আমাকে তো এসব কোনদিন বলনি ?

—তুমি কোনদিন জানতে চাওনি, তাই আমিও কিছু বলিনি। আরও জানতে চাও তো বলি—ওবাড়িতে আগে নাকি তুমি তোমার মাকে নিয়ে থাকতে।

এবার সত্যি সত্যিই গৌতমের অবাক হবার পালা। যে বাড়িতে একদিন গৌতম তার মাকে নিয়ে থাকত, সে বাড়িতে এখন দীপালি থাকে ? এ যেন অলক্ষেই দৈবের কোন সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিৎ। সংবাদটার আকস্মিকতায় তার শরীরের সব শিরা-উপ-শিরাগুলো উত্তেজনায় টগ্‌বগিয়ে ওঠে। উদগ্রীবকণ্ঠে গৌতম বলে —এতবড় সুসংবাদটা আমার কাছে এতদিন তুমি চেপে রেখেছ ? —তুমি তো সাংঘাতিক মেয়ে।

—সাংঘাতিক মেয়ে বলেই তো বলি---আমাকে বিয়ে করার আকাঙ্খা ছাড়।

—বাঃ রে, আমি বুঝি তাই বল্‌লাম ?

—সাংঘাতিক মেয়েকে কোন ছেলের বিয়ে করা উচিত কি-না, সে কথাটাই জানতে চেয়েছি তোমার মুখে।

—এ প্রশ্নের জবাব দেব কাল—অবশ্য যদি নেমন্তন্নটা ফিরিয়ে না নেও।

—মেয়েরা নেমন্তন্ন করে কখনো তা ফিরিয়ে নেয় না, বুঝলে ?

—বেশ, তাহলে কথা রইলো—কাল দুপুরে তোমার ওখানে খেতে যাচ্ছি।

—আর তখনই শুনতে হবে তোমাকে আমার সব কথা—

এক অস্বাভাবিক মানসিক উত্তেজনায় গৌতম অশান্ত হয়ে উঠে। সময় যেন আর কাটতে চায় না। এমনি নানা চিন্তায় অধীর গৌতম বেলা হয়ে গেছে মনে করে কখন যে আর্মানিটোলার সেই অতি পরিচিত বাড়িটার দরজায় কড়া নাড়ে, তার খেয়ালই নেই। হঠাৎ হাত ঘড়িটায় দেখে তখন সবে বেলা দশটা। ছুটির দিনে কোন বাঙ্গালীর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনের সময় নিশ্চয়ই এটা নয়। কিন্তু তখন আর ফিরে যাওয়া অসম্ভব। এরই মধ্যে ঝি এসে দরজা খুলে দিতেই, গৌতম তার পুরানো ঘরটায় ঢুকে অবাক হয়ে গেল ঘরের পরিপাটি সজ্জা দেখে।

একপাশে ছোট্ট একটা পড়ার টেবিল। তার পাশেই একটা বুক কেসে নানা ধরনের বই সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে। আরেক পাশে বসবার জন্যে একসেট্ সোফাও রয়েছে। দেয়ালে নামী শিল্পীদের আঁকা কিছু বাঁধানো ছবিও টাঙ্গানো আছে। নিবিষ্ট মনে গৌতম যখন ঘরের প্রতিটি প্রান্তের পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে গৌতমকে চমকে দিয়ে পিছন থেকে খিল্-খিল্ করে হেসে উঠল দীপালি। গৌতম ঘুরে দাঁড়াতেই সহাস্যে দীপালি বলে—বাব্বাঃ, তোমার এত ক্ষিধে পেয়েছে যে বেলা দশটাতেই এসে গেলে ?

অপ্রস্তুত গৌতম তার হাত-ঘড়িটায় আবার তাকিয়ে বলে,—ইস্-স্, তাই তো ? আমার একদম খেয়ালই ছিল না—এখনি কী করে চলে এলাম, আচ্ছা এখন বরঞ্চ যাই—বারোটায় আবার আসব, কেমন—বলে দরজার দিকে পা বাড়াতেই পথ আগলে দাঁড়ায় দীপালি। হেসে বলে খুব হয়েছে মশাই, এসেই যখন পড়েছেন, ভাত খাবার সময় না হলেও চা খাবার সময় নিশ্চয়ই গড়িয়ে যায়নি। এখানে লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপটি করে বসো, আমি এক্ষুণি চা নিয়ে আসছি। তারপর যত ইচ্ছে বই পড়ে সময় কাটাতে পারবে—বলেই গৌতমের দুই কাঁধে দু'হাত দিয়ে চেপে গৌতমকে সোফাটায় বসিয়ে দিয়ে বুক-কেসের দিকে ইঙ্গিত করে।

—কেন, তোমার সঙ্গে গল্প করেও তো সময় কাটান যায়।

—না, তা যায় না।

—কেন ?

—তাহলে না-খেয়ে থাকতে হবে।

—তার মানে ?

—মানে খুবই সোজা। আমি বসে গল্প করলে, রাঁধবে কে ?

—তুমিই রাঁধবে না কি ?

—নয়তো কি ঐ পরীর মা ?

—পরীর মা-টা আবার কে ?

—যে তোমায় দরজা খুলে দিল।

—ওই রাঁধুক না, তাতে ক্ষতি কি ?

—ওর হাতের রান্না গলা দিয়ে নামবে ?

—তোমার পাশে বসে গল্প করার সুযোগ পেলে, না খেলেও চলবে আমার।

—তোমার চললেও, আমার তা একেবারেই চলবে না। কেননা, খাবার জন্মেই আজ তোমাকে নেমন্তন্ন করে এনেছি ; আর তা আমি নিজের হাতে রেঁধেই খাওয়াব, বুঝলে মশাই। যাক গে, আপাততঃ একটু বসো তো—চায়ের জল চাপানোই আছে,— এক্ষুণিই আমি আসছি।

আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দীপালি ভেতরে চলে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই অপসৃয়মানার ঋজু দেহলতার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে গৌতম। হাসপাতালে আঁটসাঁট চুলের গোছা ঘিরে সাদা ধব্‌ধবে একটা রুমাল দেখতেই এতদিন অভ্যস্ত ছিল গৌতমের চোখ। আজ এই প্রথম তার নজরে পড়ল দীপালির নিতম্ব-লম্বিত ঘন কৃষ্ণ কেশরাজী। কী সুন্দরই না মানিয়েছে আজ তার দীপাকে !

চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে সোফাটায় গা এলিয়ে দিয়ে ভাবতে থাকে গৌতম।

—কী এত ভাবছেন, মশাই—বলতে বলতে এক হাতে চা, আর অন্য হাতে প্লেটে করে ডবল্‌ডিমের ওম্‌লেট্‌ নিয়ে ঘরে ঢোকে দীপালি।

গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে গৌতমও হেসেই জবাব দেয়—কী আর ভাববো বলো—ভাবছি শুধু তোমারই কথা।

সেন্টার টেবিলে চা আর খাবারটা রাখতে রাখতে হাল্কা সুরে দীপালি জানতে চায়—ভেবে-চিন্তে কোন হদিস্‌ পেলে ?

—মেয়েদের মনের হদিস্ কেউ কখনো পেয়েছে বলে জানা নেই আমার, তবু তাদের বাইরের রূপটা নিয়েই অনাদিকাল থেকে পুরুষ কতো না স্তুতি-গান করে এসেছে। আমি আর ব্যতিক্রম নই দীপা। তাই আজ তৃপ্ত কণ্ঠে বলি—কী সুন্দরই না তোমায় আজ লাগছে, দীপা।

গৌতমের কথাগুলো দীপালির মনেও হয়ত খানিকটা আলোড়ন আনে। তাই ক্ষণিকের জন্য দীপালির নীল দুটি চোখ যেন আবেশে বুজে আসে। নিঃশ্বাসও যেন বন্ধ হয়ে আসে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে দু'হাত তুলে বলে উঠে দীপালি—থাক, থাক—এত স্তুতিগান আব করতে হবে না। খুব হয়েছে ওদিকে রান্না আমার সব পড়ে আছে। লক্ষ্মী ছেলের মতো ওম্‌লেটটার সদ্ব্যবহার কর, আমি রান্নায় যাই, কেমন?

—হাঁ করে আছি, তুমি মুখে দিয়ে দাও—বলে সত্যি সত্যিই গৌতম হাঁ করে দীপালির দিকে মুখটা বাড়িয়ে দিল।

—কি ছেলেমানুষরে বাবা—এই নাও—হাসতে হাসতে দীপালিও চামচ দিয়ে খানিকটা ওমলেট্ কেটে নিয়ে গৌতমের "হাঁ-করা" মুখে দিয়ে দেয়।

এমনিভাবে ওম্‌লেট্ পর্ব শেষ হলে দীপালি বলে—এবার চা-টা খাও, আমি রান্নাঘরে যাই।

—মুখটা মুছিয়ে দেবে না?—বলেই দীপালির শাড়ির আঁচলটা টেনে ধরে গৌতম। একটা আকস্মিক উত্তেজনায় তার সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে পারিপার্শ্বিক সব কিছুর অস্তিত্ব যেন লোপ পেয়ে যায় গৌতমের। হঠাৎ সেই আঁচলটার সঙ্গে দীপালির হাতটাও সজোরে টেনে ধরে। টাল সামলাতে না পেবে দীপালি উপুড় হয়ে গৌতমের গায়েব উপর পড়ে যায়। বুভুক্ষু গৌতম তখন পরম আবেশে তার নরম দেহটাকে বুকে চেপে ধবে। দীপালির ওষ্ঠাধরে কম্পিত একটা চুম্বনও বুঝি এঁকে দেয় সে। দীপালির

পায়ের ধাক্কায় সেণ্টার টেবিলে রাখা কাপ-ডিশগুলো মেঝেতে ছিট্‌কে পড়ে ঝন্‌-ঝনাৎ আওয়াজ তুলে যেন তাদের সশব্দ প্রতিবাদ জানায়।

নিঃশব্দে দীপালি নিজেকে মুক্ত করে নেয় গৌতমের বাহুপাশ থেকে। ওদিকে দরজায় দাঁড়ানো পরীর মাকে দেখতে পেয়ে গৌতম কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে যায়। প্রায় ছুটতে ছুটতেই কোয়ার্টারে এসে গৌতম দুম করে দরজাটা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে। লজ্জায় মাটিতে সেঁধিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে তাঁর। হঠাৎ একি একটা কাণ্ড করে বসল সে। ছিঃ ছিঃ—দীপালির সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার আর কোন পথই রইল না আর।

চিরকাল যা ঘটে আসছে, এটাও তারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। নিজের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যই মানুষ ইপ্সিত ফললাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে যুগ হতে যুগান্তর। এই বঞ্চনার স্বাভাবিক বেদনার চেয়েও বেদনাদায়ক সাময়িক উত্তেজনার বসে কৃতকর্মেরই লজ্জা।

সেদিন সন্ধ্যার ডিউটিতে যাওয়া হয়নি ডাঃ চৌধুরীর। "সিক্ রিপোর্ট" পাঠিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে বিছানায় ছট্‌ফটিয়ে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দেন।

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে ছোট একটি অপ্রত্যাশিত চিঠি আসে।

আজ পঁচিশ বছর পরও তারই দুটি লাইন যেন জ্বল্‌-জ্বল্‌ করছে ডাঃ চৌধুরীর চোখের সামনে—

দীপালি লিখছে—

গৌতম,

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। বিয়ের তারিখটা ঠিক করার ভারও তোমার উপরই ছেড়ে দিলাম। ইতি—

দীপা

একবার নয়, দু'বার নয়—বার বার চিঠিটা পড়েও যেন বিশ্বাস করা যায় না এই চিঠির আসল বক্তব্যটা। গৌতম শুধু ভাবে—এও কি সম্ভব? মাত্র কালকের এত বড় একটা অপমানের পর তাকে বিয়ে করতে রাজী হওয়া কি সম্ভব দীপালির পক্ষে? যে প্রস্তাব আজ তিন বছর ধরে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে দীপালি, কেমন করে আজ তা এত সহজে গ্রহণ করবে সে? নিজেকে এত ছোট মনে হচ্ছে যে চিঠির সুস্পষ্ট ভাষাটাও যেন বিদ্রূপ বলে মনে হচ্ছে তার। এক বছর আগে যে কথা শুনলে তিনি আনন্দে মেতে উঠতেন আজ যেন তা নিতান্তই অর্থহীন। কোন মুখে দীপালির সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন স্বামীত্বে বরণের অধিকার নিয়ে? ক্ষমা—হ্যাঁ, কালকের দুর্বিনীত ও অশালীন ব্যবহারের জন্য সবার আগে প্রয়োজন দীপালির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। বিয়ের আগেই কলঙ্কিত পৌরুষের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। রাইটিং প্যাডটা টেনে নিয়ে লেখেন—

দীপা,

এ চিঠির বদলে তুমি আমায় চাবুক মারলে না কেন? ক্ষমার যোগ্য কী না, না জেনে বিয়ের তারিখ ঠিক করা নিরর্থক। ইতি—

গৌতম।

সন্ধ্যার দিকে জবাব আসে—

প্রিয় গৌতম,

ভালবাসা যেখানে হৃদয়ের দাবীদার, ক্ষমা সেখানে অনুগামিনী কিঙ্করী। তবু আবার বলব, যে কথা জানাবার জন্য আমার গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, দৈবচক্রান্তে তা আর বলা হল না। সব কথা বলা হোক বা না হোক্, অন্ততঃ একটি কথা না জানালে আমি চিরজীবন নিজের কাছে অপরাধী হয়ে থাকব। তাই শুধু সে কথাটাই বলছি

—আমি যখন মাতৃগর্ভে বাবা-মা তখন হিন্দু, অতি নিচু জাতের হিন্দু। আমি যখন ভূমিষ্ঠ হলাম তখন তাঁরা ক্রিশ্চান। ভালো-মন্দের বিচারটা তোমার ওপরই ছেড়ে দিলাম। ইতি—

তোমারই দীপা।

সম্ভাষনের শুরুতে 'প্রিয়', শেষান্তে 'তোমারই' এদু'টি ছোট্ট কথা অনেক কিছু বলে দেয় গৌতমকে। কিছুক্ষণ মোহাবিষ্টের মত চেয়ারটায় বসে থাকে সে। তারপরই তড়াক্ করে উঠে দাঁড়িয়ে অশান্তভাবে পায়চারি করে সারা ঘরটায়। আবার চেয়ারটায় চেপে বসে। রাইটিং প্যাড্টা টেনে নিয়ে খচ্খচ্ করে লেখে—

প্রিয়তমা দীপা,

যে ভালবাসা জাতপাত বিচার করে তাকে আমি ভালবাসা বলি না। তোমার কথামতো পুরো দায়িত্বটাই আমি মাথা পেতে নিলাম। দিন, তারিখ আর সময় নিজে গিয়ে জানাব। ইতি—

তোমারই গৌতম।

॥ নয় ॥

মিড্‌ফোর্ডের ছোট্ট সেই গণ্ডি প্রথম দিকে এই বিয়েটাকে সুনজরে না দেখলেও শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিল। চার বছর কেটে গেছে, ডাঃ চৌধুরী এখন রেসিডেন্ট সার্জেন্, দীপালিও মেট্রোনের পদে প্রমোশন পেয়েছে।

কর্মজগতের এই পরিবর্তনের সঙ্গে ধাপে ধাপে তাদের মনোজগতেও যে কখন একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে, ডাঃ চৌধুরী নিজেও তা বুঝতে পারেন নি। অথচ, দীপালি তাঁর হৃদয়ের স্নেহ-মমতা যেন গৌতমের জন্য উজাড় করে দিতে চায়। এতটুকু অভিযোগের সুযোগও গৌতমকে দিতে সে নারাজ। দীপালির যত্নের প্রাবল্য এক এক সময় তাঁকে তাঁর মায়ের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এতে ডাঃ চৌধুরীর কেমন যেন এক এক সময় অস্বস্তিবোধ করেন। ভাবেন—দীপালির কাছে কি তিনি মাতৃসুলভ স্নেহ-ভালবাসা চেয়েছিলেন? কিন্তু, কী যে তিনি চেয়েছিলেন, আর কী যে তিনি পাননি, অনুক্ষণ তারই সন্ধান খোঁজে ডাঃ চৌধুরীর মন। হয়ত তাই, অনেক সময়েই তিনি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন।

তাঁর ভাবান্তর দীপালির নজর এড়ায় না। আরও যত্ন—আরও আদরের প্রাচুর্যে ঘিরে রাখতে চায় সে গৌতমকে। কিন্তু অনেক সময়ই তার প্রতিক্রিয়া দাঁড়ায় বিপরীত। ডাঃ চৌধুরী নিজেই তা বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে পড়েন। আবার সে লজ্জা ঢাকার জন্য দীপালির সান্নিধ্য এড়িয়ে চলবার ঝোঁকও যেন পেয়ে বসে তাঁকে মাঝে মাঝে।

দ্বিধাগ্রস্ত মনের উপর আরও একটা চিন্তা তার কালো ছায়া বিস্তার করে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাকে দূরে সরানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বিয়ের আগে দীপালি একদিন বলেছিল, আমার সম্বন্ধে তুমি কতটুকু জান, গৌতম? সেদিন দীপালি বিশেষ করে যা জানাতে চেয়েছিল, তা জানবার কোন কৌতূহলই তখন অনুভব করেন নি ডাঃ চৌধুরী। কিন্তু বিয়েব পর সেই কথা জানবার একটা অত্যুগ্র আগ্রহ অনবরত যেন তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। দীপালীকে জিজ্ঞাসাও করেছেন কয়েকবার। জবাবে শুধু শুনেছেন, এখন আর সে-সব কথায় কাজ কি, গৌতম? তোমাকে আমি পেয়েছি আর আমাকেও তুমি পেয়েছ—এটাই কি আমাদের কাছে যথেষ্ট নয়?

দীপালি নিজে থেকে কিছু না বললে, গৌতমের পক্ষে এখন আব সে প্রশ্ন তোলা অন্যায়—খুবই অন্যায়, একথাও গৌতম বোঝে। কিন্তু তার উদ্‌ভ্রান্ত মন সব সময় সে যুক্তি মানতে চায় না। সাগবের বুকে নিম্নচাপ সৃষ্টিব ফলে পৃথিবীর বুকে যেমন ঝড়ের উৎপত্তি, তেমনি একটা ঝড় এসে ধাক্কা দেয় ডাঃ চৌধুরীর মনে—কিছু না জানার সেই শূন্যতাকে কেন্দ্র কবে। সেই ঝড় থেকে আত্মরক্ষার জন্যই যেন দীপালিকে এড়িয়ে চলবার ঝোঁক তাঁর আরও বেড়ে যায়।

দুটি প্রাণীর ছোট্ট এই সংসারে ধীবে ধীরে একটা অস্বস্তিকর গুমোট আবহাওয়া নেমে আসে। তাকে হালকা করবার জন্য প্রকৃতির যে নিয়ম বাঁধা আছে, তারও ব্যতিক্রম পীড়িত করে ডাঃ চৌধুরীর মনকে। কেননা, এ'সংসারে তাঁদের মধ্যে তৃতীয় প্রাণীর আবির্ভাব যে আর সম্ভব নয়, বিয়ের কয়েক দিন পরই তাঁর কাছে সেই সত্যটুকু আর গোপন থাকে নি। চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি শুধু প্রশ্ন করেছিলেন একদিন—"কেন এমনটা হল, দীপা"?

দীপালি মুখ নিচু করে শুধু বলেছিল—"একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে তুমি তো এ' প্রশ্নের জবাবটা নিজেই অনুমান করতে পারো, গৌতম। আমার বুক ভেঙ্গে গেলেও আমি নিজে এর বেশী আর কিছুই বলতে পারব না—তুমি আমায় ক্ষমা করো।"

তেমন উদগ্র বাসনা অবশ্য কখনও জাগেনি ডাঃ চৌধুরীর মনে। কিন্তু সন্তান-সুখ-বঞ্চিত হয়ে কাটাতে হবে তাঁকে সারা জীবন, এ সম্ভাবনার কথাও তিনি কল্পনা করেননি কোনদিন। তাই ছ'বছর কেটে যাবার পর একদিন রাত্রে ঠাট্টাচ্ছলেই বলেছিলেন—"সার্ভিস্ রুল থেকে মেটার্নিটি লীভ্‌টা এবার বোধ হয় তুলে দেবে।"

কিছুই না বোঝার ভাণ করে জবাব দিয়েছিল দীপালি—তার মানে ?

—মানে, যে রেটে সারা দেশময় ফ্যামিলি প্ল্যানিং চলছে, আমাদের তাতে এ'ছুটিটা রাখবার বোধ হয় আর প্রয়োজন থাকবে না।

—দিক না তুলে, তাতে আমাদের বয়েই গেল।

—কিন্তু দীপা, কচিমুখের "মা" ডাক শুনতে কোনদিনই কি তোমার মন চায় নি ?—সত্যি বলো।

কোন জবাব না দিয়ে পাশ ফিরে দীপালি বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। কিছুতে তাকে পাশ ফিরাতে পারে না গৌতম। তার দেহটা যেন কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেছে। খানিকক্ষণ পর গৌতম টের পায়, দীপালি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিছানা ছেড়ে বাইরের বারান্দায় এসে নীরবে বসে থাকে গৌতম। বাড়ির ভেতর থেকে আকাশের যেটুকু দেখা যায়, তাতে শুধু তার চোখে পড়ে সেখানে দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে মাত্র একটি নির্লজ্জ তারা। গৌতমের মাথার ভেতরটা যেন দপ্‌ দপ্‌ করছে। দু'হাতে কপালের দু'দিক চেপে ধরে চুপ করে বসে থাকে গৌতম।

এ'ভাবে কতক্ষণ যে কেটে গেল, কে জানে। হঠাৎ তার কাঁধে একটা মৃদুস্পর্শ অনুভব করে চমকে উঠে চোখ তুলে আকাশটার দিকে তাকায়। জ্বল্ জ্বলে সেই তারাটাকে আর দেখতে পায় না। ছাদের ওপাড়ে চলে গেছে বোধ হয়। পেছন থেকে ধরা গলায় আস্তে আস্তে দীপালি বলে, শোবে চল।

আর চুপ করে থাকা চলে না। তাই নির্লিপ্ত সুরে গৌতম বলে, —ঘুম পাচ্ছে না। তুমি শোও গে। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

—কেন রাগ করছ, বল তো?

—রাগ নয় দীপা—দুঃখ। কেন তুমি আমার কাছে এখনও একটা প্রহেলিকা হয়ে থাকবে—কেন তুমি সব চেপে যাবে?

—জানাবার চেষ্টা বহুবার আমি করেছি। তুমিই বার বার বাধা দিয়েছ। তোমার দুর্জয় ভালোবাসার দুরন্ত স্রোতে তৃণের মতো নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমার। বলতে যা চেয়েছিলাম, তা আর বলা হয়নি।

—কিন্তু এখন সেটা বলতে বাধাটা কোথায়?

—তখন যা বলা ছিল অতি সহজ, এখন তা হয়েছে অতি কঠিন। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি গৌতম—এ'নিয়ে তুমি আমায় আর প্রশ্ন করো না—বলেই দীপালি গৌতমের পায়ে লুটিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল।

একবার গৌতম ভাবে—পা দু'টো সরিয়ে নেবে কিনা। তারপর কী মনে হল তার, যে-ভাবে সে বসেছিল সেইভাবেই বসে রইল গৌতম। মনে হল, পায়ের তলা থেকে মাটিটা যেন আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। যে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে দীপালিকে একদিন বুকের কাছে টেনে নিয়েছিল, তাতে যেন ফাটল ধরেছে। ভূমিকম্পের ঝাঁকানিতে মাটির বুকে যেমন ফাটল দেখা দেয়, আর সেই ফাটল ভেদ করে যেমন বেরিয়ে আসে উষ্ণ জলধারা, তেমনি গৌতমের দু'পায়ের উপর গড়িয়ে পড়ছে দীপালির তপ্ত অশ্রুধারা। সারাদেহে

গৌতম একটা মৃদু কম্পন অনুভব করে। আস্তে আস্তে তার নিপীড়িত স্নায়ুমণ্ডলে একটা অভাবনীয় অবসাদ নেমে আসে। মোহাবিষ্টের মতো দীপালির ভূলুণ্ঠিত দেহটাকে কোলে তুলে নেয়।

জীবন-সায়াহ্নের সীমান্তে দাঁড়িয়ে নূতন করে সেই রাতের কথা আজ মনে পড়ে ডাঃ চৌধুরীর। বম্বে-মেল তখনও তার অপ্রতিহত গতি-বেগে ছুটে চলেছে পরবর্তী স্টপেজ ঝারসোগুড়ার দিকে। আর ঠিক এমনি অপ্রতিহত গতিতেই এগিয়ে এসেছে ডাঃ চৌধুরীর জীবন। স্টপেজের পর স্টপেজে সংগ্রহ করেছে তার পরবর্তী যাত্রার পাথেয়। আর্মানিটোলার ক্ষুদ্র আবাসের ছোট্ট বারান্দাটি সে যাত্রা-পথে এমনই একটি মাইলস্টোন, যাকে কখনও মন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। দীপালিকে বুকের কাছে পেয়ে গৌতম ভেবেছিল—দূরের আকাশ তার মুঠোয় ধরা দিয়েছে। কিন্তু সেই গভীর রাত্রের জ্বলজ্বলে তারাটার মতোই আবার সে দূরে সরে যায়। অবসাদগ্রস্ত মন নিয়েও সে অনুভব করেছিল—অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে দীপালি তাঁরই বুকের উপর আছড়ে পড়ে। প্রাণপণ আলিঙ্গনে তাঁকে জড়িয়ে ধরে তাঁর মুখ-গাল-কপাল চুম্বনের পর চুম্বনে ভরে দিয়েছিল। দূরে ঢং-ঢং-ঢং করে বেজে উঠেছিল ট্রেজারির ঘণ্টা। কাণের কাছে মুখ রেখে মৃদুস্বরে দীপালি বলেছিল—"রাত তিনটে বেজে গেল—ভেতরে চল।"

আর কোন দ্বিরুক্তি না করে দীপালির হাত ধরে ঘরে চলে যায় গৌতম।

পরদিন সকালে গৌতমের ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই দীপালি ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে তার সামনে এসে সহাস্যে দাঁড়ায়। চোখে-মুখে দুষ্টু হাসির ঝলক টেনে বলে—শুনেছি, গরম চা নাকি পুরুষ জাতির মেজাজ ঠাণ্ডা রাখবার অদ্বিতীয় দাওয়াই—তাই নিয়ে এলাম।

সগুস্নাতা দীপালির অপরূপ মূর্তির দিকে চোখে তুলে মৃদু হেসে

গৌতম বলে—দিনকা মোহিনী ঔর্‌ রাত্‌কা বাঘিনী। বলেই চায়ের কাপটা সরিয়ে রেখে এক হ্যাঁচ্‌কা টানে দীপালিকে নিজের পাশে বসিয়ে দেয়। তারপর চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে প্রশ্ন করে—কি গো, ঠিক বলিনি?

মাথা নিচু করে দীপালী জবাব দেয়—এমন রাত যেন আর না আসে।

—আমিও তাই বলি দীপা—এমন রাত যেন আর না আসে।

—সে আমার ভাগ্য।

—শুধু তোমাব নয়—আমারও দীপা।

এমনি করেই ওদের দ্বন্দ্ব কেটে গিয়ে আবার সন্ধি হয়। কিন্তু বিধি হয়ত বাম। তাই সপ্তাহ খানেক যেতে না যেতেই আবার কালো মেঘ নেমে আসে দু'য়ের মাঝে। দু'দিন ধরে গৌতম লক্ষ্য করে যে দীপালি কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গৌতমের কোন কথাতেই তেমন প্রাণ খুলে সাড়া দেয় না। এমন কি, তার সান্নিধ্যও যেন এড়িয়ে যেতে চায়।

সেদিনটা ছিল শনিবার। গৌতমেব ডিউটি বেলা দুটো থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। দীপালিব ডিউটি সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত বারোটা। বেরুবার মুখে গৌতমকে দীপালি জানায়—তাব শরীরটা ভালো নেই, সেদিনকাব মতো যেন তার বদলে অন্য কাউকে ডিউটি দেওয়া হয়।

—কেন, কী হয়েছে তোমার?—জিজ্ঞাসা করে গৌতম।

—বড্ড মাথা ধরেছে—বলে দীপালি।

একটা সেরিডন্‌ খেয়ে ঘুমিয়ে নেবার পরামর্শ দিয়ে গৌতম হাসপাতালে চলে যায়। যদি বিশ্রামের পব সুস্থ বোধ কবে তা'হলে যেন অযথা ডিউটি কামাই না করে। কিছু না বলে দীপালি চুপ করে শুধু মাথা নাড়ে।

ছটায় যখন সত্যি সত্যি দীপালি ডিউটিতে এলোনা তখন

গৌতমের মনটা চঞ্চল হয়ে উঠে। ভাবে—আরও অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো দীপা? সাড়ে ছ'টা নাগাদ মনের চঞ্চলতা আর রাখতে না পেরে এ্যাসিসটেন্টের উপর দায়িত্ব দিয়ে এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলে গৌতম বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। দরজার সামনে এসে অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে পড়ে—তালা ঝুলছে। বাড়িতে তালা লাগিয়ে কোথায় গেল দীপালি? সন্দেহ জাগে যে অসুখের কথাটা কিছু নয়, গৌতমের অজ্ঞাতে কোথাও যাবার একটা আছিলা মাত্র। মনের অবচেতনে সুপ্ত দৈত্যটা আবার যেন অবাধ্য হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌তে চায়। বিভিন্ন সময়ে ডিউটি থাকে বলেই সদব দরজার একটা চাবি গৌতমের কাছে, আর একটা চাবি দীপালীর কাছে থাকে।

পকেট থেকে চাবিটা বের করে দরজা খুলে ভেতরে যায় গৌতম। শোবার ঘরে ঢুকে এদিক্‌-ওদিক্ তাকাতেই একটা জিনিস গৌতমের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। দেখতে পায়—গল্পেব বইগুলো যে বুক সেলফটায় আছে, সেটা যেন কেমন অবিন্যস্ত। ব্যস্ততার সঙ্গে নাড়াচাড়া করে তাড়াতাড়ি সাজাতে গেলে যেমনটা হয়—অনেকটা তেমনি। আজ সকালেও কিন্তু এমনটা ছিলনা।

গৌতম ভাবে—বইগুলোকে এমন কবতে গেল কেন দীপালি? বিশেষ কবে বাড়িতে যখন আর কেউ নেই, তখন এটা যে তারই কাজ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। অন্যমনস্কভাবে এক-একটা করে বইগুলো যথাস্থানে সাজাতে লাগলো গৌতম। হঠাৎ একটা বইয়ের ভেতর থেকে একটা চিঠিব খাম গড়িয়ে পড়ল গৌতমের সামনে। খামটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখে অপবিচিত হাতে দীপালির নাম লেখা তাতে। ঠিকানাটা অবশ্যি হাসপাতালের। পোস্ট অফিসেব স্ট্যাম্প থেকে বোঝা যায়—দিন দশেক আগে এসেছে, পড়ে দেখবার স্বাভাবিক একটা কৌতূহল জাগতেই সৌজন্যবোধ তার পথ রুখে দাঁড়ায়, ভাবে—মালিকের অসাক্ষাতে চিঠি পড়াটা খুব ভদ্রোচিত কাজ হবে না। সঙ্গে সঙ্গে অবচেতন মনের দৈত্যটা

গর্জে ওঠে, নাঃ, যে মালিক অনাবশ্যক গোপনীয়তার আশ্রয় নেয়, তার সঙ্গে সৌজন্য রক্ষার কোন প্রশ্নই উঠে না। কৌতূহল আর সৌজন্যের প্রতিযোগীতায় শেষ পর্যন্ত কৌতুহলেরই জয় হয়। কম্পিত হস্তে খাম থেকে চিঠিটা বের করে পড়তে বসে গৌতম।

প্রথমেই নজরে পড়ে—চিঠিখানা "রূপালি" নামে কোন এক মেয়েকে উদ্দেশ্য করে লেখা, নিচে সই রয়েছে—ইতি 'অভিলাষ'। দীপালিকে লেখা চিঠি নয়, তাহলে। ছিঃ-ছিঃ, একি সব অন্যায় চিন্তা গৌতমের মনকে বিষিয়ে তুলেছে? যে চিঠি দীপালিরই নয়। তা নিয়ে তাকে সন্দেহ করা অন্যায়—ঘোরতর অন্যায়, কিন্তু তা-ইবা কেমন? খামের ঠিকানায় তো দীপালির নামই লেখা—তাহলে? নিঃসন্দেহ হবার জন্য আর একবার ঠিকানাটা দেখে গৌতম। ঠিকই আছে সব। তা'হলে এই রূপালি মেয়েটা কে? দীপালির কোন বোন হতে পারে হয়ত। কিন্তু তার কোনও বোন ত্রিসংসারে কেউ আছে, একথা কোনদিন তো দীপালি বলেনি! আর যদি তাই হবে, তাহলে খামের ওপর দীপালির নাম কেন?

এতগুলো প্রশ্নের কোনটারই যখন কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যাচ্ছে না, তখন চিঠিটা পড়েই এই সমস্যার সমাধান করা ভাল। হয়ত বা লিখিত বক্তব্যের ভেতর দিয়েই মীমাংসার কোন সূত্র পাওয়া যাবে, মনের এলোমেলো চিন্তার বলগা টেনে ধরে শেষ পর্যন্ত চিঠিটার দিকে চোখ ফেরালো গৌতম। চিঠিটা পড়তে থাকে সে—

রূপালি,

সুদীর্ঘ দশ বছর পরে তোমার সন্ধান পেলাম। ভেবেছিলে কলকাতা থেকে পালিয়ে গেলেই আমার কবল থেকে রেহাই পাবে? জেল থেকে বেরিয়ে কলকাতার আনাচে-কানাচে তোমাকে অনেক খুঁজেছি, আমায় জেল খাটানোর উপযুক্ত শাস্তি দেব বলে। তুমি ঢাকায় রয়েছ—খবরটা মিললো খুব আকস্মিকভাবে। পিকলুকে নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার? যেখানেই একটা কিছু মারামারি,

দাঙ্গাহাঙ্গামা, সেখানেই পিকলু। তাই কলকাতার নিরামিষ আবহাওয়া ছেড়ে ঢাকার সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ায় পাড়ি দিয়েছিল সে। সাতদিন যেতেই মাথায় জখম নিয়ে মিড্‌ফোর্ডে আশ্রয় নিতে হল তাকে। ব্যাণ্ডেজে চোখমুখ ঢাকা পিকলুকে তুমি চিনতে না পারলেও, সে কিন্তু ঠিক চিনেছিল তোমাকে। সুতরাং যথাসময়ে খবরটা আমার কাছেও পৌঁছে গেল।

বলতে পারো, পিকলু কেন তোমার কাছে আত্মপ্রকাশ করল না? আমি সেকথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাকে। জিভ্‌ উল্টে একটা আওয়াজ করে (ওটা ওর একটা মুদ্রাদোষ) বললে—"হুঁ, টের পেলে ঢাকা ছেড়ে রেঙ্গুন চলে যাবে না?—তখন?"—ব্যাটাব বুদ্ধি আছে, বলতেই হবে।

যাকগে, তার কাছেই শুনলাম তুমি নাম পাল্‌টিয়েছ এবং চাকরিটাও ভালোই। তাই কাল শুক্রবারের পরের শুক্রবার ঢাকার পথে পাড়ি জমাব ঠিক কবেছি। হাসপাতালে দেখা করাটা আমার পছন্দ নয়। তাছাড়া, শহরটা সম্বন্ধে কোন ধারণাও নেই আমার, তাই ভাবছি, স্টেশনে তোমার জন্য অপেক্ষা করাটাই যুক্তি-সঙ্গত হবে। সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখব। তুমি না এলে —অগত্যা হাসপাতালে। আর সেখানেও যদি দেখা না হয়, তবে সেখান থেকে তোমার আস্তানার খবরটা নিশ্চয়ই পেয়ে যাব। মোদ্দা কথা, সন্ধানটা একবার যখন পেয়েছি, তখন শুধু হাসপাতাল কেন—প্রয়োজন হলে পাতাল খুঁড়েও তোমাকে বের করবই করব। আমার বুকে প্রতিহিংসার আগুন এখনও জ্বলছে। সুতরাং —যাক্‌গে, আমি যা বলতে চাইছি, তা খুলে না বললেও বুঝতে তোমার অসুবিধা হবে না আশা করি। অতএব—সামনের শনিবারের পরের শনিবার ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনে—সন্ধ্যা ছ'ঘটিকা। ব্যস, আর কিছু বলবার দরকার নেই। ইতি—

অভিলাষ।

চিঠিটা পড়ে গৌতমের চোখের সামনে সারা বাড়িটা যেন দুলে উঠেছিল সেদিন, যেমন করে এই মুহূর্তে দুলছে হাওড়াগামী মেল ট্রেনটা। সেই পুরানো কথা মনে পড়ে যেতেই ডাঃ চৌধুরী তড়াক্ করে বার্থ টার উপর উঠে বসেন। মাথাটা যেন দপ্ দপ্ করছে। তাড়াতাড়ি উঠে টয়লেট্ থেকে চোখে মুখে বেশ খানিকটা জল ছিটিয়ে এসে ওয়াটার বট্‌ল থেকে ঢক্ ঢক্ করে অনেকটা জল খেয়ে নিলেন। তারপর আবার জানলার ধারটায় বসেন। ভাবতে থাকেন, সেই চিঠির কথা। তার ভাষা আর বক্তব্যের ভেতর থেকে একটা নোংরা ড্রেনের দুর্গন্ধ যেন সেদিন তাঁর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল।

তাড়াতাড়ি চিঠিটা আবার বইটার ভেতর রেখে দিয়ে কোনরকমে বইগুলো সেল্‌ফে তুলে রেখে উঠে পড়েছিলেন তিনি। কোথায় যাবেন—ঢাকা স্টেশন ?—না। সেখানে গিয়ে অভিলাষ নামক অজ্ঞাত পরিচয় বেয়াদপ লোকটাব সামনে দাঁড়াতে কোনই অভিলাষ ছিল না তাঁর। বরং বুড়িগঙ্গাব ঘাটে গিয়ে স্নিগ্ধ হাওয়ায় উত্তপ্ত মস্তিষ্ককে শীতল করা বেশী প্রয়োজন। দীপালি ফিরলে তার কাছেই জবাব চাইবেন। সঠিক জবাব না পেলে এখান থেকেই শুরু হবে ভিন্নপথে তাঁর ভবিষ্যৎ যাত্রা।

সদরঘাটের দিকেই তাই সেদিন পা বাড়িয়েছিলেন ডাঃ চৌধুরী। স্ট্র্যাণ্ড রোড্ আর সদরঘাট রোডের মোড়ে হঠাৎ একটা বিরাটাকার সাইনবোর্ড তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাতে লেখা—

Indian Army Medical Core
Requires Doctors to succour
The soldiers in the fighting front
Join to-day.
Recruitment Centre
Ramna, Dacca.

সাইনবোর্ডটা অনেকদিনই তিনি সেখানটায় হয়ত দেখেছেন। কিন্তু সেদিন বিশেষ একটা অর্থ নিয়ে যেন সেটা ধরা দিয়েছিল ডাঃ চৌধুরীর চোখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদিও শুরু হয়ে গেছে এক বছর হ'ল, কিন্তু সে বিষয়ে ভাববার কিছু আছে বলে মনে করেননি তিনি এতদিন। কোথায় প্যারি বা লণ্ডনের আকাশে বা সাহারার মরুভূমিতে যুদ্ধ হচ্ছে, ঢাকায় বসে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিইবা আছে? তবু সেদিন সন্ধ্যায় ঐ সাইনবোর্ডটাই তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকল যেন। কানে কানে বলছে—ঐদিকেই তোমার পথ গৌতম—এগিয়ে যাও। তীব্র বিদ্যুতের আলো পড়েছে সাইনবোর্ডটা জুড়ে। সেই আলোর টানে একরাশ পতঙ্গ ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে তার বুকে। ডাঃ চৌধুরী যেন তাদেরই একজন। বুড়িগঙ্গার স্নিগ্ধ হাওয়া তাঁর উদ্ধত চুলগুলোকে নাড়া দিয়ে যায়। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঘাসের উপরই ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দেন তিনি।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় বোধহয় একটু তন্দ্রাও লেগেছিল। হুঁস হল হঠাৎ একটা খোঁচা খেয়ে। চোখ রগড়ে উঠে দেখেন, একজন পাহারাওলা লাঠি হাতে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে—রাত হো গয়া, বাবুসাব কোঠিমে যাইয়ে!

কোন কথা না বলে তিনি ধীরে ধীরে বাড়ির পথে এগিয়ে যান। ভাবেন, দীপালিকে কী বলবেন, আর দীপালিই বা কী জবাব দেবে? ঘরে ফিরে গিয়ে দেখেন, দু'জনের খাবার সাজিয়ে তারই সামনে গালে হাত দিয়ে গুম্ হয়ে বসে আছে দীপালি। এ পৃথিবীর মানুষই নয় সে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আগত্যা তিনিই প্রশ্ন করেন—কী ব্যাপার, অমন চুপ করে বসে আছ যে?

চমকে উঠে দীপালি। উদাস দৃষ্টিতে গৌতমের দিকে তাকিয়ে শুধু বলে—ভাতটা বোধ হয় একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তুমি হাত-মুখ ধুয়ে এসো, আমিও ততক্ষণে ওটা গরম করে নিয়ে আসি।

দীপালিকে উঠতে বাধা দিয়ে গৌতম বলে উঠে—থাক, ঠাণ্ডা

বা গরম কোন ভাতই খাবার ইচ্ছে নেই আমার। মাথাধরা সেরেছে তোমার ?

—হ্যাঁ। কিন্তু খাবার ইচ্ছে নেই কেন ? এত রাতই বা হল কেন ?

—কৈফিয়ত চাইছ ?

—না।

—তবে ?

—স্ত্রীর পক্ষে ওটা একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন নয় কি ?

—তা বটে। তা'হলে স্বামীর দিক থেকেও স্বাভাবিক একটা প্রশ্নের জবাব দাও আগে।

—কী ?

—তুমি কখন বাড়ি ফিরেছ ?

—মানে !—দীপালির কণ্ঠে যেন একটু বিস্ময়মিশ্রিত বাণাহতা হরিণীর আর্তনাদ ফুটে ওঠে।

—আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তুমি কেমন আছ জানবার জন্য সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় বাড়ি এসে তোমাকে পাইনি। তাই কোথায় গিয়েছিলে এবং কেনই বা গিয়েছিলে, সেটুকু জানবার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে।

—আমায় তুমি সন্দেহ করছ ?

—তাই যদি করি, সেটা কি খুবই অসঙ্গত হবে ? ইচ্ছে করলে সে সন্দেহটা একমাত্র তুমিই দূর করতে পার। আর আমিও তো তার বেশী কিছুই চাইছি না।

—যা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই নিয়ে বারবার পীড়াপীড়ি করে লাভ নেই, গৌতম। আমায় তুমি ক্ষমা কর।

—বেশ, নিজে থেকে কিছুই যখন বলবে না, তখন আমিই তোমাকে সোজাসুজি আর একটা প্রশ্ন করছি। "অভিলাষ" লোকটি কে ?

এক লহমায় দীপালির মুখখানা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

নিশিতে পাওয়া অসহায়ার মতো বইয়ের সেল্‌ফ্‌টাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে থাকে গৌতমের মুখের দিকে।

নির্দয়স্বরে কঠোরভাবে বলে উঠে গৌতম—ওটাকে আড়াল করে কোন লাভ নেই, দীপালি। যা দেখবার, তা আমার দেখা হয়ে গেছে। তুমি কিছু না বল্‌লেও অনেক কিছুই আমি অনুমান করে নিতে পারি।

তবুও দীপালি নীরব, যেন বোবা হয়ে গেছে।

গৌতম বলে যায়—শোন দীপালি, আমি আর কিছুই জানতে চাইনে, আর কোন প্রশ্নও আমি করব না। এটুকু পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এখন থেকে আমাদের চলার পথ দু'দিকে মোড় নিয়েছে। তাই দু'জনেই একসঙ্গে একই পথে চলবার আর উপায় নেই।

দীপালি নিরুত্তর। শুধু তার পাতলা ঠোঁট দুটো যেন কিছু বলবার জন্য থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে থাকে।

তাই দেখে গৌতম প্রশ্ন করে—কিছু বলবে?

দীপালি শুধু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

—বেশ, আমারই যখন বলবার পালা, তখন আমিই বলি—এরপর এক শয্যায় শয়ন শুধু অনুচিতই নয়—মহাপাপ। আর এ বাড়িতেই যখন দ্বিতীয় শয্যার ব্যবস্থা নেই, তখন আমাকে বাকী রাতটার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা দেখতে হবে। কাল এসে আমার জিনিসপত্র যা নেবার নিয়ে যাব। গুড্‌নাইট্‌।

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে আবার ফিরে দাঁড়ায় গৌতম। বলে—কোন গসিপ্‌ বা স্ক্যাণ্ডেল্‌ যাতে না হয় তার জন্য ঠিক করেছি—মেডিকেল কোরে কালই আমি নাম লেখাব—চলি।

দীপালি যেন এবার কিছু বলার জন্য এক পা এগিয়ে আসে। তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ঝড়ের মতো রাস্তায় নেমে পড়ে গৌতম।

বাকী রাতটা স্টেশনের ওয়েটিংরুমে কাটিয়ে পরের দিন সকাল আটটায় রমনার রিক্রুটিং অফিসে গিয়ে যথারীতি ব্যবস্থা করে বেলা

ন'টায় আর্মানিটোলার বাড়ির সামনে এসে গৌতম দেখে, সদর দরজায় তালা ঝুলছে। চাবি তার পকেটেই ছিল। কম্পিতহস্তে তালা খুলে ভেতরে ঢুকে প্রথমেই তার নজর পড়ে, বসবার ঘরে সেণ্টার টেবিলের উপর একটা ভাঁজ করা কাগজ চাপা দেওয়া আছে। তাড়াতাড়ি কাগজের ভাঁজটা খুলে দেখে—কোন সম্বোধন নেই, কোন স্বাক্ষরও নেই, শুধু লেখা রয়েছে—

—"তোমাকে পেয়ে অতীত জীবনের শূন্যতাকে পূর্ণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য তা হতে দিল না। পুরুষ-শাসিত সমাজে দীপালি তার নিজস্ব মূল্যবোধে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হল। অতীত এসে পথরোধ করে দাঁড়াল, কাল রাতে তুমি চলে গেলে। ভাবলাম, আমিই বা আর থাকি কেন? —একবার আলনায় ঝোলানো শাড়িটার দিকে, আর একবাব উপরের কড়িকাঠটার দিকে তাকিয়ে যাবার পথটা খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু অতীত এসে আবার আমার পথ রুখে দাঁড়াল, অভিলাষের সঙ্গে 'এবাউট্ টার্ন' করে পেছনের দিকেই আবার যাত্রা শুরু করতে বাধ্য হলাম। পাথেয় রইল শুধু তোমার সঙ্গে যে কটি বছর কাটিয়েছি, তারই অম্ল-মধুর স্মৃতিটুকু। যদি ভুল করেও তুমি দু'ফোঁটা চোখের জলে তার মলিনতাটুকু মুছে দাও তো নিজেকে ধন্য মনে করব।—বিদায়—

লেখাটা পড়তে পড়তে কে জানে কেন সত্যি সত্যিই গৌতমের দু'চোখ বেয়ে ধারার মতো জল নেমে এসেছিল।

জানালার পাশ থেকে সরে এসে বার্থটার উপরে ঠিক হয়ে বসে দু'হাতে চোখ দু'টো মুছে নিলেন ডাঃ চৌধুরী। গাড়ির গতি মৃদু হয়ে এসেছে। নিদ্রালস কণ্ঠে কে যেন হেঁকে চলেছে—'ঝারসোগোদা'—'ঝারসোগোদা'—ক্যাক্ ক্যাক্ আওয়াজ করে ট্রেনটা তখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে গেল। ডাঃ চৌধুরী চোখ বুঁজে বসে ভাবতে থাকেন।

॥ দশ ॥

কটা বাজল?—মনে প্রশ্নটা জাগতেই হাত ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ে যায় ডাঃ চৌধুরীর। নীল বাতির আবছা আলো আর ঝাপ্‌সা চোখে মনে হয়, ঘড়ির কাঁটা দু'টো যেন পরস্পরের সঙ্গে লেপ্‌টে আছে।—তা'হলে এখন রাত বারোটা বেজেছে নিশ্চয়ই। এমনি সময়েই তো বম্বে মেলের পৌঁছবার কথা এই ঝারসোগোদায়।

ঘড়ির উপর নজর পড়তেই আবার তাঁর মন চলে যায় আর্মানিটোলার ছোট্ট সেই বাড়ির ছোট্ট সেই সংসারটার দিকে। সে রাতে যখন দু'টি প্রাণের সযত্নে সজ্জিত ছোট্ট সেই বাড়িটা থেকে ডাঃ চৌধুরী বেরিয়ে এসেছিলেন, তখনও এমনি রাত বারোটাই হবে হয়ত। ঘড়ির এই কাঁটা দু'টোর মতোই দুটি মন যেন একসঙ্গে লেপ্‌টে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু এক মুহূর্তে সব ওলট্ পালট্ হয়ে গেল। ঘড়ির ভেতরকার থেকে একটা স্প্রিং হঠাৎ ছিঁড়ে গেলে ঘড়ির কাঁটা দু'টো যেমন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এ যেন তেমনি একটা কিছু হয়ে গেল। দীপালি কোথায় বেরিয়ে গেলো জানা নেই, কখনো আর জানা যাবে কিনা, সেদিন অন্ততঃ ডাঃ চৌধুরী ভাবতেও পারেননি। তিনি নিজে মিলিটারি ট্রেনিং ক্যাম্প এবং আরও সাত ঘাটের জল খেয়ে অষ্টাদশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৪৫ নং ব্রিগেডের ডাক্তার হয়ে শুরু হয় তাঁর জীবনের নতুন আর এক অধ্যায়।

শুরু হয় বোম্বে মেলটার নতুন স্টেশনের দিকে যাত্রা। অবাক হয়ে ভাবেন ডাঃ চৌধুরী—সে আজ বিশ বছর আগেকার কথা,

অথচ মনে হয়, যেন এই সেদিনের কথা। মনস্তত্ত্ব বিশারদরা বলেন —বিশ বছরের জীবন কাহিনী স্বপ্নের ভিতর দিয়ে শেষ হতে বিশ সেকেণ্ডও লাগেনা। রায়পুরে কখন তিনি ট্রেনে চেপেছিলেন ?— সাড়ে পাঁচটায় ? তাহলে :ঘড়ির হিসাবে ঝারসোগোদা পৌঁছুতে সাড়ে ছ'ঘণ্টার বেশী লাগেনি। কিন্তু তিনি এরই মধ্যে সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের ঘটনাবহুল জীবনকাল পরিক্রমা করে ফেলেছেন। তা'হলে তিনিও কি স্বপ্ন দেখছেন এতক্ষণ ?

হয়তো স্বপ্নই, কিন্তু তবু তা, জীবনের অম্ল মধুর স্মৃতিতে রাঙ্গানো। সেই স্মৃতির অববাহিকা ধরে মন চলে যায় পিছনে ফেলে আসা দিনগুলির আনাচে-কানাচে। দীপালির সেই চিঠিখানা বুকপকেটে রেখে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে যান ডাঃ চৌধুরী রমনার রিক্রুটিং সেণ্টারে। দু'এক দিনেব মধ্যেই দেরাদুন ট্রেনিং ক্যাম্পে চলে যেতে হবে। এ'সময়টা মিলিটারি অফিসার্স মেসেই থাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। সেই মেসের খাটিয়ায় সটান-ভাবে শুয়ে পড়ে ভাবতে থাকেন ?—দীপালির কথাই। পকেট-থেকে চিঠিটা বের করে বার বার পড়তে থাকেন। কী করুণ সুব মিশে আছে এর প্রতিটি ছত্রে। অভিলাষ নামক লোকটাকে কেন্দ্র করে দীপালির জীবনে কী এমন ঘটেছে দূর অতীতে যা গৌতমকে সে খুলে বলতে পারেনি তারই অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে।

লাঞ্চের ঘণ্টা বেজে ওঠে। আর শুয়ে থাকা চলে না। তুমি অনড়-অচল হয়ে থাকলেও, সময়টা কিছু বসে থাকবে না। নির্দিষ্ট তার গতিবেগ নিয়ে সে এগিয়েই যাবে। তুমি চলতে না চাও, পিছনে পড়ে থাকবে। বিশ্বসংসারের তাতে এতটুকু ক্ষয়ক্ষতি কিছু নেই। চলমান জগতের নিষ্করুণ এই অবহেলার হাত থেকে আত্ম-রক্ষার জন্যে তোমাকেও হয় তাল মিলিয়ে চলতে হবে, নয় আত্মহত্যা করতে হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাই গৌতমকেও উঠতে হয় এবং হাতে মুখে জল দিয়ে লাঞ্চ রুমের দিকেই পা বাড়াতে হয়।

এমনি করেই শুরু হয় আবার গতানুগতিক জীবন। ঢাকা থেকে দেরাছুন, দেরাত্বন থেকে আম্বালা, তারপর কানপুর, পুনা, বাঙ্গালোর আরও কত শহর-নগর ঘুরে বেড়াতে হয় এক বছরের উপর। একচল্লিশ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে এলেন কলকাতায় অষ্টাদশ ভারতীয় সেনা বাহিনীর ৪৫নং ব্রিগেডের মেডিকেল কোরের ডাক্তার হয়ে।

সুদূর প্রাচ্যে তখন শুরু হয়ে গেছে জাপানের সঙ্গে আমেরিকার নৌযুদ্ধ। ৭ই ডিসেম্বর অতর্কিতে জাপান পার্লহারবার আক্রমণ করে আমেরিকার শক্ত এই নৌঘাঁটি প্রায় ধ্বংস করে দেয়, ঘায়েল হয় আমেরিকার অনেকগুলো জাঁদরেল আর মূল্যবান যুদ্ধ জাহাজ, যুদ্ধ যে আর শুধু ইউরোপের রঙ্গমঞ্চে আবদ্ধ থাকবে না, এ'কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে। উনচল্লিশ সালের সেপ্টেম্বর জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণকে কেন্দ্র করে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হয়েছিল, একচল্লিশের জুনে জার্মানী দ্বারা রাশিয়া আক্রমণ এবং ডিসেম্বরে জাপানের আমেরিকা আক্রমণকে কেন্দ্র করে তা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে।

ঘুমন্ত প্রাচ্য ভূখণ্ড ব্রিটিশ ও আমেরিকার সমবেত রণদামামা নির্ঘোষে সচকিত হয়ে উঠে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ হতে দ্বীপান্তর শুরু হয় জাপানী ফৌজের অবতরণ ও অগ্রগতি। খবর দূর প্রাচ্যে-ই নয়, নিকট মালয়ের পূর্ব উপকূলেও জাপানী সৈন্য অবতরণ করছে। সব কিছুকে ছাপিয়ে চাঞ্চল্যকর খবর এল ১১ই ডিসেম্বর—বৃটিশের ছুটি যুদ্ধ জাহাজ অপরাজেয় বলেই এতদিন পর্যন্ত যাদের খ্যাতি ছিল—"রিপাল্‌স্" ও "প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌স্" জাপানী ডাইভ্ বম্বারের আক্রমণে সাগরজলের অতলে তলিয়ে গেছে।

জনচিত্তে বৃটিশ সম্ভ্রম তখন ভরাডুবির মুখে। কলকাতার আকাশ বাতাস গুজবে গুজবে মুখরীত। নাগরিক জীবন পরস্পর বিরোধী সংবাদের স্রোতে চঞ্চল—উদ্বেল। একদিকে চলেছে নিষ্প্রদীপের

মহড়া, অপর দিকে চলেছে হোটেল-রেস্তোরাঁর পুরু পর্দার আড়ালে আলো ঝলমল 'হল'-এ শৌখিন নরনারীর ভিড় আর হুইস্কি-স্যাম্পেনের কক্‌টেল্‌ পার্টির কলকাকলি। জাপানী বোমার অনাগত ভয়ে ভীত একদল নাগরিক যেমন কলকাতা ছেড়ে কোন নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় গ্রামাঞ্চলের দিকে ছুটে চলেছে, অপরদিকে তেমনি বাইরে থেকে এক অর্থগৃধ্নুর দল এগিয়ে আসছে এই মহানগরীর দিকে যুদ্ধের মওকায় মিলিটারি কণ্ট্রাক্ট নিয়ে মোটা দাঁও মারবার দুর্নিবার আকর্ষণে। শুধু মানুষই নয়, সারা শহরটাই যেন তখন একদিকে ভয় এবং অপরদিকে লোভের টানা-পোড়েনে উন্মত্ত মাতাল হয়ে উঠেছে।

এমনি যখন শহরের আবহাওয়া, তখনই কলকাতায় ৪৫নং ব্রিগেডের সঙ্গে এলেন ডাঃ চৌধুরী। সেনাবাহিনীতে তখন যেন একটা নতুন উন্মাদনা এসেছে। ভারতে অবস্থিত সৈনিকদের কাছে এতদিন যুদ্ধটা ছিল অনেক দূরের ঘটনা। লিবিয়ায় বা রাশিয়ায় কী ঘটছে বা না ঘটছে, সেটা ছিল তাদের কাছে খুবই গৌণ—দৈনিক সংবাদ মাত্র। বরং সেখানে তাদের সমধর্মী জোয়ানেরা যুদ্ধের সঙ্গে মুখোমুখি মোকাবেলা করবার যে সুযোগ পাচ্ছে, তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে নিজেদের কাছে নিজেরাই যেন বড় ছোট হয়েছিল ভারতে অবস্থিত জোয়ানেরা। এবার যুদ্ধ তাদের দোরগোড়ায় হানা দেবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে তারাও "এ্যাক্‌শনের" সম্মুখীন হবে। তাই তাদের সম্ভাব্য "এ্যাক্‌শনের" কল্পনাপ্রসূত একটা একগুঁয়ে ও বেপরোয়াভাবের প্রকাশ পাচ্ছে। তার ছোঁয়াচ লেগেছে ডাঃ চৌধুরীর মনেও। একদিকে উত্তেজনা-বিহীন ট্রেনী-জীবনের একঘেয়েমী, অপরদিকে দীপালির অন্তর্ধানের অবসাদ—এই দ্বৈতযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মন তাঁর চঞ্চল হয়ে উঠে। সেই মুক্তির সম্ভাবনাই যেন আজ এতদিন পর দেখা-দিয়েছে। আসন্ন মুক্তির কল্পনায় তিনি অস্থির হয়ে উঠেন।

কবে—কবে আসবে সেই মুক্তি? সেদিন সন্ধ্যায় সৈনিক ব্যারাকে নির্দিষ্ট তাঁর কেবিনে বসে সে 'কথাই' ভাবছিলেন ডাঃ চৌধুরী। এমন সময় অনাহুতভাবেই মেজর হিথ্ এসে হেঁকে উঠলেন—"হোয়াট্ আর্ ইউ ব্রুডিং এ্যাবাউট্, ডক্? কম্, লেট্‌স্ এনজয় দ্য নাইট্। হু নোজ্—টুমরো উই মে ডাই।"

চমকে উঠেন ডাঃ চৌধুরী! সত্যিই তো, মিছিমিছি বসে বসে এতক্ষণ পর্যন্ত কী ভাবছিলেন তিনি। কে জানে—কাল হয়তো মরতে হবে—আজকের এই রাতটা ভোগ করে নেওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ! আর দ্বিরুক্তি না করে মেজর হিথের সঙ্গে চৌরঙ্গীর পথে বেরিয়ে পড়েন ডাঃ চৌধুরী।

বাইরের সারা শহর নিষ্প্রদীপ। সেদিনকার আলোকোজ্জ্বল 'রেড্‌রোড্' আজ টুলিপরা বাতিগুলোর টিম্ টিম্ আলোকে যেন ঘুমন্ত অজগরের মতো নিষ্প্রাণ হয়ে শুয়ে আছে। অন্ধকার গড়ের মাঠ আরও ঘন অন্ধকারের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত দেখাচ্ছে। রেড্‌রোড্ আর মেয়োরোডের ক্রসিংটা পার হযে হঠাৎ ডাঃ চৌধুরী স্তম্ভিত-ভাবে দাঁড়িয়ে পড়েন।

—হোয়াট্‌স্ আপ্, ডক্? প্রশ্ন করেন মেজর হিথ্।

নিকটবর্তী ঝোপটার দিকে ডাঃ চৌধুরী শুধু অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, কিছু বলতে পারেন না। আবছা অন্ধকাবে দেখা যায়—অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় দুটি দেহ পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আছে। শিউরে উঠেন ডাঃ চৌধুরী।

জিহ্বা দিয়ে টাক্‌রায় অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে মেজর হিথ্ শুধু বলেন—দে এন্‌জয় লাইফ্—হুয়াই বদার?

এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে আরও অনেক কয়টি জুটি। ডাঃ চৌধুরী ভাবেন, কোথায় এলাম—স্বর্গ, না নরক?

ততক্ষণে চৌরঙ্গী পেরিয়ে 'ফির্‌পো'র দরজায় পৌঁছে গেছেন দুজনে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে উর্দী পরা একটা লোক ডানহাত

তুলে মিলিটারি কায়দায় তাঁদের স্যালুট্ করেই বাঁ হাতে দরজাটা টেনে ধরে আহ্বান জানায়। ভিতরে ঢুকে তীব্র আলোর হঠাৎ ঝলকে কিছুক্ষণ সবই যেন কেমন ঝাপ্সা দেখায়। টেবিল আর মানুষে একসঙ্গে মিশে যেন একাকার হয়ে গেছে। কোন্‌টা মানুষ, আর কোন্‌টা টেবিল, কিছুই ঠাহর করা যায় না। কানে শুধু ভেসে আসছে গ্লাসের টুং-টাং শব্দ, আর অজস্র কণ্ঠের চাপা আওয়াজ। হুইস্কি, ব্রাণ্ডি এবং আরও সব মদিরার তীব্র গন্ধে বাতাসটা হয়ে আছে অত্যন্ত ভারি।

মেজর হিথ্ ডাঃ চৌধুরীকে একরকম ঠেলতে ঠেলতেই নিয়ে গেলেন হলের কোণের দিকে একটা টেবিলে। দু'জনে মুখোমুখি হয়ে বসেন। টেবিলে দুদিকের দুটি চেয়ারে। বয় এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াতে মেজর হিথ্‌ই হুকুম দেন, হুইস্কি, সোডা ঔর চীপ স্ট্র। কোন আপত্তি জানালেন না ডাঃ চৌধুরী। কেননা এক বছর মিলিটারি ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে হুইস্কি-ব্রাণ্ডির অভ্যেসটা হয়ে গেছে।

প্রথম দিকে খুবই আপত্তি ছিল। দেরাদুন ক্যাম্পে এ'নিয়ে সমগোত্রীয় অফিসারদের কাছে 'লেগ্-পুলিং'-এর অনেক নিগ্রহও ভোগ করতে হয়েছে তাঁকে। অবাঙ্গালীরা বলেছে—"ভেতো বাঙ্গালী", আব বাঙ্গালীবা বলেছে—"মায়ের কোলের কচি খোকা।" তাতেও কেউ তাঁকে মদ স্পর্শ করাতে পারেনি অনেকদিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এক অসতর্ক মুহূর্তে।

ক্যাম্পে সেদিন বড়দিনের উৎসব। শীতটাও পড়েছে খুব কড়া। মদিরার ফোয়ারা-মুখ সেদিন যেন খুলে দেওয়া হয়েছে পুরোদমে সেই উৎসব আসরে। হলঘরটার এককোণে দাঁড়িয়ে উৎসবমত্ত তরুণ অফিসার আর তরুণী ওয়াকাইদের কলনিনাদ নীরবে শুনছেন ডাঃ চৌধুরী। স্ট্রীমলাইন পোষাকে এইসব ওয়াকাইদের চটুল পদক্ষেপ যেন অনেক বছর আগেকার সেই মিডফোর্ড

হাসপাতালে ফেলে-আসা দিনগুলির স্মৃতিতে টেনে নিয়ে যায় তাঁকে। একটি স্ট্রীম্‌লাইন পোষাকে ঘুরে বেড়াতো নার্স দীপালিও। তখন তাঁর চঞ্চল চরণের প্রতিটি পদক্ষেপে ঝড়ের কাঁপন তুলতো আজকে ডাঃ চৌধুরী, সেদিনের গৌতমের বুকে। হঠাৎ যেন দেহটা তাঁর কেঁপে উঠল—ডিসেম্বরের এই কড়া শীতে, না ঐ স্ট্রীম্‌লাইন পোষাকপরা ওয়াকাই তরুণী :নৃত্যভঙ্গিমায় স্মিতহাস্যে লাস্যময়ী হয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়, তারই উষ্ণ নিঃশ্বাস নিসৃত মদিরার মাদক সুরভিতে ?

কলকণ্ঠে বলে উঠে তরুণী—আপনি কাঁপছেন, ডাঃ চৌধুরী ? একচুমুক খেয়ে নিন, সব ঠিক হয়ে যাবে—বলেই একটা গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে সোডা মিশিয়ে তুলে ধরে তাঁর একেবারে ঠোঁটের কাছে।

গন্ধটা মন্দ লাগে না, কেমন যেন মন তাতানো। গ্লাস হাতে তরুণীর চোখেও তখন সুরা মিশ্রিত বিদ্যুত ঝলক। মাথাটা কেমন যেন ঘুরে যায়। আলতোভাবে গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলেন, আপনি সুন্দর বাংলা বলেন তো ?

—বারে, আমি যে বাঙালী, মিস্ হেনা রায়, স্মিতহাস্যে বলেন তরুণী।

—বাঃ, ভারি সুন্দর নামটি তো—বলেন ডাঃ চৌধুরী।

—উঁ-হুঁ, সুন্দর কখনো ভারি হয়না। তবে, ভারি কিন্তু আপনার গুরুগম্ভীর ভাবটা। কলহাস্যে বলেন মিস্ রায়। জবাবে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই আবার বলেন—ওকি, হাতের গ্লাস যে হাতেই রয়ে গেলো—খান। খান, দেখবেন, শীতের কাঁপুনিটা কমবে। বলেই গ্লাসশুদ্ধ হাতটা ঠেলে একেবারে ডাঃ চৌধুরীর ঠোঁটে ঠেকিয়ে দিলেন।

এক চুমুক—বুকটা যেন কেমন জ্বলে যাচ্ছে। দুই চুমুক—আরো জ্বালা। ফেরবার আর পথ নেই। ঢুলুঢুলু চোখে স্মিত

দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে স্ট্রীম্‌লাইন পোষাকে সেই চটুলা তরুণী ওয়াকাই মিস্‌ হেনা রায়। তিন চুমুক, চার চুমুক—এমনি করে পুরো গ্লাসটা তুলে তার গ্লাসটার সঙ্গে টুং করে ঠুকেই আওয়াজ তুলে বললেন—টু ইউর্‌ হেল্‌থ্‌।

—ইওর্‌ হেল্‌থ্‌—বলে উঠেন মেজর হিথ্‌।

গলাব আওয়াজে চমক ভাঙ্গে ডাঃ চৌধুরীর। খেয়াল হয়—এটা ফিরপোর বার হল, দেরাছুন মিলিটারি ক্যাম্পের ক্যান্টিন নয়। তাড়াতাড়ি গ্লাসটা তুলে মেজরের গ্লাসের সঙ্গে ঠেকিয়ে পাল্টা হেল্‌থ উইস্‌ করেন তিনি। তারপর, এক চুমুকে শেষ করে গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখেন ডাঃ চৌধুরী।

মেজর জিজ্ঞাসা করেন—এমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে কেন, কি হয়েছে?

কোন জবাব না দিয়ে শুধু একটু মৃদু হাসেন ডাঃ চৌধুরী। হলঘরটার চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেন। প্রতিটি টেবিলেই নর-নারীর ভিড়—কোনটায় চারজন, কোনটায় বা দু'জন। নারীর সংখ্যাও কম নয়। অবাক হয়ে তিনি শুধু ভাবেন—এই সাহেবী তৃষ্ণাটা বাঙালীদের মধ্যে বিশেষ করে নারী জাতির মধ্যে বিষময়-ভাবে ছড়িয়ে পড়ল কেমন করে? এ কি শুধু নিজেকে অতি আধুনিক প্রমাণ করবার একটা কৃত্রিম বাসনা, না বঞ্চিত জীবনকে কামনায় উত্তেজিত করে রাখবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস?

তিনি নিজে কেন মদ্যপায়ী হলেন? একি শুধু সেই সুন্দরী তরুণী ওয়াকাই হেনা রায়ের মদিরালস ঢুলুঢুলু চোখের তির্যক চাহনির মোহিনী মায়ায়, না কি দীপালির স্মৃতির যে দাহ স্থান হতে স্থানান্তরে তাঁকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তার হাত থেকে আত্মরক্ষার আশায়? কে জানে, কেন? নিজের মনেরই সঠিক খবর জানা নেই, তায় অপরের মনের খবরে দরকার কি? তার চেয়ে পরম প্রত্যক্ষ উত্তেজনা অপেক্ষা করছে গ্লাস ভর্তি সোনালি রঙের এই

তরল দাহ্য পদার্থে। যন্ত্রচালিতের মতই গ্লাসটা তুলে চুমুকের পর চুমুক চালিয়ে যান ডাঃ চৌধুরী। একদিন যে আগ্রহ, যে উত্তেজনা নিয়ে দীপালির রাঙ্গা ঠোঁটে চুম্বন এঁকে দিতেন, তার সবটুকুই যেন আজ নিঃশেষ করে দিতে চান এই কাঁচের গ্লাসটার কানায় কানায়। মনে হয় গ্লাসটাকে কামড়ে, চিবিয়ে যদি গুঁড়ো করে দিতে পারতেন, তা'হলে তাঁর মনের সব আগুন হয়তো ঠাণ্ডা হত।

—হ্যালো ডক্, হোয়াট্ আর্ ইউ ব্রুডিং ওভার অল দ্য লং—আবার প্রশ্ন করেন মেজর হিথ্।

—নাঃ, তেমন কিছু নয়—সচকিত হয়ে জবাব দেন ডাঃ চৌধুরী।

—"বয়"—আরও এক পেগ করে ঢেলে দিয়ে যায়। সঙ্গে সোডা দিতে ভুল হয় না। এমনি করে পর পর পাঁচ-সাত পেগ বোধহয় হয়ে গেল। দুজনেরই নেশা তখন বেশ জমে উঠেছে। নেশার এমন পর্যায় পৌঁছুলেই মানুষের আচরণে বৈচিত্র্য ঘটে। কেউ হয়ে যায় মূক—বধির, কেউ বা হয় বাচাল, কেউ হাসি-উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত, আবার কেউ বা কেঁদে ভাসিয়ে দেয় বুক। ডাঃ চৌধুরী নেশায় বুঁদ হয়ে গেলেও, মেজর হিথ্ কিন্তু অনর্গল বকে চলেছেন তার জীবনের প্রণয় কাহিনী।

আশ্চর্য! সব পুরুষের কি একই বক্তব্য?

নারী, নারী,—আর নারী,—নারী ছাড়া কি জগতে আর কোন কিছুই জানবার বা জানাবার নেই? হিথ্ যেমনি চলেছে বকে, চৌধুরী তেমনি রেখেছে বুকের তলায় সব চেপে—উভয়েরই নারী অন্তক বক্তব্য।—আর ঐ যে নর-নারীর মিছিলে সারা [illegible] ছড়িয়ে আছে, তাদেরও নিশ্চয়ই ঐ একই লাইনের চিন্তা, কারও প্রকাশ্যে, কারও উহ্য।

গৌতমের সব গাম্ভীর্য, সব চিন্তা উপেক্ষা করে মেজর বকে চলেছেন তার প্রনয়িণীর কথা—যাঁর কম্পিত দু'টি ওষ্ঠে তিনি [illegible] চুম্বন এঁকে এসেছেন সাউথ হ্যাম্পটনের জাহাজ ঘাটে। [illegible] আজ

প্রায় ছ'মাস আগেকার কথা। সেদিন সন্ধ্যায় মুভ্‌মেণ্ট-অর্ডার পেয়েই তিনি টেলিফোন করেছিলেন কিটিনকে—সার্‌লি কিটিন্‌ —তার ফিয়াঁসি। কোথায় যেতে হবে, কিছুই জানেন না। শুধু জানেন পোর্টের "—নং" ডকে সন্ধ্যা সাতটায় তাকে রিপোর্ট করতে হবে। তখনই বুঝেছিলেন—গন্তব্যস্থল হয় মিড্‌ল-ইস্ট, নয় 'সিয়াক্‌' (সাউথ্‌ এসিয়া কমাণ্ড)। ডকের গেটের বাইরে একটা ল্যাম্পপোস্টের কাছে অধীর চিত্তে অপেক্ষা করছিলেন হিথ্‌ তার সুইট্‌-হার্টের আগমন প্রত্যাশায়। ঠিক এমন সময় আকাশবাতাস কাঁপিয়ে বেজে উঠল নিষ্করুণ সাইরেণ। জেরীরা বোধহয় লণ্ডনের উপর বিমান আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছে—এটা তারই বিপদ-সঙ্কেত। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথার উপর শোনা যায় জার্মান বোম্বারুর গুরু গুরু আওয়াজ। কিটিন বোধহয় আর আসতে পারল না। বুকে তীব্র একটা ব্যথা নিয়ে হিথ্‌ নিকটস্থ সেল্টারে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে আরও একটি মানুষ। আচম্বিতে জড়িয়ে ধরে হিথ্‌কে সেই আগন্তুক। হঠাৎ তার পিনোন্নত কম্পিত বক্ষের গরম ছোয়া অনুভব করে চমকে ওঠেন হিথ্‌। পরক্ষণেই শুনতে পান কম্পিত কণ্ঠের করুণ দু'টি কথা "মাই ডিয়ার"। আকুল আবেগে হিথ্‌ জড়িয়ে ধরেন কিটিনকে—চুম্বনের পর চুম্বনে ভরে দেন তাঁর অশান্ত ঠোঁট, মুখ, কপোল সর্বত্র। বর্ষার ধারার মতো অঝোরে জল ঝরে যাচ্ছে কিটিনের দু'চোখ বেয়ে। উত্তপ্ত সেই প্রস্রবণে ভেসে যায় হিথের আকুলিত বক্ষতল। এভাবে কতক্ষণ যে কেটে যায়—কেজানে। দু'জনেই হয়ত তখন ভাবছিল—এ মধু-যামিনী যেন শেষ না হয়। কিন্তু হায়। 'অল ক্লিয়ার' বেজে উঠতেই দু'জনকেই বেরিয়ে আসতে হ'ল সেল্টার থেকে। আরও যারা সেল্টারে ঢুকেছিল, বেরিয়ে এল সবাই।

কিটিন্‌কে জড়িয়ে ধরে বিদায় চুম্বনের আবেগে ভরিয়ে দিলেন

তাঁর চোখ-মুখ-ঠোঁট মেজর হিথ্। হয়ত বা এটাই তাঁর শেষ চুম্বন! হ্যাঁ, শেষচুম্বন বৈকি! তখন ঠিক বুঝতে পারেন নি তিনি। তাই সেদিন "আবার ফিরে আসব" বলে বিদায়-বেদনার তীব্রজ্বালাকে বুকে চেপে রেখে হঠাৎ "রাইট এবাউট্ টার্ন্" করে সোজা ফিরে যান তাঁর নির্দিষ্ট জাহাজে।

ডেকে রেলিংটা ধরে যতক্ষণ দেখা যায়, পাড়ের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে থাকেন। দেখতে পান, পাড়ে দাঁড়িয়ে কিটিন্ও তার ডান হাতে ছোট্ট রুমালটা নাড়ছে। জাহাজটা মোড় ফিরতেই কেমন যেন সব অন্ধকাব হয়ে যায়। অশান্ত বুকটা চেপে ধরে দ্রুত পদে হিথ্ তাঁর কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়েন। একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস কেবিনে আবদ্ধ চার দেওয়ালের ধাক্কা খেয়ে যেন গুম্‌রে গুম্‌রে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

একটানা বক্‌বক্ করতে করতে একসময় মেজর হিথ্ আনমনা হয়ে পড়েন। ফারপোর লোকারণ্য হলটা তাঁর চোখের সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। সিলিংটার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকেন মেজর হিথ্।

—দেন্ হোয়াট্—প্রশ্ন করে উঠেন ডাঃ চৌধুরী।

"দেন্ হোয়াট্?"—নিশিথে পাওয়া মানুষের মত অস্ফুটস্বরে সাড়া দেন মেঃ হিথ্ হঠাৎ। এক ঢোকে গেলাস ভর্তি পানীয়টা গলায় ঢেলে দিয়েই হেঁকে উঠেন—বয়্—

বয় এসে পাশে দাঁড়াতেই হেঁকে বলেন—দো ডাবল্ হুইস্কি—ইঙ্গিতে তাঁর এবং ডাঃ চৌধুরীর খালি গেলাস দু'টি দেখিয়ে দেন।

মেঃ হিথের কাণ্ড দেখে ডাঃ চৌধুরী শুধু চুপ করে শূন্য গেলাসটা টেবিলের ওপর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরাতে থাকেন।

বয় এসে হুইস্কি, সোডা ও বরফের টুকরো ঢেলে দিয়ে যায় গেলাস দুটোয়।

গেলাসে চুমুক দিয়েই চমক-ভাঙ্গা মেজর হিথ্ বলে উঠেন—ও

ইয়েস্—হুয়াট্ ইউ ওয়ার্ টকিং এবাউট্, ডক্? কোন জবাবের অপেক্ষা না করেই ডানদিকের পকেট থেকে একটা খাম বের করে ডাঃ চৌধুরীর হাতে দিয়ে বলে—রীড্ দিস্।

গেলাসে চুমুক দিতে দিতে চিঠিটা পড়ে চলেন ডাঃ চৌধুরী। এক সময় তাঁর ভ্রূ দু'টো কুঁচকে উঠে।

তাই লক্ষ্য করে মেজর অধৈর্য স্বরে বলে উঠেন—টেল্ মি, কুইক্ হুয়াট্ কিটিন্ হ্যাস রিটেন্? রিসিভ্ড্ ইট্ ওন্লি দিস্ আফ্টারনুন্, বাট্ হ্যাড্ নো পেসান্স্ টু রীড্ টু দ্য লাস্ট্।

চিঠিটা পড়ে যান ডাঃ চৌধুরী। আজ মনে পড়ে শুধু তারই সারমর্ম—মেজর হিথ্ চলে আসবার দু'মাসের পরই কিটিনের সঙ্গে ইয়াংকি বাহিনীর ক্যাপ্টেন্ টেইলারের হঠাৎ পরিচয় ঘটে লণ্ডনের একটা রেস্তোঁরায়। মাস তিনেক আগে টেইলারের ব্যাটেলিয়ন আমেরিকা থেকে বৃটেনে এসেছে ফিল্ড-এ্যাক্শনে যাবার পথে। মাত্র দু'মাস মেলামেশার পরই কিটিনের কেমন মনে হ'ল—টেইলারকে ছেড়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই একদিন গির্জায় গিয়ে বিয়ের দলিলে সাক্ষরও দিয়ে এসেছে। অবশেষে, মেঃ হিথ্কে সান্ত্বনা দিয়ে লিখছে—ভেরি সরি, ডিয়ার—ডোণ্ট্ মাইণ্ড্। ফর্গিভ্ এ্যাণ্ড্ ফরগেট্। উইস্ ইউ অল্ গ্লোরি ইন্ দ্য ওয়ার্।

হঠাৎ মেঃ হিথ্ বলে উঠেন—হোয়াট্—অল্ গ্লোরি ইন্ ওয়ার্? ইয়েস্ অল্ গ্লোরি ইন্ ওয়ার্—মিন্স্, "হিরোজ ডেথ"—বলেই—হাঃ হাঃ অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল মেজর হিথ্।

চারপাশে টেবিলের সবাই অবাক হয়ে তাকায়। হয় তো ভাবে, লোকটা একটু বে-সামাল হয়ে পড়েছে। কিন্তু এইমাত্র ডাঃ চৌধুরী ছাড়া কেউ জানলো না কী বিরাট্ জ্বালা আর কী অসহনীয় ক্রন্দন রোল লুকিয়ে আছে ঐ অট্টহাসিটার অন্তরালে।

ডাঃ চৌধুরীর বুকেও কিটিনের এই চিঠি কোন এক সুপ্ত ক্ষত-

স্থানে নতুন করে রক্ত ঝরায়। মনে পড়ে, ভুলে যাওয়া অতীতের এক ঘটনা। দীপালিকে লিখেছিলেন—ওয়ামেন, দাই নেম ইজ্ ফ্রেইলটি। দীপালি জবাব দিয়েছিল—"ম্যান, দাই নেম্ ইজ্ ভ্যানিটি"। কোনটা যে ঠিক, তা বোধ হয় নারী-পুরুষের সৃষ্টিকর্তাও জানেন না। সব ছাপিয়ে যে সত্যটা আজ পরিষ্কার তা হল, মেজর হিথ্ আর তিনি উভয়েই নারী-পুরুষের মিলিত যাত্রাপথে পরিত্যক্ত এক অনাবশ্যক বাড়তি বোঝা। ঘটনা যদিও আলাদা, তবুও কোথায় একটা অপূর্ব মিল। দুটি পুরুষেরই জীবনে এনেছে বিরাট্ এক শূন্যতা আর চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সীমাহীন যন্ত্রণা।

কথা আর এগোয় না। এক ঢোকে গেলাসের বাকী পানীয়টা গলায় ঢেলে মেজর হুংকার দেন— বয়্ বিল লে আও—

কম্পিত হস্তে বিল চুকিয়ে চেঞ্জটা প্লেটে রেখে ডান হাত দিয়ে ডাঃ চৌধুরীর বাঁ হাতটা জড়িয়ে ধরে বলেন—ডোণ্ট ক্রুড্ ডক্, লেট্ আস্ এন্‌জয় ক্যালকাটা টু-নাইট—

রাস্তায় যখন বেরিয়ে এলেন, কারোরই তখন কলকাতা এনজয় করবার মত অবস্থা নেই। রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, আলোবাতি সব যেন একটা ভূমিকম্পের দাপটে নেচে চলেছে। হোঁচট্ খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন মেজর হিথ্। সামনে দাঁড়ানো মিলিটারি পুলিশের এক সার্জেণ্ট ধরে ফেলে তাকে। তারপর একটা ট্যাক্সিতে তুলে দেয়। ডাঃ চৌধুরীও টলতে টলতে উঠে বসেন। সার্জেণ্ট ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নির্দেশ দেয়—সিধা ফোর্ট উইলিয়াম মে পৌঁছা দেনা।

ব্যাক সিটে মাথাটা এলিয়ে দেন ডাঃ চৌধুরী। সারা কলকাতাটা দুলছে ট্যাক্সিটার তালে তালে। মৃদুস্বরে বলে চলেন ডাঃ চৌধুরী—দে দোল্—দে দোল্—।

॥ এগারো ॥

দে দোল্—দে দোল্—

তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ বঙ্গোসাগরের বুকে ঢেউয়ের তালে তালে দুলে দুলে উঠছে জাহাজটা। সাতদিন হল কলকাতা বন্দর ছেড়ে অজানার পথে যাত্রা শুরু হয়েছে। এ যাত্রার শেষ কোথায় জানা নেই বটে, তবে মালয়ের রণক্ষেত্রে জাপানীদের মোকাবিলা যে করতে হবে তাদের ব্রিগেড্কে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কারও মনে। শুধু মুখ ফুটে কেউ বলে না সে কথা।

জাহাজের রেলিংটা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন ডাঃ চৌধুরী। হাত ঘড়িতে বেলা তখন দশটা। ডাইনিং রুমে ব্রেক্-ফাস্ট শেষ করে মিনিট দশেক হল রেলিংটা ধরে এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। পাহাড়ের মত উঁচু একটা ঢেউ চলতি জাহাজের গায়ে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা মেরে লোনা জলের প্রস্রবনে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে দিল ডেক্টাকে। শক্ত হাতে রেলিংটা চেপে ধরে টালটা সামলে নেন। লবণাক্ত জলের বেশ খানিকটা প্রলেপ ঝাপটা মেরে তাঁর চোখে মুখে বুলিয়ে দিয়ে যায়। ওদিকে কয়েকটা গোরা সৈনিক রেলিং ধরে উপুর হয়ে হর্ হর্ করে বমি করছে। একটা তীব্র কটুগন্ধ হাওয়ায় ভেসে এসে নাকে লাগতেই পেটটা তাঁর গুলিয়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকটা চেপে ধরেন।

দিগন্ত জুড়ে বহুদূর ছড়িয়ে আছে সীমাহীন নীল আকাশ। চারদিকে শুধু নীল—আর নীল। মনে পড়ে পিতার গভীর নীল

চোখ, মনে পড়ে দীপালির নীল চোখের বেদনাতুর পলকহীন দৃষ্টি।

সব নীল ছাপিয়ে হঠাৎ সমুদ্রের বুক চিরে দূরে, বহুদূরে জেগে উঠে দীর্ঘায়িত একটা নীল রেখা। সচকিত হয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করেন ডাঃ চৌধুরী। বাইনাকুলারটা কাঁধেই ঝুলছিল। টেনে নিয়ে চোখে লাগিয়ে এড্‌জাস্ট্‌ করে নেন লেন্সগুলো। কিছু বোঝা যায় না তখনও। খানিকটা টায়ার্ড ফিল্‌ করেন। ঘণ্টাখানেক চুপ করে বসে থাকেন ডেক্‌ চেয়ারটায়। নীল রেখা আবার টেনে দাঁড় করিয়ে দেয়। উঠে বাইনাকুলারটা চোখে বসাতেই দেখেন—রেখা আর নেই—সার বেধে দাঁড়িয়ে আছে গাছের পর গাছ—তাল, তমাল, নারিকেল, আরও কত কী?

আশে পাশে নাবিকদের মধ্যে কর্মচঞ্চলতা অনুভব করেন। একটু পরই ঘণ্টার সাংকেতিক আওয়াজ করে কি যেন নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন ক্যাপ্টেন্‌। বাইনাকুলারটা আস্তে আস্তে নামিয়ে নেন। একটানা নীলরেখা গভীরতর হয়ে ফুটে উঠছে্‌। তন্ময় হয়ে দৃশ্য পরিবর্তনের পালা দেখছেন ডাঃ চৌধুরী। কে যেন কানের পাশে গম্ভীর সুরে আবৃত্তি করে যায়—

—"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমাল তালীবনরাজি নীলা
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্ধারা নিবদ্ধেব কলংকরেখা।"—

চমক ভেঙ্গে যায় মেজর হিথের ভরা গলার আওয়াজে—"স্টিল্‌ ব্রুডিং, ডক্‌—বলেই পাশে এসে দাঁড়ালেন মেজর হীথ্‌।

—উই স্যাল্‌ বি ল্যাণ্ডিং বাই এ্যান্‌ আওয়ার্‌—ডোণ্ট্‌ ওয়ারি।

—না আমি ওয়ারিড্‌ হচ্ছি না, মেজর।

—দেন্‌—হোয়াট্‌?

তাঁর মনের মণিকোঠায় যে কাব্য গুমরে উঠছে, যুদ্ধোন্মাদ এই

ইংরেজ মেজরকে তা বোঝানো শক্ত। এরা জানে শুধু ছুটো জিনিস—হয় আসুরিক প্রেম, নয় আসুরিক যুদ্ধ। তাই কথাটা ঘুরিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেন ডাঃ চৌধুরী—

—আমরা কোথায় ল্যাণ্ড করব,—বার্মা, না মালয়?

—আই উইস্ আই নিউ—

এমনি সময় তৈরী হবার বিউগ্‌ল্ বেজে উঠে।

চোখের সামনে তীরভূমি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দ্রুতপদে মেজর হীথ্ এবং ডাঃ চৌধুরী নিজেদের কেবিনের দিকে যান।

অবতরণের পালা শেষ হতে প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। সবার শেষে নেমে এলেন ডাঃ চৌধুরীর ' মেডিকেল ইউনিট্। ব্রিগেড, হেড্ কোয়ার্টার্সে গিয়ে জানলেন ফাইটিং ব্যাটেলিয়নের দলকে জাহাজ থেকে নামতে না-নামতেই ত্রিশ মাইল দূরে মুয়ার নদীর তীরবর্তী রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিলেটিং অফিসার তাঁকে হাসপাতালের জায়গাটুকু দেখিয়ে দিয়েই অন্য কাজে চলে গেলেন। সহকারীদের নিয়ে হাসপাতাল সাজাবার কাজে সবেমাত্র মন দিয়েছেন, অম্‌নি বেজে উঠে বিমান-আক্রমণের বিপদ-সংকেত। ছুটে গিয়ে কাছেই একটা গাছের নীচে সদ্য কাটা ট্রেন্‌চে ঢুকে পড়েন ডাঃ চৌধুরী। জাপানী বোমারু বিমান আর তার সঙ্গে ফাইটার এস্‌কর্ট বিমানের মিশ্রিত আওয়াজে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠে। নিকটেই কোথায় যেন একটা বোমা সশব্দে ফেটে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ধুলো-বালি এসে তাদের ট্রেন্‌চেও ছিট্‌কে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কোথায় সেই আত্মরক্ষাকারী—য়্যাক্‌য়্যাক্-গান বা মিত্রশক্তির ফাইটার প্লেন? চারদিকে শুধু চীৎকার ও চেঁচামেচির আওয়াজ, মাঝে মাঝে বোমার আওয়াজের ফাঁকে ফাঁকে শোনা যায়। আঘাতের বদলে প্রতিঘাত করার কোন ব্যবস্থা রয়েছে বলে মনে হয় না ডাঃ চৌধুরীর। যদিও তেমন কিছু থাকে, তা যে শত্রুদের তুলনায় খুবই নগণ্য সে বিষয়ে

কোন সন্দেহ নেই। মিনিট দশেক পর্যন্ত একটানা আঘাতই চলেছে, বাধা দেওয়ার কোন চিহ্ন নেই।

অল্-ক্লিয়ারের সংকেতধ্বনি শুনে ট্রেন্চ থেকে গা ঝেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ান ডাঃ চৌধুরী। বাইরে রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে। চারদিকে জঙ্গল জুড়ে অসংখ্য জোনাকি, আর আকাশের অসংখ্য তারার মিটি-মিটি আলো চোখে যেন বিঁধছে, আর কাণে বিঁধছে বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসা অসহায় মানুয়ের কাতর গোঙানি।

এবার আর্ত মানুষের সেবায় এগিয়ে যাবার পালা। ইউনিটের অন্যান্য সহকর্মীরা কিছুক্ষণেব মধ্যেই এদিক-ওদিক থেকে এসে যায়। হিসেব করে দেখে নিলেন ডাঃ চৌধুবী—সব ঠিক আছে; মিসিং েই কেউ। হাতে হাতে ক্যাম্প সব খাটানো হয়ে যায়। নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় গড়ে ওঠা ছোট্ট একটা হাসপাতাল দেখ্তে দেখ্তে আহত মানুষে ভরে যায়। সহকারীদের নিয়ে সেইসব আহতদের সেবায় লেগে যান ডাঃ চৌধুবী। নিশিতে পাওয়া ঘুমন্ত মানুষের মত বেডের পর বেড অতিক্রম করে চলেছেন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আর অপারেশন করে ও ইন্জেক্শন দিয়ে। ক্লিষ্ট মানুষের আর্ত চীৎকার, মুমূর্ষু মানুষের মর্মভেদি গোঙানি—কিছুই যেন পৌঁছুচ্ছে না তাঁর কাণে।

একটা বেডের কাছে এসে থম্কে দাঁড়ালেন তিনি।—ও কে— ? মেজর হীথ্ না?—মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে ভাল করে আবার দেখলেন ডাঃ চৌধুরী। হ্যাঁ—মেজর হীথ্ই—এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। বহুকালের নিকটতম আপনজনকে হারাবার বেদনায় বুকটা তাঁর ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপরই, দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ডাঃ চৌধুরী মেজর হীথের ক্ষতগুলো পরীক্ষায় মন দিলেন। বুকের ডানদিকটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। পাঁজরটা গুঁড়িয়ে ফুস্-ফুস্টা বেরিয়ে পড়েছে। রক্ত ভেসে যাচ্ছে মেজর হীথের সর্বাঙ্গ দিয়ে। হুঁস্ নেই একটুও। চারপাশের হাজারো আর্তনাদ আর গোঙানির সঙ্গে তাঁর কাতরানি মিলে মিশে একটা বিভীষিকার রাত

যেন নেমে এসে হাসপাতালটাকে ঘিরে রেখেছে নিচ্ছিদ্র অন্ধকারের আবরণে। খুব সন্তর্পনে ডাঃ চৌধুরী মেঃ হীথের হার্টটা পরীক্ষা করেন। সেটা এখনো মৃদুতালে চলছে। নাকে হাত দিয়ে দেখেন দুর্বল নিশ্বাস তখনো বইছে। কিন্তু যে কোন মুহূর্ত্তে হার্টের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কাণের কাছে মুখ নিয়ে তিনি মেঃ হীথের নাম ধরে ডাকেন। দু'তিনবার ডাকবার পর তার চোখ দুটো যেন একটু কেঁপে ওঠে। আরেকটু জোর দিয়ে বলে উঠেন—মেজর হীথ্ দিস্ ইজ্ ডাঃ চৌধুরী। তার বা-কাণে মুখ রেখে আবার বলেন—দিস্ ইজ্ ডাঃ চৌধুরী—

হীথ্ যেন কিছু একটা বলার জন্য আকুলি-বিকুলি করছেন দেখে ডাঃ চৌধুরী তার কাণটা ওর মুখের কাছে নিয়ে যান। শুনতে পান ধুক্‌তে-ধুক্‌তে যেন বলছেন—ই-ন্-ফ-র-ম্ কি-টি-ন্ আ-হঃ হি-থ্-ডাইড্ এ-হিরোজ ডেথ্। তারপরই সব শেষ।

ডাঃ চৌধুরীর দু'চোখ বেয়ে জল নেমে আসে। আর তাঁর সারা মুখে ফুটে উঠে একটা অসহায় ভাব। বড় আশা নিয়ে ডাক্তার হয়েছিলেন তিনি। পীড়িত মানুষকে দেবেন সুখ আর শান্তি। কিন্তু সে স্বপ্ন তাঁর আজ যেন কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। মানুষই মানুষকে কী নির্দয়ভাবে আঘাত হেনে চলেছে দিনের পর দিন—রাতের পর রাত। আর তারই প্রবাহে বাঁধভাঙ্গা নদীর খরস্রোতে সামান্য তৃণ-খণ্ডের মতই যেন তিনি ভেসে চলেছেন।

মেজর হীথের মৃতদেহটা চাদরে ঢেকে দিয়ে বাইরে এসে তিনি যখন দাঁড়ালেন, তখন গাছের মাথায় দেখতে পান ভোরের আলোর প্রথম ঝিলিক্। উন্মুক্ত আকাশের দিকে ক্লান্ত নয়ন একবার বুলিয়ে নিয়ে বুঝি বা অদৃশ্য ভগবানের কাছে মেজর হীথের মৃত আত্মার পরম শান্তির জন্য নীরবে প্রার্থনা জানান। মনে হয়, কিটিনের বিশ্বাস-ঘাতকতার বেদনা ভুলতে না পেরেই আলোর ঝিলিকে উদ্‌ভাসিত সুন্দর এই পৃথিবীটাকে শেষ নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন মেজর

হীথ্। আশ্রয় খুঁজে পেলেন মালয়ের এই গভীর জঙ্গলে। মিশিয়ে দিলেন নিজেকে অন্যান্য নিহত জোয়ানদের সাথে, যারা ছিল এই অনির্দিষ্ট যাত্রাপথে তাঁর একান্ত আপনজন।।

হাজার হাজার মাইল দূরে ইংলণ্ডের কোন এক ছোট্ট শহরে— যেখানে রয়েছেন হীথের বৃদ্ধা মা আর বৃদ্ধ বাপ। সেখানে যাবে ছোট্ট একটা কেবল্—"ডাইড্ ইন্ এ্যাক্‌শান্—

কান্নায় হয়ত ভেঙ্গে পরবেন তাঁরা। আবার হয়ত একদিন তা ভুলেও যাবেন। চলতে থাকবে মহাকালের চির চলমান চাকা, যার নিষ্পেষণে গুড়িয়ে যাবে হীথের মতই কত সম্ভাবনাময় জাবন।

কী সব এলোমেলো চিন্তা ডাঃ চৌধুরীর মনটাকে চেপে ধরে। ফিরে যান আবার সেই বেড্টার দিকে—যেখানে একটু আগেই তিনি হীথের নিশ্চল দেহটা চাদরে ঢাকা দিয়ে এসেছিলেন। এতটুকু সময় পেলেন না যাতে অপারেশন্ করে মেজর হীথ্কে বাঁচিয়ে তুলবার শেষ চেষ্টাটুকুও করতে পারেন। ভাবতেই ডাঃ চৌধুরীর ছ'চোখ বেয়ে আবার নেমে আসে তপ্ত অশ্রু-ধারা। রুমাল চেপে ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট ক্যাম্পটার দিকে এগিয়ে যান।

গরম জল তৈরীই ছিল। হাতমুখ ধুয়ে একপাশে রাখা ডেক্ চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিলেন ডাঃ চৌধুরী। বেয়ারা গরম চা ও সিদ্ধ ডিম এনে সামনের টিপয়টায় দিয়ে গেল। ঘুমে যেন চোখ ভেঙে আসছে। অর্ধ-নির্লিপ্ত চোখে ডিমটা হাতে তুলে নিলেন। মুখের ডিম মুখেই রয়ে গেল। শোনা যায় বোমারু প্লেনের গুম্ গুম্ আওয়াজ—বেজে উঠল বিপদের সংকেত ধ্বনি। ছুট্তে হল আশ্রয়ের সন্ধানে। এম্নি করে চোখের পাতা পড়তে পড়তে সারাদিন ধরে ঝাঁকের পর ঝাঁক এরোপ্লেন এসে বোমার পর বোমা ছড়িয়ে যায়। সন্ধ্যার দিকে খবর আসে মুয়ার নদীর দিকে ডিফেন্স লাইন জাপানী আক্রমণে ভেঙে পড়েছে। সেনাদল আত্মরক্ষার জন্যে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে চারদিক ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু-

মাত্র বাঁচার জন্যই মেডিকেল ইউনিটকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। সেনাদলের কোন সাহায্য পাবার আশা নেই। কেননা তাদের কোন অস্তিত্বই আর নেই।

ভীত-সন্ত্রস্ত আর্দালি এসে কাঁপতে কাঁপতে বলে—স্যার, কি হবে? সহকারীদের মুখেও সেই একই প্রশ্ন। দলের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন ডাঃ চৌধুরীকেই বইতে হবে। এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে তিনি তাঁবু গুটাবার হুকুম দিলেন। উত্তর আর পূবের পথ জাপানীরা ঘিরে ফেলেছে, পশ্চিমে সমুদ্র। সুতরাং রাতের অন্ধকারে সমুদ্রতট ধরে যতটা সম্ভব দক্ষিণের পথে এগিয়ে যেতে হবে। দিনের আলোয় গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করে আবার শুরু হবে নৈশ যাত্রা সিঙ্গাপুরের পথে।

১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি। তারিখটা ছিল বোধহয় ১৭ই কি ১৮ই। রাত ১২টা নাগাদ ডাঃ চৌধুরীর ইউনিট এসে দাঁড়ায় সমুদ্র সৈকতে। শুরু হল নিঃশব্দ পদযাত্রা। উপরে উন্মুক্ত আকাশ মিটি মিটি তারার ভিড়, বামে রাতের প্রহরীর মত সারি সারি তাল-তমাল আর নারিকেল গাছের বেষ্টনী। দিগন্ত বিস্তৃত সাগরের কল্লোলধ্বনি। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে, আর তারই সংঘাতে সৃষ্ট ফস্‌ফরাসের চকিত আলোকের ঝিলিক। সেই ঝিলিকের আবছা আলোয় চলমান মানুষগুলোকে মনে হয় প্রেতমূর্তি। দিনের বেলায় জঙ্গলের পথে, রাতের বেলা সমুদ্রতট ধরে চলতে থাকে অবিরাম এই পদব্রজে পথযাত্রা।

আধো-ঘুম, আধো-খাওয়া। চলার পথের রসদও আসে ফুরিয়ে। সিঙ্গাপুর না পৌঁছুনো পর্যন্ত যে করেই হোক্ যেটুকু পাথেয় আছে, তাতেই সবাই মিলে ভাগ করে চালিয়ে নিতে হবে। চলার পথে গাছ থেকে নারকেল পেড়ে খেয়েও খানিকটা অভাব পূরণ হবে।

রাতের চলাটা মোটামুটি নিরাপদ—গোলমাল বাধে দিনের বেলা। জঙ্গলের ভিতর ঝোপে-ঝাপে লুকিয়ে থেকেও যেন শান্তি

পাওয়া যায় না। আশে পাশে মাঝে মধ্যেই বিক্ষিপ্ত সৈনিক বা স্নাইপারদের রাইফেল বা মেসিনগানের গুলির আওয়াজে চমকে উঠতে হয়। ভাবনা জাগে যে হঠাৎ হয়তো জাপানীদের সঙ্গে মুখোমুখিই বা দেখা হয়ে যায়। দলের অনেকেই যেন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। অপরিচিত খাওয়া আর পথশ্রমে আমাশয়ে আক্রান্ত হল অনেকে। যন্ত্রণায় পথের মাঝেই হয়তো অনেকে শুয়ে পড়েছে বা নতুন করে পদযাত্রার শক্তি হারিয়ে ফেলে কাতর নয়নে তাকিয়ে থাকে সাথীদের দিকে, যারা যাবার জন্য প্রস্তুত তারা তাগিদ দিচ্ছে উঠে যাত্রা শুরু করতে। ডাক পড়ে ডাঃ চৌধুরীর। কাউকে বা একটা বড়ি গিলিয়ে, কাউকে বা একটা ইনজেকশন্ দিয়ে ওদের তাজা হয়ে উঠে দাঁড়াবার মতো শক্তি ফিরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা করেন ডাঃ চৌধুরী। কেউ কাতরে উঠে দাঁড়ায় সঙ্গীর হাত ধরে অতি কষ্টে—চলতে থাকে কাঁধের ওপর ভর দিয়ে—কেউবা তাও পারে না! অথচ, আর দেরী করার উপায় নেই, শত্রুসেনা এগিয়ে আসছে পিছন আর বাঁ-দিক থেকে। যে উঠতে পারল না, তাকে ফেলে রেখেই এগিয়ে যেতে হবে। চলতে চলতে ডাঃ চৌধুরীর চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ে। ছোটবেলায় বাবাকে বলেছিলেন—ডাক্তার হলে সেই মুমূর্ষু ইংরেজ ছেলেটাকে হয়তো বাঁচানো যেত। ডাক্তার তিনি হয়েছেন, কিন্তু কই তিনি পারলেন না তো নিজের সাথীকে বাঁচাতে। বরং অবজ্ঞায় অনাহারে মালয়ের জঙ্গলে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে তাকে ঠেলে দিয়েই তো চলে আসতে হলো!

এই যদি মানুষ আমরা, জানোয়ার তবে কে?

এমনি করে দলের প্রায় অর্ধেক জোয়ানকে পিছনে ফেলে যেদিন তাঁরা জোহর প্রণালীর তীরে এসে পৌছুলেন, সেদিনকার তারিখটা ছিল ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪২ সাল। কাতারে কাতারে জোয়ানের দল এরই মধ্যে জড়ো হয়েছে সিঙ্গাপুরে যাবার একমাত্র সেতুপথ "কজ্‌ওয়ের" মুখে। পদাতিক, গোলন্দাজ, বৈমানিক—

সবাই। কার আগে কে এই সেতু পার হয়ে ওপারে পৌঁছুবে, তারই জন্যে সবার মধ্যে ব্যস্ততা আর ঠেলাঠেলি।—"কার আগে প্রাণ, কে করিবে দান"—নয়, ঐ যেন "আগে কোন জন, করে পলায়ন।"

অসহায়ভাবে ভিড়ের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিলেন ডাঃ চৌধুরী। কোথায় যাচ্ছেন, কেনই বা যাচ্ছেন, সে সব চিন্তা করবারও যেন কোন প্রয়োজন নেই—থাকলেও কোন লাভ নেই। এমনি করে জনতার চাপে কখন যে "কজ্‌ওয়ে" সেতু পার হয়ে সিঙ্গাপুরের মাটিতে পা দিয়েছেন, তাও ঠাওর করতে উঠতে পারেন নি সেদিন। হঠাৎ একটা বিরাট আওয়াজে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেন "কজ্‌ওয়ে" সেতুটা চ্যানেলের জলে তলিয়ে যাচ্ছে। শত্রুর অগ্রগতি রোধ করার জন্যই মিত্রপক্ষ সেতুটাকে ভেঙ্গে দিলেন সাময়িক আত্মরক্ষায়।

এত করেও কিন্তু রোধ করা যায়নি জাপানীদের। নিজের ইউনিট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সিঙ্গাপুরের হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করেন ডাঃ চৌধুরী। ৪৪নং ভারতীয় ব্রিগেডের মেডিকেল ইউনিটে যোগদান করার হুকুম নিয়ে ১লা ফেব্রুয়ারী তিনি নতুন কার্যভার গ্রহণ করেন। দ্বীপের পশ্চিমপ্রান্তে দক্ষিণে জুরং নদী এবং উত্তরে থাম্না কেং গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে ৪৪নং ব্রিগেডের রক্ষাব্যূহের ছাউনি।

৯ই ফেব্রুয়ারী সকালবেলা জোহর প্রণালীর অপর তীর থেকে শুরু হয় জাপানীদের গোলা বর্ষণ। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তাজা বারুদের গন্ধ ধমনীতে অপূর্ব একটা উন্মাদনা এনে দেয়। চারদিন পর্যন্ত জলে-স্থলে-আকাশে চলে শত্রুপক্ষের প্রচণ্ডতম হানা। রণক্ষেত্র নয়, যেন মৃত আর আহতের ডাম্পিং গ্রাউণ্ড। নিদ্রাহীন ডাঃ চৌধুরী আহত সৈনিকদের পরিচর্যা করে চলেছেন সহকারীদের নিরলস সহযোগিতায়। শত্রুসেনার প্রবল চাপে পিছু হঠতে হচ্ছে দিনের পর দিন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী সংগ্রামের শেষ পর্ব অভিনীত হয়।—বুকিত-টিমা সড়কের দক্ষিণে সিঙ্গাপুর শহরতলীকে রক্ষা করার জন্য শেষবারের মত তৈরী হল তাঁর ব্রিগেড। কিন্তু কী নিয়ে আর তারা যুদ্ধ করবে—পিছনে শহরের জনতার মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে, শ্রমিকেরা কাজ-কর্ম বন্ধ করে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে বেড়াচ্ছে; আর সামনে দুষমণ চালিয়ে যাচ্ছে আঘাতেব পর আঘাত। আত্মসমর্পণ যে আসন্ন হয়ে আসছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। নিজের অজ্ঞাতেই দেহটা শিউরে শিউরে উঠছে ডাঃ চৌধুরীর অন্ধকার তাঁবুটাব ভিতর। আস্তে আস্তে তিনি ডাকেন —শিউরাম—

শিউরাম তাঁর আরদালী—দেশ বেনারস অঞ্চলে। মনিবের ডাকে সাড়া দেয়—বাবুজী!

ডাঃ চৌধুরী নীরসকণ্ঠে বলেন—কী বুঝছিস্?

—কী আর বুঝব বাবুজী; জাপানীদের হাতে হয় ধরা দিতে হবে, নয়তো জান দিতে হবে—বলে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

বেনারসের বাসিন্দা বলেই হয়ত শিউরাম পরিষ্কার বাংলা ভাষায় কথা বলতে শিখেছে।

—কোনটা হলে ভাল হয়, তুই মনে করিস্? আবার প্রশ্ন করেন ডাঃ চৌধুরী।

—যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি, বাবুজী। এখন বন্দী হলেই বা কী, আর মরে গেলেই বা কী।—দুই-ই সমান বাবুজী।

—কেন বে; মবে গেলে দেশে তোর মা-বোন, বৌ-ছেলে সবাই কাঁদবে না?

—ও তো এখনো কাঁদতে লেগেছে, বাবুজী। বন্দী হয়ে দুষমণের খাঁচায় আটকে থাকলেই বা তারা আমায় ফিরিয়া পাবে কি করে— হামি তো এখন খরচার খাতায় পড়িয়ে গেছি, বাবুজী!

বর্তমানের এই অসহনীয় অবস্থাটার এমন একটা দার্শনিক

ব্যাখ্যা শিউরামের মত একটা নিরক্ষর ব্যক্তির মুখে শুনতে পাবেন বলে বোধহয় ডাঃ চৌধুরী প্রস্তুত ছিলেন না। তাই অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকান। তাবপর তার পিঠে একটু মৃদু করাঘাত করে শুধু বলেন—রাত অনেক হয়েছে যা, একটু ঘুমিয়ে নে গে। সকালে কী হবে, কে জানে!

আস্তে আস্তে শিউরাম উঠে তার খুপ্‌রীতে ঢুকে সটান শুয়ে পড়ে। খানিক পরই সেদিক থেকে আগত নাসিকাধ্বনি ঘোষণা করে শিউরাম নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু ঘুম নেই ডাঃ চৌধুরীর চোখে। ভেবেছিলেন—সিঙ্গাপুরে পৌঁছুলেই নিরাপদ হবে তাঁর সাথীরা; কিন্তু সে আশা আজ মিলিয়ে গেছে যুদ্ধোন্মত্ত মানুষের দয়ামায়াহীন দানবীয় আঘাতে। সরলমতি শিশু গৌতম যে আকাশকে ধরা যাবে বলে একদিন কল্পনা করেছিল, পূর্ণবয়স্ক ডাঃ চৌধুবী আজ স্পষ্ট উপলব্ধি করেন শৈশবের সে আশা ছিল একটা আকাশকুসুম মাত্র। মানুষ মূলতঃ পশু ছাড়া আর কিছু নয়; স্থযোগ পেলেই পবস্পরকে আঘাত কবে একে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করবার জন্য লোলুপ হয়ে উঠে। তারপর? তারপর রণক্লান্ত হয়ে পরবর্তী আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য সন্ধি স্থাপন করে। গালভরা শান্তির বাণী শোনায় বিশ্বের দরবারে। ভাবতে ভাবতে কখন যে দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসে, টেরও পান না ডাঃ চৌধুরী।

ঘুম যখন ভাঙ্গে, তখন বেলা আটটা প্রায়। চোখ মুছে উঠে বসেন। প্রথমটা ঠাহর হয় না—কোথায় রয়েছেন। খেয়াল যখন হয়, তখন একটু অবাকই হয়ে যান। এতটা বেলা হয়েছে। তবু চারিদিক এমন নিঃসাড় কেন?—যেন সারা শহরটাই ঘুমিয়ে আছে। কামানের গোলার আওয়াজ, বোমারু ফাইটারের শব্দ—কোথায় সব মিলিয়ে গেল?

বাইরে এসে দাঁড়ান। সহসা নজরে পড়ে সামনের পাহাড়টার

চূড়োয় একটা সাদা নিশান্ বাতাসের তালে তালে উড়ছে। সন্দেহ থাকে না যে ইংরাজ সেনা আত্মসমর্পণ করেছে।

সন্দেহ ভঞ্জন করে দেখা গেল সাদা নিশান উড়িয়ে ডেস্‌পাচ্‌ রাইডারের দল মটর সাইকেলে সে খবরই জানিয়ে বেড়াচ্ছে, এক সেক্‌টার থেকে অন্য সেক্‌টারে। অজ্ঞাতসারেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস যেন তাঁর বুক থেকে বেরিয়ে আসে। এটা কাপুরুষতার লক্ষণ ভেবে নিজের মনেই লজ্জিত হয়ে উঠেন ডাঃ চৌধুরী।

কিন্তু খানিক পরেই সে লজ্জা রূপান্তরিত হল দারুণ ক্রোধে আর ঘৃণায়।

একজন ডেস্‌পাচ্‌ রাইডার্‌কে থামিয়ে খবর জিজ্ঞাসা করতেই সে জানাল সে ইংরেজ ও অস্ট্রেলিয়ানরা জাপানীদের কাছে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তারা হবে যুদ্ধবন্দী। পক্ষান্তরে ভারতীয় সৈন্য আর অফিসারদের জাপানীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে মাত্র। অর্থাৎ—ইংরেজ ও অস্ট্রেলিয়ানরা হবে আন্তর্জাতিক নিয়মাধীন বন্দী, আর ভারতীয়রা যুদ্ধবন্দী হয়ে বেঁচে থাকার অধিকারও পাবেন না। চরম পরাজয়ের মুখেও ইংরেজ-জেনারেল বুঝিয়ে দিতে চাইল যে সাদা আর কালোর তফাৎ আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনি থাকবে।

তা থাক; কিন্তু মোদ্দা অবস্থাটা কী দাঁড়াল? যুদ্ধ করতে এসেও যদি তাঁরা বন্দী বলে গণ্য হলেন না, তবে তাঁদের খাওয়াবার দায়িত্বটা কার?—তাঁদের নিজেদেরই কি তা করতে হবে? তবে কি তাঁদের গরু-ভেড়ার মতই ঘুরে ঘুরে দানাপানি সংগ্রহ করতে হবে? ভাবতেও যেন সারা দেহটা ইংরেজের বিরুদ্ধে দারুণ ঘৃণায় কুঁকড়ে আসে। ছিঃ, এমন একটা জঘণ্যতম ব্যবস্থায় ইংরেজ জেনারেল রাজী হলেন কী করে? রাজী যখন হয়েছেনই, তখন ভারতীয় সৈন্যদের আর কোন দায়-দায়িত্ব রইল কি বৃটিশ মিলিটারি কোডের প্রতি? আচম্বিতে এ প্রশ্নটা নাড়া দিয়ে যায় ডাঃ চৌধুরীর অবচেতন সত্বাকে। সাদা রুমাল হাতে শিউরামকে নিয়ে আস্তে আস্তে পা বাড়ান জাপানী লাইনের দিকে। সঙ্গে শিউরাম।

॥ বারো ॥

সারা রণাঙ্গন জুড়ে নেমে আসে এক অনিশ্চয়তার বিভীষিকা।

ভারতীয় সেনানায়ক ও সেনানীদের নিয়ে শুরু হয় জাপ সামরিক কর্তাদের গড়িমসি। বে-ওয়ারিস মাল। না ঘরকা না ঘাটকা। গরু মোষের মত মাঠে চড়ে বেড়ায়। ওদের খাওয়াবার দায়িত্ব না বৃটিশ সরকারের না জাপ সরকারের। নিরলম্ব এ অবস্থায় অনশন অনিদ্রায় পেটের জ্বালায় অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে অনেকে ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। দেখা দেয় মহামারিরূপে বেরিবেরির রূপ।

সব বিপদই কেটে যায় একদিন। ইতিমধ্যে রেঙ্গুন সহ সারা ব্রহ্মদেশ দখল করে নিয়েছে জাপান। গঠিত হয়েছে তাদেরই নিয়ন্ত্রনাধীন বা-ম-এর নেতৃত্বে এক পুতুল সরকার।

যূথ-ভ্রষ্ট ভারতীয় সেনাদল এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় আত্মরক্ষার জৈবিক তাড়নায়। গুজব শোনা যায় প্রবীণ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ব্যাংকক-এ এসে গঠন করেছেন ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্‌স্‌ লীগ। তাঁর দূত হিসাবে ক্যাপ্‌টেন মোহন সিং সারা দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে বিক্ষিপ্ত ভারতীয় সেনানীদের নিয়ে এক সুগঠিত সেনাদল গড়ে তুলতে চান নতুন এক "আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ"। এই ফৌজ বৃটিশের নাগপাশ থেকে মুক্ত করবে ভারতমাতাকে।—সিঙাপুরে এসে এক সভায় সকলের সহযোগিতার জন্যে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে আবেদন জানান ক্যাপ্টেন সিং।

—কিন্তু আমরা তো মানুষ নই স্যর—কে একজন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে—যুদ্ধ বন্দীর অধিকার থেকে তাই আমরা বঞ্চিত।

—এ বঞ্চনার জন্মে দায়ী বৃটিশ সরকার—

—তাছাড়া, আমরা বৃটিশ সম্রাটের নামে শপথ গ্রহণ করেছি—বলে অপর এক জোয়ান—

—যে সম্রাট তার প্রজার মর্যাদা রক্ষা করতে অক্ষম তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা আমাদের জন্মগত অধিকার—তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং।

সব দ্বিধা সব দ্বন্দ্ব কাটিয়ে গড়ে ওঠে ষোল হাজার সেনানীর পুরো একটি কন্‌ব্যাট ব্রিগেড। ডাঃ চৌধুবী ব্রিগেডেব মেডিক্যাল অফিসার। ক্যাপ্টেন সিং আশা করেছিলেন জাপ সরকার এগিয়ে আসবে ব্রিগেড-এর পূর্ণ সহযোগিতায়। কিন্তু সে তবফ থেকে কোন সাড়া মেলে না। আবার নামে অনিশ্চয়তাব বিভীষিকা।

স্বয়ং রাসবিহারী বসু সিঙাপুরে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে আসেন। বয়সের ভারে ক্লান্ত চির বিপ্লবী রাসবিহারী বুঝতে পারেন ভাঙা ঘর জোড়া দেবার ক্ষমতা তার নেই। সে ক্ষমতা রাখেন শুধু তরুণ নায়ক সুভাষচন্দ্র বসু। জোয়ানদের জানান—১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে বৃটিশ গোয়েন্দাদের চোখে ধূলো দিয়ে কলকাতা থেকে কাবুল ও মস্কোর পথে সুভাষ বারলিনে পাড়ি দিয়েছিলেন। সেখানে হিট্‌লার-এব সাহায্যে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে একটা মুক্তি-ফৌজও গড়ে তুলছেন। কিন্তু তিনি নিজে এবং জাপ সরকার মনে করেন সংগ্রামী সুভাষের যোগ্য সংগ্রামক্ষেত্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, জার্মানী নয়—যেখানে পলায়মান বৃটিশ বাহিনীকে সরাসরি আঘাত হানা যাবে। যে আঘাতের ফলশ্রুতি স্বাধীন ভারত। তাই, সুভাষকে সিঙাপুরে নিয়ে আসার প্রস্তুতি চলছে। মাস খানেকের মধ্যে তিনি এসে যাবেন।

সম্মিলিত জোয়ানদের মধ্যে নতুন উদ্যমের জোয়ার নামে।

মাস খানেক পর খবর এসে যায় সুভাষ বসু এসেছেন। বিকেল তিনটায় ময়দানে সভা।

ময়দান তখন লোকে লোকারণ্য। তার সঙ্গে যুক্ত হল ষোল হাজার সেনানীর পুরো এক ব্রিগেড।

আজ উনিশ বছর পর বম্বে মেল-এর নিঃসঙ্গ কামরায় সেদিনকার দৃশ্য ভেসে ওঠে ডাঃ চৌধুরীর বিনিদ্র চোখের সামনে। সবার মনে একই প্রশ্ন—সত্যি কী তিনি এসেছেন ?

সকল প্রশ্নের অবসান ঘটিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গীতে উঠে আসেন পূর্ণ সমর-নায়কের বেশে সুভাষচন্দ্র। সঙ্গে জাপানী সমরাধিনায়ক ফুজিহারা এবং আরও অনেকে।

লক্ষ কণ্ঠে যুগপৎ ধ্বনি উঠে—সুভাষ বসু জিন্দাবাদ।

—সুভাষ বসু জিন্দাবাদ নয়, বলুন—জয় হিন্দ্—উদাত্ত সুরে মাইকের মাধ্যমে ভেসে আসে সুভাষের দৃপ্ত কণ্ঠ।

আবার লক্ষ কণ্ঠের জয়ধ্বনি—জয় হিন্দ্—নেতাজি জিন্দাবাদ ?

সেদিন থেকে সুভাষচন্দ্র সারাভারতের নেতাজি।

অবিস্মরণীয় দৃশ্য, অবিস্মরণীয় ঘটনা—ভাবেন ডাঃ চৌধুরী।

দক্ষিণ হস্ত ঊর্ধে তুলে অভিবাদনের ভঙ্গীতে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে বাংলার দামাল ছেলে সুভাষচন্দ্র। সমবেত জনতার কল-কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যায় নিমেষে। নেতাজি বলেন—

"বন্ধুগণ, আমাদের সামনে আজ কঠিন সংগ্রাম। শত্রুপক্ষ শক্তিমান, নিষ্ঠুর—ওদের বিবেকের কোন বালাই নেই। স্বাধীনতার এই জেহাদে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অভাব অভিযোগ, পরিশ্রমের সব ক্লান্তি ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র মৃত্যুর মুখোমুখি রুখে দাঁড়াবার সংকল্পে বলীয়ান হতে হবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই আমাদের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত জেনো।"—

আরও অনেক কিছু ঘোষণা করেন নেতাজী। স্বার্থান্বেষী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিপ্লবী আঘাত হানার উদ্দেশ্যে অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ্ সরকার গঠন প্রচেষ্টায় তাঁর দৃঢ় সংকল্পের কথা; রাসবিহারী বসু ও ক্যাপ্টেন্ মোহন সিং-এর নেতৃত্বে ইতিপূর্বেই যে

এশিয়া লীগ্ ও আজাদ-হিন্দ ফৌজের পত্তন হয়েছিল, তার প্রতি তাঁর পূর্ণ আনুগত্যমূলক সমর্থনের কথা। বর্মা-মালয় আর সিঙ্গাপুরে বৃটিশবাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত, উপেক্ষিত প্রতিটি ভারতীয় সৈনিক ও সেনাপতিকে এই অস্থায়ী সরকারী ফৌজে সামিল হবার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেন—"ভাইসব, তোমরা আমাকে অনুসরণ করো, ···তোমরা আমায় দাও রক্ত, তোমাদের আমি জয়ের লক্ষ্যে পৌছে দিয়ে পাইয়ে দেব স্বাধীনতা। যতদিন ভারতের সুপ্রাচীন রাজধানী দিল্লীর লালকেল্লায় স্বাধীনতার বিজয়োৎসব না হচ্ছে, ততদিন আমাদের রণধ্বনি হোক্—"চলো দিল্লী"—"দিল্লী চলো"—।

প্রতিধ্বনির মতই লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে রণরণিত হয়ে উঠে—

—"চলো দিল্লী—দিল্লী চলো"—

ভিড়ের ভিতর থেকে কে একজন হুংকার ছাড়ে—"জয় হিন্দ্"—

লক্ষ কণ্ঠে আওয়াজ উঠে—"জয় হিন্দ্"—

এমনিভাবে নতুন বানে স্ফীত হয়ে উঠে প্রবাসী ভারতবাসীর মন-দরিয়া। দেখতে দেখতে গড়ে উঠে আজাদ হিন্দ ফৌজ আর অস্থায়ী সরকার—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে।

এই অস্থায়ী সরকারের পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্র আর তার সহকর্মীগণ ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর ভারতীয় জনগণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন তাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নির্দেশবাণী—

—"ভাইসব, সুদূর পূর্ব এশিয় ভূমি থেকে আমি সুভাষ বলছি—ঈশ্বরের নামে, ভাবতীয় জনগণের জাতীয় ঐক্যবিধায়ক পূর্বপুরুষদের নামে এবং যাঁরা আমাদের সামনে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শ রেখে গেছেন, সেই সব মৃত ভারতীয় বীবদের নামে আমি পৃথিবীর সমগ্র ভারতীয়দের আমাদের এই সংগ্রামী চিহ্নিত পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হয়ে ভারতমাতার স্বাধীনতার অব্যর্থ লড়াই চালাবার আহ্বান জানাচ্ছি"।

সব শুনেছেন, সব দেখেছেন, সব কিছুর সামিলও হয়েছেন ডাঃ

চৌধুরী। কিন্তু সবচেয়ে তিনি আরো গর্বিত হলেন যখন কর্ণেল চ্যাটার্জীকে এই অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকারের অর্থদপ্তরের ভার দেবার পরই সরকার ডাঃ চৌধুরীর উপর ভার দিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের মেডিকেল ইউনিটের সম্পূর্ণ দায়িত্ব।

যুদ্ধে যোগ দেবার আগে, বাংলার মাটিতে ঢাকা সহরের বুকে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা বহুবার শুনেছেন ডাঃ চৌধুরী। কিন্তু এত কাছে এত আপনজনের মত কোনদিন তাঁকে পাবার সৌভাগ্য হয়নি। তাছাড়া, তখন ছিলেন তিনি সুভাষচন্দ্র—স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সৈনিক মাত্র।—আর আজ? আজ তিনি নেতাজী—অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকারের সর্বময় কর্তা। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক।

নেতাজীর সান্নিধ্যে ডাঃ চৌধুরীর সারা দেহে তড়িৎ প্রবাহ খেলে যায়—গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠে। মন্ত্রমুগ্ধের মত তিনি সামরিক কায়দায় স্যালুট্ করে বলে উঠেন—আপনার আদেশ শিরোধার্য। জয় নেতাজী—জয় হিন্দ্।

তারপর চার-পাঁচ মাস ধরে চলে বিভিন্ন ইউনিট গঠনের কর্মতৎপরতা। কাজ ক্রমেই বেড়ে যায়। নিঃশ্বাস বা দম ফেলবারও সময় থাকে না। শুধু এগিয়ে চলার তাগিদ। পরাধীন ভারতকে পিছনে ফেলে এসেছেন যেন, এবার এগিয়ে চলেছেন শুধু স্বাধীন ভারতের দিল্লীর লালকেল্লার সুউচ্চ গম্বুজে ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলনের প্রচেষ্টা ও সঙ্কল্প নিয়ে। না হোক্ ঘুম, না মিলুক আহার—কিছুই তাতে যায়-আসে না।

অবশেষ ১৯৪২-এর ৭ই জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র তাঁর সদর-দপ্তর আর মন্ত্রীসভার প্রধানদের নিয়ে রেঙ্গুনে এসে পৌঁছুলেন। তার দু'সপ্তাহ আগেই ডাঃ চৌধুরী সদলবলে রেঙ্গুনে এসে তাঁর ক্যাম্প্ প্রতিষ্ঠা করেছেন। নেতাজী এসেই বিভিন্ন ইউনিটের কুচকাওয়াজ আর মহড়া পরিদর্শনে গা ঢেলে দেন। উদয়াস্ত তাঁর বিশ্রামের অবকাশ নেই।

জাপানী সমরকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ঠিক করেন একটি ব্যাটেলিয়ান্ কালাদান উপত্যকায় বৃটিশ-পশ্চিম আফ্রিকান ডিভিশনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বাহিনীর অঙ্গীভূত হবে, আর দুটি ব্যাটেলিয়ান চীন পাহাড় এলাকার পথে পাহারারত জাপবাহিনীর বদলী হিসাবে কাজ করবে। এবার তাদেরই বিদায়ী ভাষণে নেতাজী বলেন—

> "—রক্তের ডাক এসেছে। উঠো—জাগো। আর এক মুহূর্তও দেরী নয়। হাতে অস্ত্র তুলে নাও। তোমাদের সামনে আমাদেব পথপ্রদর্শকদের গড়া রাস্তা। সেই পথ ধরেই আমবা এগিয়ে যাব। শত্রুপক্ষের সারি ভেদ করে আমরা চলার পথ তৈবী করে নেব। আর যদি ঈশ্ববেব ইচ্ছা তাই থাকে, হাসিমুখে আমরা মৃত্যুবরণ করে শহীদ হব। আমাদের বাহিনী যে পথে দিল্লী যাবে, চিবনিদ্রায় শায়িত হয়ে সেই পথ আমবা চুম্বন করব। দিল্লীর পথ, স্বাধীনতাব পথ। চলো দিল্লী—দিল্লী চলো।"

নেতাজীর মুখে শোনা সেই উদাত্ত বাণী আজও বাজে ডাঃ চৌধুবীর কানে। ভারত স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু পৌরুষকণ্ঠ আর শোনা যায় না। দিল্লীর লালকেল্লার গম্বুজেও ত্রিরঙ্গা পতাকা আজ বিজয় গর্বে উড়ছে পৎপতিয়ে; কিন্তু যিনি সুদূব সিঙ্গাপুর থেকে, রেঙ্গুন থেকে ডাক দিয়েছিলেন—চলো দিল্লী—দিল্লী চলো। তিনি আজ কোথায়?

ভাবতে ভাবতে উত্তেজনায় গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠে বসেন ডাঃ চৌধুরী। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর খেয়াল হয়—সিঙ্গাপুর নয়, রেঙ্গুনও নয়, আর এটা ১৯৪৪ সালও নয়; বর্তমানে তিনি বয়েছেন হাওড়াগামী বম্বে মেলে, আর সালটা ১৯৬২।

সম্বিত ফিরে পেতেই তাঁর উত্তেজনা উবে যায়। তিনি ধীরে ক্লান্ত দেহটা বার্থটায় এলিয়ে দেন। আবার কখন নিজের অজ্ঞান্তেই

ফিরে যান সেই ফেলে আসা দিনগুলোতে। মনে পড়ে—একে একে গোটা রেজিমেণ্ট রণাঙ্গনে রওনা হয়ে যায়, আর তার পিছনে ভাগে ভাগে মেডিকেল ইউনিটগুলোও। তিনি নিজে রয়ে গেলেন রেঙ্গুনে সদর ইউনিটের তত্ত্বাবধানে। অগ্রবর্তী ঘাঁটির সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন ডাঃ চৌধুরীও। কিন্তু নেতাজীর নির্দেশে তাঁকে বেস্ (base) থেকে অগ্রবর্তী ইউনিটে রিজার্ভ ফোর্স পাঠাবার গুরুভার দেওয়া হয়েছে। অতএব, রিজার্ভ ফোর্স গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে আপাততঃ রেঙ্গুনেই থাকতে হবে। পরবর্তীকালে সেনাবাহিনীর অগ্রগতির সাথে তাল রেখে এগিয়ে গেলেই চলবে।

এদিকে শুরু হয়ে গেছে আই. এন্. এ. আর জাপ সম্মিলিত বাহিনীর যুগ্ম অভিযান। জাপ সেনাপতি মাতাগুচির সঙ্গে মেমিওতে নেতাজী মিলিত হয়ে আগামী রণনীতির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে ব্যস্ত। মার্চ মাসের শেষের দিকে খবর এলো যে জাপ ও আই. এন্. এ-র সম্মিলিত দল ভারত সীমান্তে পৌঁছে গেছে। অধিকৃত অঞ্চলে বেসামরিক শাসন ব্যবস্থার সুঠাম পরিকল্পনা প্রয়োগের জন্য মেমিওতে ডাক পড়ে লেঃ কর্ণেল চ্যাটার্জীর। চারিদিকে কর্মচাঞ্চল্য, উৎসাহ আর উদ্দীপনার বন্যা। আরাকান ফ্রণ্টে মেজর মিশ্রের পরিচালনায় আই. এন্. এ দলের সাফল্যের কাহিনী দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত করে তুলে ইম্ফল আক্রমণোন্মুখ সেনা দলকে। ডাঃ চৌধুরীর রক্তেও লেগেছে আগুনের ছোঁয়া। রেঙ্গুনে বসে থাকা যেন কাপুরুষতার নামান্তর মাত্র। অনেক সাধ্য-সাধনার পর অনুমতি মিলে বেস্ মেডিকেল ক্যাম্প কালোয়াতে এগিয়ে নেবার।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি ডাঃ চৌধুরী সদলবলে কালোওয়াতে পৌঁছুলেন। চিন্‌ডুইন্ নদীর তীরে একটি ছোট্ট পাহাড়ের গায়ে মনোরম একটি জায়গা বেছে নিয়ে তিনি ক্যাম্প স্থাপন করেন। সঙ্গে রেঙ্গুন থেকে আনা ওষুধপত্র আর যন্ত্রপাতিও। কিন্তু তার

পরিমাণ একটি পুরোপুরি বেসক্যাম্প চালাবার পক্ষে পর্যাপ্ত মোটেই নয়। কথা ছিল প্রয়োজনীয় মালমসলা জাপ সরবরাহকারী সংস্থা হিকারিকিকান দল যোগান দেবে। কার্যকালে তার কিছুই হয়নি। শোনা যায় জাপানীদের নিজেদের সরবরাহেই টান ধরেছে। কাজেই সংগৃহীত ওষুধপত্রের মোটা অংশ জাপ সৈন্যদের জন্য রেখে ছিঁটে-ফোঁটা আসে আই. এন্. এ-র জন্য। কখনো কখনো হয়ত কিছুই না।

মে মাস শেষ হতে না হতেই নেমে আসে বর্ষা সমস্ত আকাশ ভেঙে। চিন পাহাড়ে বর্ষার সে প্রলয়ঙ্কর রূপ যারা দেখেনি, তারা কল্পনাও করতে পারবে না সত্যি কারের বর্ষা কাকে বলে। চাট্গাঁ-এর অধিবাসী ডাঃ চৌধুরী বর্ষার অবিরল ধারার সঙ্গে সুপরিচিত। তবু তার কাছেও এ যেন এক নতুন অভিজ্ঞতা। ঝম্-ঝম্, ঝম্-ঝম্; বিরামহীন ধারাবর্ষণের আওয়াজ—মাঝে মাঝে প্রবল হাওয়া তার সঙ্গে যোগ দিয়ে যেন সারা পৃথিবীটাকে ওলট্-পালট্ করে দিতে বদ্ধপরিকর। পিছিল, কর্দমাক্ত রাস্তায় বেরুবার উপায় নাই। বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা প্লাবিত করে নেমে আসে জলস্রোত। কোথা যাবে? বাইরে এতটুকু পা বাড়িয়েছ তো তাড়া করে আসছে অগুন্তি জোঁক আর নাম-না-জানা অদ্ভুত আকৃতির সরীসৃপের দল। তেমন সাহসী যোদ্ধাকেও যাকে দেখলে পিছু হট্তে হয়। সারা গায়ে আজও কাঁটা দেয়, সেই সব দৃশ্যের কথা ভাবলে।

—কেমন করে, কেমন করে সেই দিনগুলো পেরিয়ে এসে আজও বেঁচে আছেন তিনি। কত মানুষ—কত জোয়ান হারিয়ে গেল চিন পাহাড়ের উপত্যকায় আর গহ্বরে বা চিন্ডুইন্ নদীর স্রোতে; কত বিধবার ক্রন্দনরোলে ভরে গেছে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের শত-সহস্র গ্রামের আকাশ-বাতাস; কত মায়ের শিশু হারিয়েছে তাদের স্নেহময় পিতা আর ভ্রাতাকে, হয়েছে নিঃসম্বল, নিরাশ্রয়। অথচ, সারা পৃথিবীতে একান্ত আপনজন

বলতে একমাত্র যার কেউ কোথাও নেই—সেই ডাঃ চৌধুরীই শুধু সব বিপদ, সব বাধা ডিঙিয়ে আজও বেঁচে আছেন। আশ্চর্য—অতি আশ্চর্য এই জীবন-মৃত্যুর বিরাট রহস্য।

রহস্য যাই থাক—কেমন করে ভুলবেন তিনি সেদিনকার হৃদয়-বিদারক করুণ সেই দৃশ্যগুলো। পালেল বিমান ঘাঁটির উপর বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ, কোহিমায় ত্রিরঙ্গা পতাকা উড্ডয়ন—আই. এন. এর সংগ্রামী অধ্যায়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে সবই। কিন্তু এত চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নি বৃটিশ চতুর্দশ বাহিনীর দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করে ভারতের জমিতে সুদৃঢ় ঘাঁটি স্থাপন করা। একদিকে প্রবল বর্ষা, অন্যদিকে অপরিমিত খাদ্য সমস্যাসহ অস্ত্র, যানবাহন এবং পোষাকাদি—সব কিছু মিলে যেন নেতাজীর স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর। অর্ধাহারে, অনাহারে মৃতপ্রায় সৈনিকের দল এসে জড়ো হতে থাকে মেডিকেল ক্যাম্পের প্রাঙ্গণে। হাঁটবার ক্ষমতা নেই—হামাগুড়ি দিতে দিতে শত শত জোয়ান এগিয়ে আসে। তার মধ্যে অসুস্থ এবং আহতদের সংখ্যাও গুণে শেষ করা যায় না; হাসপাতালে দেখা দেয় জায়গার অভাব। খোল—খোল, নতুন হাসপাতাল খোল, নির্দেশ এল রেঙ্গুন থেকে। নেতাজী জানালেন—যেমন করেই হোক, বিশ্রাম এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে ক্লান্ত ও পীড়িত জোয়ানদের জন্য। রেঙ্গুন থেকে যতটা সম্ভব ওষুধপত্র, জামা-কাপড়, বুট ও খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন তিনি।

কিন্তু পদে পদে সেই গুরুদায়িত্ব পালনের ব্যর্থতা ডাঃ চৌধুরীর মনকে দিনরাত পীড়িত করে। সরবরাহের অভাবকে পূরণ করতে চান তিনি মৌখিক সান্ত্বনার ভাষা দিয়ে। কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোল দিয়ে কতটাই বা মিটানো যায়? নতুন করে শৈশবের কথা মনে পড়ে। বাবাকে বলেছিলেন, ডাক্তার হয়ে যুদ্ধে আহত সৈনিকের সেবা করবেন তিনি। সে সুযোগ তাঁর এসেছে। তবু তো চোখের

সামনে শত শত আহত সৈনিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে যাচ্ছে তাঁর সব প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়ে। তাই তিনি ভাবেন—কত তুচ্ছ, কত সীমিত মানুষের শক্তি ; যে শক্তির আস্ফালনে আজ সারা বিশ্ব কম্পিত।

একদিকে হিট্‌লার-মুসোলিনি-তোজো, অন্যদিকে চার্চিল-স্তালিন-রুজ্‌ভেল্ট্—পরস্পর বিরোধী শক্তিপুঞ্জের দাপটে লক্ষ লক্ষ জোয়ানের তাজারক্তে ভিজে যাচ্ছে শতরণাঙ্গণের কঠিন মাটি, আর সেই মাটিতে মিশিয়ে যাচ্ছে আশাভঙ্গের কত দীর্ঘশ্বাস ভরা হাহাকার।

এ প্রহসন কবে থামবে?—ক্যাম্পেব এক কোণে নিজের তাঁবুতে টিমটিমে আলোব সামনে বসে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেন ডাঃ চৌধুরী। বাত বারোটা পর্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে সবে-মাত্র তাঁবুতে ফিবেছেন। হাতমুখ ধুয়ে টেবিলটাব সামনে বসতে শিউরাম এনে দিল ছ'পিস্ ব্রাউন রুটি, আব একগ্লাস গরম দুধ। একটু একটু কবে রুটি মুখে দিয়ে গবম দুধে চুমুক দিচ্ছেন—আর ঠিক সেই সময় ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের দিক থেকে একটা আর্তনাদ ভেসে আসে। তাড়াতাড়ি একদমে গ্লাসের দুধটা নিঃশেষ করে ছুটে বেরিয়ে যান তিনি।

গেট্‌টার সামনে একদল লোক জটলা করছে। একনজরেই তিনি বুঝতে পারেন যে ওরা ফ্রন্ট্ থেকে সদ্য আগত রুগ্ন আর আহত সৈনিকদল থেকে ছিটকে আসা ছোটখাটো একটা দল। পায়ে কারো বুট আছে, কারো বা নেই—যাদের আছে, তাও ছিন্ন-ভিন্ন। গায়ের পোষাকও তেমনি ময়লা আর নোংরা—শতছিন্ন অবস্থা। চোখ সব কোটরাগত। মনে হয়, কমপক্ষে সপ্তাহকাল কোন খাবার জোটেনি। পেট ব্যাথায় বা ম্যালেবিয়ায় ধুঁকছে। এদেরই মধ্যে একজন ক্রমাগত আর্তনাদ করে চলেছে। সারা দেহ তার রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মলিন পোষাকে চাপচাপ রক্তের দাগ।

ডাক্তারকে দেখে সবাই রাস্তা করে দেয়। উপুড় হয়ে লোকটিকে দেখেন—তার গালভরা দাড়ি রক্ত শুকিয়ে জট্ পাকিয়ে গেছে; বুঝলেন সুভাষ রেজিমেণ্টের একজন শিখ্ লেফ্টেনেণ্ট্। ডান হাতটি তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সামান্য একটু চামড়ার সঙ্গে সুতোর মাথায় ছিন্ন ঘুড়ির মতই ঝুলছে। তারই যন্ত্রণা সইতে না পেরে কখনও অস্ফুট, কখনও বা তীব্র আর্তনাদে ভেঙে পড়ছে অসহায়ের মত এত বড় একটা লড়াকু জোয়ান। মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে কি যেন আবার বলছে। মুখের কাছে কাণ এগিয়ে নিলেন ডাঃ চৌধুরী। শুনলেন সে বলছে—জয়হিন্দ্—জয় নেতাজী, নেতাজী জিন্দাবাদ্—দুশমন্ মুর্দাবাদ্।

আর্দালীর সাহায্যে অতি সন্তর্পনে আস্তে আস্তে বেদনাক্লিষ্ট সেই সৈনিককে তুলে নিয়ে যান হাতপাতালের বেডে। সহকারী ডাক্তারকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে তিনি চলে যান অন্যান্যদেব তদাবক করতে।

তাদের কাছে ফ্রণ্টের যে করুণ কাহিনী শুনলেন তাতে তাঁর মন বিষাদে ভরে যায়। ইম্ফল আর কোহিমার পথে জাপ সেনাদলের পাশাপাশি বীরদর্পে এগিয়ে চলেছিল আই.এন্ এর মুক্তি-যোদ্ধাদল। মুখে তাদের "জয়হিন্দ্" ধ্বনি, চোখে তাদের স্বাধীন ভারতের উজ্জ্বল ছবি। কিন্তু রসদের অভাবে আর গোলাবারুদ ও যানবাহনের অভাবে, তার ওপর নতুন বলে বলীয়ান, শক্তিমান বৃটিশ সেনা-বাহিনীর দুর্দণ্ড চাপে বেচারাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। দুর্ভাগ্য তাদের চরমে পৌঁছায়, যখন ম্যালেরিয়া আব আমাশয় রোগ তাদের মহামারীর মত ক্রমশঃ দুর্বল হতে দুর্বলতর কবে দেয়। একদিকে শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণে, অন্যদিকে রোগযন্ত্রণাব তীব্র জ্বালা। দুই দুশ্‌মনের এই সাঁড়াশি অভিযানের চাপ সইতে না পেরে দল ছেড়ে অনেকে পালাতে শুরু করে। ধরা পড়ে বৃটিশের হাতে।

তারই একদলকে পালাবার সময় বাধা দিয়েছিল ঐ কর্তার সিং

যাকে একটু আগে আপনি ধরে বেডে নিয়ে গেলেন ডাক্তার সার্ব্—বলে একজন।

—ও ভালো হোয়ে উঠলে ওরই কাছে শুনতে পাবেন, কেমন কোরে তার হাতটা উড়িয়ে দিলো তাদেরই একজন মর্টার মেরে—পাশ থেকে বলে আর একজন।

—হাঁ, হাঁ—দুশ্‌মন, ডাক্তার সাব—দুশ্‌মন, আংরেজ দুশ্‌মন, হামলোগ্ ভী দুশ্‌মন, :জাপানী ভী দুশ্‌মন—সারা দুনিয়াটাই দুশ্‌মনে ভোরিয়া গেছে। এক্‌লা নেতাজী কী কোরবেন, বোলেন্?

তাই তো একলা নেতাজী কী করবেন? তিনি বলেছেন—"তোমরা রক্ত দাও, আমি দেব স্বাধীনতা"।

সেই রক্ত দেবার বদলে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি। তাহলে তিনি একা কী করবেন? কীই বা করতে পারেন তিনি, যদি আমরা দুশ্‌মনি করি?

ভাবতে ভাবতে তাঁবুতে ফিরে রেডিওটা খুলতেই শুনলেন নেতাজী বলছেন—"লক্ষ্য করা গেছে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজে দলত্যাগের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, বিপ্লবীবাহিনীর পক্ষে ওটা লজ্জার কথা। ভবিষ্যতে যাতে আর দলত্যাগ না হয় তার জন্য সেনাপতিরা সৈন্যদের মনোবল ও চিত্তোৎকর্ষের দিকে বিশেষভাবে নজর রাখবেন।"

কিন্তু কে কার দিকে নজর দেবে? চারিদিকে প্রশাসন ব্যবস্থা ধ্বসে পড়ছে। রাস্তা-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে মানুষের পর মানুষ মরছে—ম্যালেরিয়া বা আন্ত্রিক রোগে। একফোঁটা ওষুধ নেই কোথাও।

এমনি করে ১৯৪৪ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে চিনডুইন নদীর তীরে আই. এন. এর সমস্ত ফ্রণ্টে নেমে আসে পরাজয়ের গ্লানি।

হতাশায় এমনি এক সকালবেলা তাঁবুতে বসে ভবিষ্যতের কথা ভাবছিলেন ডাঃ চৌধুরী। শিউরাম এসে খবর দেয়—হুজুর, নেতাজী।

দারুণ উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠেন ডাঃ চৌধুরী। ছুটে যান হাসপাতালে। সারা হাসপাতালটা থমথম করছে। কর্তার সিং-এর শয্যাপার্শ্বে ঈষৎ উপুড় হয়ে কী যেন শুনছেন নেতাজী। কাঁধে ঝোলানো গুলিভর্তি একটা টমিগান। কর্তার সিং-এর দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে অঝোর ধারায়। তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন নেতাজী। আশেপাশে বেডের জোয়ানরা সব উঠে বসেছে। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছে স্বপ্নের দেবতাকে। ধ্বনি উঠে, নেতাজী জিন্দাবাদ—জয় হিন্দ্।

সোজা হয়ে দাঁড়ান নেতাজী। বলেন—বন্ধুগণ, ইম্ফল-কোহিমা ফ্রণ্ট থেকে ভাগ্যবিপর্যয়ে আমরা আজ পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি সত্য, কিন্তু অচিরে আবার আমরা আমাদের লক্ষ্য পথে এগিয়ে যেতে যে সক্ষম হব, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার। শুধু চাই আমাদের অসীম ধৈর্য—অনমনীয় সংকল্প। ভারত স্বাধীন হবেই —আর সেই স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সৈনিক সমগ্র দেশবাসী আপনাদের স্মরণ রাখবে, ভুলবেন না আপনারা রণধ্বনি— দিল্লী চলো—চলো দিল্লী।

সারা হাসপাতালটা কাঁপিয়ে দিয়ে ধ্বনি উঠে—দিল্লী চলো— চলো দিল্লী।

সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে গেটে দাঁড়ানো গাড়িটার দিকে এগিয়ে যান নেতাজী। ডাঃ চৌধুরী তাঁকে অনুসরণ করেন। নিম্নস্বরে তাকে বলেন—সাতদিনের মধ্যে হাসপাতালটা মেকৃটিলা অঞ্চলে সরিয়ে নেবেন। তারপর গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলেন— মিং-ইয়ান।

॥ তেরো ॥

অপসৃয়মান মূর্তিটার দিকে মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে থাকেন ডাঃ চৌধুরী। গাড়িটা মোড়ের মাথায় অদৃশ্য হয়ে গেলে ধীরে ধীরে ফিরে যান হাসপাতালে।

এবার হাসপাতাল সরাবার পালা। কিন্তু কোথায় গাড়ি, কোথায় ঘোড়া, কোথায় বা যানবাহন। মান্দানে ও ভামোর সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় যানবাহনাদি সংগ্রহ করতে তিন চারদিন কেটে যায়।

বিপদসংকুল যাত্রাপথ। প্রথমদিনেই একঝাঁক শত্রু বিমান মাথার উপর কয়েকবার চক্কর দিয়ে যায়। একপাল শ্যেনপাখী যেন শিকারের সন্ধানে উড়ে বেড়ায়। রেডক্রশ মার্কা পতাকা দেখে ফিরে যায় অন্য শিকারের সন্ধানে। আশেপাশে বর্মী গ্রামগুলো জনমানব শূন্য। যদিও বা দু'চারজনের সাক্ষাৎ মেলে অবজ্ঞাভরে দূরে চলে যায়।

সারাদিন রুটমার্চ-এর শেষে সন্ধ্যায় বিশ্রামের অবসরে রুগ্ন ও আহত সৈনিকদের তত্ত্বাবধান করতে করতে এলেন কর্তার সিং-এর শয্যাপার্শ্বে। ডানহাতটা তার এম্পুটেট করতে হয়েছিল। বামহাতটা তুলে অভিবাদন জানায় কর্তার সিং। দ্বিধার সুরে বলে—কাঁহাপর চল্ রহে হম্ সব—ডগ্‌দর সাব্?

—মেক্‌টিলা।

—কঁ্যু?

—দুশ্‌মন্ এগিয়ে আসছে। তাই আমাদের সরে যেতে হচ্ছে। বলেন ডাঃ চৌধুরী।

—আগ্ বড় রহা তো ক্যা হুয়া? জিৎ হম্‌হে জরুর হোগা, আজাদী জরুর মিল যায়েগী—নেতাজীর প্রতিধ্বনি করে বলে কর্তার সিং।

চমকে উঠেন ডাঃ চৌধুরী। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন।

কর্তার সিং ডাকে—ডগ্‌দর সাব।

—কী, সর্দারজী—

—আপ্ ক্যা সোচ্ রহে— ?

—না, কিছু না—

—হুঁ, হুঁ, হাম্ সমঝ্ গিয়া। আপনা বিবি ঔর বালবাচ্চাকা—

—সর্দারজী—ধমকের সুরে বলেন ডাঃ চৌধুরী।

কিন্তু সেই ধমক সর্দারজীর কানে পৌঁছুবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। নিজেই সে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

এবার তুমি কী ভাবছ, বল—প্রশ্ন করেন ডাঃ চৌধুরী।

—জী, জবাব আসে যেন বহুদূর থেকে।

—কী ভাবছো ?

—জবাবে কর্তার সিং-এর বুক থেকে শুধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে, আর নেমে আসে একটা মৌন স্তব্ধতা। কিছুক্ষণ পর কর্তার সিং বলে—আচ্ছা, ডাকদর সাব, বালবাচ্চোঁকে লিয়ে আপ্‌কা দিলমেঁ।

—আমার তো কোন বালবাচ্চা নেই সর্দারজী। বাধা দিয়ে বলেন ডাঃ চৌধুরী।

—ওঃ, বলে চুপ করে যায় কর্তার সিং।

একটা যেন নতুন অনুভূতি জাগে ডাঃ চৌধুরীর মনে। কিছু একটা বলবার জন্য কর্তার সিং-এর মনটা যে আকুলি-বিকুলি করছে, এটুকু বোঝার একটা সুপ্ত অনুভূতি। আত্মপ্রকাশে সলজ্জ প্রয়াসটাকে সহজ করে আনবার জন্যই তিনি আবার বলেন—সর্দারজী, নাই বা থাকল আমার কোন বালবাচ্চা—তোমার নিশ্চয়ই আছে। বলো না তাদের কথা—শুনি।

নদীর বাঁধ বুঝি ভেঙে পড়ল।

—শুনিয়েগা, ডাকদর সাব্—শুনিয়েগা—উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে উঠে কর্তার সিং।

—জরুর শুনেঙ্গে, সর্দারজী—উৎসাহে জবাব দেন ডাঃ চৌধুরী।

একনিঃশ্বাসে বলে চলে কর্তার তার প্রিয়জনদের কথা। পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলার ছোট্ট এক গাঁয়ে তাদের ঘর। সামান্য কিছু চাষের জমি আছে। তিনপুরুষ ধরে তারা ভারতীয় সেনাদলে কাজ করছে। বাবা-ঠাকুর্দা তাঁরা উভয়েই বর্তমান প্ল্যাটুনে হাবিলদারী করে গিয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধে উভয়েই মেসোপোটোমিয়ার রণক্ষেত্রে ইংরেজের হয়ে লড়াই করেছেন। এবার কর্তার সিং নিজে লড়তে এসেছিল বর্মাফ্রণ্টে। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে তাদের প্ল্যাটুন্ আম্বালা থেকে রওনা হয়েছিল বর্মার পথে। তার আগে পনেরদিনের জন্য সে গিয়েছিল দেশের বাড়ি—যেখানে আছেন তার বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। বড় ছেলে প্রেম সিং সবেমাত্র সতেরয় পা দিয়েছে, দ্বিতীয় সুজন সিং দশ বছরের, আর মেয়েটি মাত্র পাঁচ বছরের। চলে আসবার সময় তার মা আর ছোট ছেলে-মেয়ে দুটো অঝোরে কেঁদেছিল। কাঁদেনি শুধু স্ত্রী আর বড় ছেলে প্রেম সিং। স্বামী তার যুদ্ধে জিতে বীরবেশে ফিরে আসবে, আর সেই গর্বে গরবিনী—এই দৃঢ় বিশ্বাসের উত্তাপে কর্তার সিং-এর মনকে উদ্দীপ্ত রেখেছিল তার স্ত্রী। এতটুকুও দুর্বল হতে দেয়নি তাকে সেই বিদায়ের করুণ ক্ষণটিতেও; আর প্রেম সিং? সিপাহী দলে যোগ দেবার জন্য তখন থেকেই সে তোড়জোড় করছে। জলন্ধর স্টেশনে গাড়ীতে বাবাকে তুলে দেবার জন্য সেও এসেছিল। বলেছিল—সেও অচিরে বাপের সঙ্গে বর্মাফ্রণ্টে যোগ দেবে, আর দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠেছিল—বাপুজী, জরুর মোলাকাৎ হোগা।

তারপর কত দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গড়িয়ে চার চারটি বছর কেটে গেল। কালের কুটিল গতিতে কত সুখ, কত

দুঃখ, কত উত্থান আর পতনের সাক্ষী হয়ে এখনও বেঁচে আছে কর্তার সিং। একটি হাত তাব বরবাদ হয়ে গেছে, তবু সে বেঁচে আছে। সে রাতের ঘটনা এখনও তার মনকে তীব্রভাবে নাড়া দিয়ে যায়। অনর্গল সে বলে চলে, আর মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনেন ডাঃ চৌধুরী। পালেল বিমান ঘাঁটি আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়ে ছত্রভঙ্গ তার প্ল্যাটুন নিকটবর্তী জঙ্গলে আত্মগোপনের চেষ্টা করছে। আকাশ থেকে হিন্দী ভাষায় ইংরাজদের প্রচারপত্র সারা রণক্ষেত্রে ছড়ানো হয়েছে। আই. এন্. এ ছেড়ে যারা বৃটিশবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করবে, তাদেব সামনে তুলে ধরা হয়েছে প্রচুর প্রলোভন। তারই একটি প্রচারপত্র কুড়িয়ে নিল সিপাহী সুন্দর সিং। পড়ল সেটা মনোযোগ দিয়ে। ক্ষুধার্ত ভিখারীর লোভাতুর দৃষ্টি ফুটে উঠে তার সারা চোখে-মুখে। একটা গাছের আড়াল থেকে সবই লক্ষ্য করছে হাবিলদার কর্তার সিং। চোরের মত চারিদিকে একবার দেখে নিয়ে গুটি গুটি পায়ে সুন্দর সিং এগুতে থাকে পালেলের দিকে—যেদিকে বৃটিশ বাহিনী তাদের ছাউনি ফেলেছে। কর্তার সিংও তার পিছু নেয়। বনের সীমানার কাছাকাছি এসে কর্তার সিং-এর খেয়াল হল যে আর এগুতে দিলে সুন্দর সিং তাদেব হাতছাড়া হয়ে যাবে। রাইফেলটা তুলে ধরে গর্জে উঠে কর্তার সিং —"হ্যাণ্ডস্ আপ্"।

সচকিতে ঘুরে দাঁড়ায় সুন্দর সিং। চোখে ফুটে উঠে তার আহত শর্দূলের জিঘাংসাময় দৃষ্টি। হাত তার উপরে উঠল বটে, কিন্তু সে হাত থেকে নিক্ষিপ্ত হল একটা মর্টার। সঙ্গে সঙ্গে কর্তার সিং-এর রাইফেলটাও গর্জে উঠেই মাটিতে পড়ে যায়। ডানহাতে একটা তীব্র বেদনাবোধ করে কর্তার সিং। তাকিয়ে দেখে হাতটা প্রায় বিচ্ছিন্নভাবে ঝুলছে। কোত্থেকে একজন সিপাহী এসে তার মাথার পাগড়িটা খুলে সেই ঝুলে পড়া হাতটা শক্ত করে বেঁধে দেয়। মাটি থেকে বাঁহাতে রাইফেলটা কুড়িয়ে নিয়ে সিপাহীর সাহায্যে

দাঁড়িয়ে উঠে সে দেখে অদূরে সুন্দর সিং-এর দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। সে বুঝতে পারে যে তার রাইফেলটা বেইমানী করেনি। গভীর আদরে রাইফেলের বাটটাকে চুম্বন করেছিল কর্তার সিং।

দশ-বারোদিন একটানা মার্চ করে মেক্‌টিলা পৌঁছুনো গেল। সেখানে তখন আই. এন্‌ এ হেডকোয়ার্টার্স। অগ্রবর্তী ঘাঁটি চাউংন্দিনে হাসপাতাল স্থাপন করার নির্দেশ আসে। নিকটেই পোপা পাহাড়ের তলদেশে আই. এন. এর শক্ত ঘাঁটি।

নতুন পরিবেশে শুরু হয় হাসপাতালের কাজ। সেক্টর কমাণ্ডার মেজর ধীলন সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক আছে কী না দেখে গেলেন কয়েক-বার। ১।১৪নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট-এর লেফ্‌টানেন্ট হিসাবে পূর্বেও পরিচয় ছিল ধীলনের সঙ্গে। আসন্ন যুদ্ধের একটা উৎসাহ উদ্দীপনার ভেতর দিয়ে দিনগুলি ভালই কেটে যাচ্ছে। এমনি সময় খবর আসে ইরাবতীর অপর তীরে বৃটিশদের একটা ছোট্ট সেনাদল দেখা গেছে। নিশ্চয়ই অগ্রবর্তী অনুসন্ধানী দল।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৫। আহত-অনাহত ছত্রভঙ্গ আই. এন্‌. এ সেনানীদের ভিড় জমতে থাকে হাসপাতালে। মেজর ধীলন ব্যস্তভাবে ছুটে বেড়াচ্ছেন তাদের জড়ো করে নতুন করে সেনাদল সাজাবেন বলে। সন্ধ্যার পর তিনি এসে জানান কিউক্‌পাদোং-এ পিছু হটে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। তাই হাসপাতালও পিছনে সরাতে হবে।

মেক্‌টিলার শেষপ্রান্তে আবার হাসপাতাল সাজানো হয়। মেক্‌টিলার ওপরও শুরু হয় প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ।

২২শে ফেব্রুয়ারী পোপা যাবার পথে লেঃ কর্ণেল শাহ নওয়াজ হাসপাতাল পরিদর্শন করে গেলেন। তাঁর কাছে জানা গেল নেতাজী মেক্‌টিলা এসেছেন এবং যে কোন মুহূর্তে হাসপাতালে আসতে পারেন। এ সংবাদে এত দুঃখেও একটা আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সন্ধ্যার দিকে নেতাজী ও শাহ্‌ নওয়াজ দু'জনেই হাসপাতালের গেটে এসে পৌঁছুলেন।

হাসপাতাল পরিদর্শন করে সবাই এসে বসেন ডাঃ চৌধুরীর তাঁবুতে। শিউরাম সবাইকে চা পরিবেশন করে। ফ্রন্ট-এর খবর জানতে চান নেতাজী। শাহ্ নওয়াজ জানায়—সাহ্গল তাঁর রেজিমেন্ট-এর সৈন্যদের যথাসাধ্য সামলে রেখেছেন। ধীলন ও তাঁর দলছুট সেনাদের নিয়ে দল পুনর্গঠনের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের সকল চেষ্টা বার্থ করে দিয়ে অনেকেই এদিক্ ওদিক্ ঘুরে বেড়াচ্ছে, না আছে শৃংখলা, না আছে কোন নৈতিক মনোবল। কেউ কেউ সুযোগ বুঝে আত্মসমর্পণ করছে।

শুনে নেতাজীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে উঠে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েন, দৃঢ়স্বরে বলেন, পোপা পাহাড়ে সাহ্গলের ছাউনিতে যাবেন। শাহ্ নওয়াজ আর সবাকার মুখে নেমে আসে হতাশার সুস্পষ্ট ছায়া। বাইরে এসে দাঁড়ালেন সবাই। পূর্বাকাশে তখন চাঁদ উঠেছে। উত্তর-পশ্চিম দিগন্তে কামানের গোলা আর বোমার আগুনে মাউন্ট পোপার কৃষ্ণমূর্তি ক্ষণিকের তরে ভেসে উঠে আবার দৃষ্টির অন্তরালে মিলিয়ে যাচ্ছে। অপেক্ষমান গাড়িটার দিকে নেতাজী পা বাড়াতেই শাহ্নওয়াজ তাঁর পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বলেন—বিপদের মধ্যে এভাবে এগিয়ে যাবার কোন অধিকার আপনার নেই! ভারতের অমূল্য সম্পদ হিসাবে আপনার এই মূল্যবান জীবন দেশবাসীরা আমাদের হাতে গচ্ছিত রেখেছে। সেক্‌টিলায় ফিরে চলুন, পোপার ভার যখন সাহ্গল নিয়েছে, সেখানে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

—আহ্, শাহ্নওয়াজ—অসহিষ্ণুভাবে গর্জে উঠেন নেতাজী।

—আপনি ভুলে যাবেন না, আপনি সর্বাধিনায়ক হলেও ব্যাট্‌ল্ ফ্রন্টের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। আমি বল্‌ছি সেক্‌টিলায় ফিরে চলুন—দৃঢ়তরকণ্ঠে বলে উঠেন শাহ্নওয়াজ।

এবার নেতাজী হেসে বলেন—কী পাগলামো করছো? আমাকে মারতে পারে তেমন বোমা আজও ইংরাজ তৈরী করতে পারেনি।

উভয়েই নাছোড়বান্দা, কেউ কারো পথ ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত শাহ্‌নওয়াজের অনুরোধ—সমরাঙ্গনের ভাষায় হুকুম—নেতাজীকে মানতেই হয়। সদলবলে তাঁকে চলে যেতে হয় মেক্‌টিলার পথে।

তিনদিন পার না হতেই ঘনিয়ে আসে চরম বিশৃংখলা। শত্রুপক্ষ দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসে মেকৃটিলার দিকে। যূথভ্রষ্ট আই এন্‌. এ সৈনিকেরা যে যেদিকে পারে পালাবার চেষ্টা করে। কিউকোপাদোং বা পোপা পাহাড়ের দিক্‌কার কী অবস্থা জানবার কোন উপায় নেই। হাসপাতাল অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে হবে কী না তাব কোন নির্দেশ আসছে না। হেড কোয়ার্টারের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী বেশ কয়েকবার চলে শত্রুপক্ষের আক্রমণ। এ অবস্থায় নির্দেশের অপেক্ষায় বসে থাকা আত্মহত্যারই সামিল। নিজেই ছুটে যান ডাঃ চৌধুরী মেক্‌টিলার হেড কোয়ার্টারে।

নেতাজী তখন সামরিক অফিসারদের সঙ্গে জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত। জাপানী সংযোগ অফিসাব এসে খবর দিয়েছেন আমেরিকান সাঁজোয়াবাহিনী আর মাত্র ষোল মাইল দূরে। যে কোন মুহূর্তে মেক্‌টিলা ঘিবে ফেলতে পারে।

ঘণ্টাখানেক পর সবাই বেরিয়ে এলেন আলোচনা কক্ষ থেকে। শাহ্‌নওয়াজ গাড়িতে হাত বোমা আর গোলা ভরে নিলেন। বেলা তখন প্রায় নটা। নেতাজী গুলিভর্তি টমিগান নিয়ে গাড়িতে উঠে বসেন। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক রাজুর হাতে দুটো গ্রেনেড। শাহ্‌নওয়াজের হাতে ব্রেনগান। জাপানী অফিসার একটা টমিগান হাতে ফুট বোর্ড-এ দাঁড়ান। আর সবাই সামরিক কায়দায় রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে। একরাশ ধূমোদ্‌গীরণ করে গাড়িটা এগিয়ে যায় রেঙ্গুনের পথে। সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি উঠে—

নেতাজী জিন্দাবাদ্‌—জয় হিন্দ্‌—

সেই অবিস্মরণীয় দিনটি আজও মনে অব্যক্ত বেদনা সৃষ্টি করে। কেউ সেদিন ভাবতে পারে নি নেতাজীর সঙ্গে ইহজীবনে আর দেখা হবে না। বুকভরা দুশ্চিন্তার ভার নিয়ে নতমুখে সবাই যার যার কর্তব্য স্থলের দিকে পা বাড়ায়।

খবর আসে মেকৃটিলার দিকে শত্রুসেনা এগিয়ে আসছে। প্রবল উত্তেজনায় কর্তার সিং বাঁহাতে একটা রাইফেল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অনেক কষ্টে ডাঃ চৌধুরী তাকে সংযত করেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে অদূরে শোনা যায় রাইফেল, মর্টার ও টমি-গানের মিশ্রিত একটা কর্ণবিদারি আওয়াজ। হাসপাতাল সরিয়ে নেবার কোন প্রচেষ্টা এখন অবান্তর। সামনের রাস্তাটায় সশব্দে দাঁড়িয়ে যায় শত্রুপক্ষের একটা মিলিটারী ভেহিকল। সাদা রুমাল হাতে গেটটার দিকে এগিয়ে যান ডাঃ চৌধুরী। বেয়নেট উচিয়ে নেমে আসে জনা দশেক জোয়ান। "হ্যাণ্ডস্ আপ্"—হুকুম ছুঁড়ে মারে। সাদা রুমালটা তুলে ধরেন ডাঃ চৌধুরী। একটা বেয়নেট এগিয়ে আসে পাশে দাঁড়ানো কর্তার সিং-এর বুকটা লক্ষ্য করে। গর্বোদ্ধত কর্তার সিং-এর কাটা ডান হাতটা থর্‌থর্ করে কাঁপতে থাকে। দু'চোখে ঘৃণার জ্বালা নিয়ে রাইফেলধারী জোয়ানটাকে যেন পুড়ে ছাই করে দিতে চায় জ্বলন্ত সেই চোখ দুটো। তেজোদৃপ্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রৌঢ় সৈনিক বৃটিশের গোলাম তরুণ সৈনিকটার মুখে যেন লেপে দিতে চায় কলঙ্কের অসীম কালিমা। পাগলের মত মর্মভেদী একটা চীৎকার ধ্বনি সবাইকে বিমূঢ় করে দেয়।

—প্রেম সিং—মেরা বেটা—

"পিতাজী"—যুগপৎ চীৎকার ধ্বনি ভেসে আসে, তরুণ সৈনিকের মুখ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলটা খসে পড়ে তার হাত থেকে। কর্তার সিং-এর কম্পমান দেহটা লুটিয়ে পড়ে রাইফেলটার গা ঘেঁষে। নতজানু প্রেম সিং গভীর সম্ভ্রমে কোলের ওপর তুলে নেয় ভুলুণ্ঠিত দেহটা।

॥ চৌদ্দ ॥

ইংরেজ কমাণ্ডার এগিয়ে আসেন গেটটার দিকে। কি হয়েছে বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করেন—হোয়াট্‌স্‌ আপ্‌ দেয়ার ?

ভূলুণ্ঠিত দেহ দুটোর দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ডাঃ চৌধুরী। বলেন—ফাদার এ্যণ্ড সন্‌।

প্রেম সিং-এর কলারটা টেনে ধমকের সুরে বলেন কমাণ্ডার—গেট্‌ আপ্‌ ম্যান্‌ ডোণ্ট্‌ বি এ ফুল্‌।

রাইফেলটা নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় প্রেম সিং। চোখে তার উদাস দৃষ্টি। কর্তার সিংও উঠে দাঁড়ায়। প্রিজন্‌ ভ্যানে যুদ্ধ বন্দীদের তুলে নিয়ে পরবর্তী ঘাঁটির দিকে এগিয়ে যায় মিলিটারী কোম্পানীটা।

বিশ্রাম, এবার পূর্ণ বিশ্রাম। চার বছর একটানা ধকলের পর মনে হয় যেন একটা বিরাট শূন্যতার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছেন। বাইয়ের কোন সংবাদ পাবার উপায় নেই। কতদিন বন্দীজীবন কাটাতে হবে কে জানে ?

কিছুদিন যেতে না যেতেই ডাঃ চৌধুরী লক্ষ্য করেন তদারকি সেনাদের মনেও একটা কৌতূহল জেগে উঠছে নেতাজী আর তাঁর আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ সম্বন্ধে। সব কিছু ফিস্‌ ফিস্‌ করে জানতে চায় তারা বন্দীদের কাছে। এই সুবর্ণ সুযোগে দু'পক্ষের সৌহার্দ্য গাঢ়তর করে তুলবার জন্যে তিনি গড়ে তুললেন একটা গান-বাজনার আসর। তারই মাধ্যমে সবাই একদিন ভুলে যায় পরস্পরের ভেদাভেদ। দীর্ঘদিনের মারামারি ছেড়ে সবাই আজ ভাই-ভাই।

কে বলবে কয়েকমাস পূর্বে এরাই চেয়েছিল একের বুকে আর একজন বেয়নেট বসিয়ে দিতে বা রাইফেল-এর গুলিতে মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিতে ?

অকল্পনীয় এই মিলনের ভেতর দিয়ে ডাঃ চৌধুরী দেখতে পান এক নতুন দিগন্তের রঙীন আভাস। রণক্ষেত্রে পরাজয়ের পথেই জন্ম নিচ্ছে যেন মনোজগতে আই এন্. এর জয়যাত্রা। মনে পড়ে নেতাজীর শেষ বাণী—ভারত স্বাধীন হবেই। বৃটিশ-বাহিনীর ভারতীয় অংশে নেতাজীর এই বাণী ক্রমশঃ সংক্রামিত হলে ভারতবর্ষের মুক্তি অনিবার্য, ভাবেন ডাঃ চৌধুরী আর প্রণাম জানান নেতাজীর উদ্দেশ্যে।

ইউরোপের রণাঙ্গনে এখন ফ্রান্স-এর ভেতর দিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে বৃটিশ ও আমেরিকার সম্মিলিত সেনাবাহিনী এবং ততোধিক অপ্রতিরোধ্য গতিতে রাশিয়ান বাহিনী পূর্বদিক থেকে ধাবমান বার্লিন অভিমুখে। ইতালী করেছে আত্মসমর্পণ। প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বীপের পর দ্বীপ জাপানী সেনার হাত থেকে কেড়ে নিচ্ছে আমেরিকা। এরই মধ্যে একদিন চতুর্দশবাহিনীর হেড কোয়ার্টার থেকে প্রচার করা হয়—সুভাষ বসু সিঙাপুর ছেড়ে 'পলায়ন' করেছেন।

'পলায়ন' ? অসম্ভব। সত্যি খবর কোথায় মিলবে—কী ভাবে মিলবে ? অসহিষ্ণুভাবে বাইরে এসে দাঁড়াতেই মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় কর্তার সিং-এর সঙ্গে। হাতে তার একটা কাগজের বাণ্ডিল।

—আরে ডগ্‌দর্ সাব্, দেখিয়ে তো ইস্‌মে ক্যায়া লিখা হুঁয়া ? বলেই ডাঃ চৌধুরীর হাতে তুলে দেয় বাণ্ডিলটা।

এক নজর দেখে নিয়ে উত্তেজিতভাবে বলেন—ইয়ে তো নেতাজীকা বাণী—কাঁহা মিলা ?

ও কথায় কান না দিয়ে কর্তার সিং বলে—পহেলে বোলিয়ে নেতাজীকা ক্যায়া বাণী ?

আবেগ কণ্ঠে পড়েন ডাঃ চৌধুরী—প্রিয়, আমার স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকগণ, আমার ভাইসব, একথা আজ অস্বীকার করে লাভ নেই যে আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে যে আমরণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলাম সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে, সে যুদ্ধে আমাদের আপাততঃ পরাজয় ঘটেছে। শ্যাম ও কাম্বুডিয়া এখনও খোলা অঞ্চল। সেখানে আমাদের জন্যে এখনও প্রচুর কাজ অপেক্ষা করছে। তাই, সমর পরিষদের পরামর্শে সে গুরুদায়িত্ব পালন করার জন্যে সিঙ্গাপুর ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে আমাকে। এই সামরিক পরাজয়ের দুঃখ তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারলে আমি সুখী হতাম। বীরের মত পরাজয় মেনে নাও, পরম সম্মান ও শৃংখলার সঙ্গে ব্যর্থতা বরণ করো। সেদিন আর বেশি দূরে নেই, যেদিন ভারত স্বাধীন হবেই। জয় হিন্দ্।

পড়ে নিয়ে হিন্দীতে তার মর্মার্থ বলেন কর্তার সিং-দের। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি উঠে—জয় হিন্দ্।

মিথ্যাবাদী— পরম মিথ্যাবাদী বৃটিশ আর্মির প্রচার বিভাগ। পশ্চাদপসরণকে 'পলায়ন' অ্যাখ্যা দিয়ে নেতাজীর 'ইমেজ' নষ্ট করার এ এক অপচেষ্টা। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম শিকার 'সত্য', একথা ভাল করেই জানেন ডাঃ চৌধুরী। তা' হোক্, ১৯৪২ সালে বিধ্বস্ত বৃটিশ আর্মি, ১৯৪৪ সালে আবার ঘুরে দাঁড়াবে তাই বা কে ভেবেছিল সেদিন? এমন একদিন আবার আসতেই পারে, যেদিন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের আজকের এই পরাজয়ের গ্লানির ভস্ম থেকেই তুষের আগুনের মত জ্বলে উঠবে আমাদের আকাঙ্খিত জয়ের অগ্নিশিখা।

বর্মা রণাঙ্গনে গোলা বর্ষণ শেষ—এবার প্রশ্ন বর্ষণ শুরু হয় পুরোদমে। দিনের পর দিন বৃটিশ ইন্‌টেলিজেন্স-এর কর্মীরা চাপ সৃষ্টি করে জানতে চায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সম্ভাব্য সব গোপন তথ্যের কথা। দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন ডাঃ চৌধুরী তাদের

প্রশ্নের জবাবে কিছু বলতে বা লিখতে। ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় ওরা। চরম শাস্তির দিনটির জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। ওরা ভয় দেখিয়ে গেছে, তার কোর্ট মার্শাল হবে। ভয়? ওরা জানে না, নেতাজী যাদের নেতা, তাদের মনে 'ভয়' নামক কোন বস্তুর স্থান নেই।

বাইরে অঝোরে বর্ষা নেমেছে। এ যেন বন্দিনী মায়ের বিরামহীন ক্রন্দন রোল। এ যেন সওয়া যায় না। নির্জন সেল্‌টায় ডাঃ চৌধুরীর চোখেও নেমে আসে অশ্রুজল। ভাবেন কবে নেতাজীর দৈববাণী সফল হবে—মনে রেখো, সেদিন আর বেশি দূরে নেই, ভারত যেদিন স্বাধীন হবেই।

কিছুদিন পর রেঙ্গুন বন্দর থেকে যুদ্ধ বন্দীদের নিয়ে একটি জাহাজ সাগরের বুকে পাড়ি জমায়। বুঝতে পারেন জাহাজ চলেছে ভারতের পথে।

সাগরের দোলার সাথে সাথে মনেও লাগে দোলা। চার বছর আগে এমনি করে আরও একবার দোলা লেগেছিল। কিন্তু সেবার আর এবারে কত না প্রভেদ! সেদিন ভেবেছিলেন যুদ্ধে আহত মানুষকে সেবা দিয়ে শান্তি ও সান্ত্বনা দেবেন। আজ শুধু মনে হয়, সবই আলেয়া, সবই মরুভূমির মরীচিকা! ঐযে দূরে নীল আকাশের বুকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে নীল রেখাটি, তারই মত কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে জীবনের যত আশা, যত আকাঙ্খা—যা কিছু স্বপ্ন। চোখের সামনে বোমার স্পিলন্টারে, রাইফেলের গুলিতে, হ্যাণ্ডগ্রেনেড-এর বিস্ফোরণে কত জোয়ান মরে গেল, কত জোয়ানই না সারা জীবনের মত অক্ষম হয়ে গেল। কতটুকু শান্তি বা সান্ত্বনা তাদের তিনি দিতে পেরেছেন?

'চলো দিল্লী, দিল্লী চলো—ধ্বনি তুলে প্রাণ দিল কত বীর, দিল্লী তবু রয়ে গেল 'দূর অস্ত্'।

হঠাৎ একটা বিরাট ঢেউ এসে তার' চিন্তাজাল ছিঁড়ে ফেলে।

এসব কী ভাবছি আমি? নেতাজী তো বলেছেন—দিল্লী আর দূরে নেই, অচিরেই পৌঁছে যাব আমরা। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কেবিনের দিকে চলে যান ডাঃ চৌধুরী।

পথের শেষ কোথায়? কতদিনেই বা আবাব দিগন্তব্যাপী জলবাশি অতিক্রম করে ডাঙ্গাব সন্ধান মিলবে?

অবশেষে সব ভাবনাব অবসান ঘটিযে একদিন কলকাতার প্রিন্সেপ্ ঘাটে এসে জাহাজটা সত্যি সত্যিই ভিড়ে যায়। কড়া পাহাবায তীরে অপেক্ষামান বন্দী গাড়িতে সবাইকে তোলাও শেষ হয়। স্বদেশে ফিরেছেন ঠিকই, কিন্তু স্বাধীন গতিব পথ একেবারেই অবরুদ্ধ—দিনেব আলো এড়িয়ে সবই চলছে বাতের অন্ধকারে। বন্দীগাড়িব ছোট্ট বায়ুপথ দিযে মাঝে মাঝে শুধু দেখা যায় দু' একটি রাস্তার আলো পেছন দিকে ছুটে পালাচ্ছে। শ' কযেক নিরস্ত্র বন্দীকে নিয়ে প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ সবকাবেব এত দুর্ভাবনা দেখে ওরাও যেন লজ্জায় মুখ লুকোতে চায।

বাত তখন বোধহয দুটো হবে। গাড়িটা এক সময় দাঁড়িযে যায়। হুকুম হয গাড়ি থেকে নেমে আসবাব। নেমেই দেখেন যে এমন অনেক কটা গাড়িই লাইন বেঁধে দাঁড়িযে আছে। যদিও কোথাও তেমন আলোব জৌলুস নেই, তবুও এক নজবেই ডাঃ চৌধুবী বুঝতে পাবেন—কোথায় তাঁদে‹ নামানো হয়েছে, হাওড়া স্টেশনের ৮নং প্ল্যাটফর্মে। গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে ৮নং ও ৯নং প্ল্যাটফর্মেব মাঝখানের বাঁধানো বাস্তাটায়। কযেকটি তৃতীয় শ্রেণীব বগি নিয়ে একটি বেক্ তৈবিই ছিল। নির্দেশমত তাবই একটা কামরায় উঠে বসেন। জানলাব ধারেব বেঞ্চগুলো দখল করে নেয় বাইফেলধাবী সেন্ট্রিগার্ডের দল। বাত তিনটে নাগাদ ট্রেনটা চলতে শুরু করে নন্-স্টপ্।

চেনা পথ, কতবার যাতায়াত করেছেন এই পথে; মোগলসরাই,

মির্জাপুর, এলাহাবাদ, কাণপুর, একে একে সব ডিঙিয়ে পরদিন শেষ রাত্রে ট্রেনটা দিল্লীর যমুনা ব্রীজটা পেরিয়েই দাঁড়িয়ে যায়।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি অনুভব করেন ডাঃ চৌধুরী। কে যেন ধাক্কা মেরে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। আবার একঘেয়ে একটা সুর ভেসে আসে—রাউরকেল্লা।

হাওড়াগামী বম্বে মেলটা তা'হলে রাউরকেল্লায় এসে দাঁড়িয়েছে লালকেল্লায় নয়? তবু মনে হয় এ যেন এই সেদিনের কথা, যেদিন যমুনা-ব্রীজ স্টেশন থেকে সেন্টি গার্ডের পাহারাধীনে তাঁদের দলটিকে নিয়ে যাওয়া হয় লালকেল্লায়, আর তখন শেষ রাতের ঘন অন্ধকার ভেদ করে ধীরে ধীরে পূর্বাকাশে জেগে উঠছিল উষার আলোর প্রথম আভাস।

॥ পনেরো ॥

লালকেল্লা।

বিরাট প্রাকারবেষ্টিত যে দুর্গ একদা ছিল মোগল বাদশাহদের রাজপ্রাসাদ, মালুকে-আলম্‌দের তখ্‌তেতাউস্-যার হারেমের ও বেগম-মহলের প্রতিটি অলিন্দ আর কক্ষ জুড়ে জড়িয়ে আছে লাস্যময়ীদের অবর্ণনীয় যত প্রেম-প্রতিহিংসাব রোমহর্ষক বিচিত্র কাহিনী—যার আম্‌দরবারের বিরাট চত্বরে আর প্রতিটি অলিন্দে ছড়িয়ে আছে কত শত নকীব্‌দের বিভ্রান্তকারী অক্লান্ত 'পুকার্'-এর প্রতিধ্বনির সাথে কত সহস্র অসহায় মেহনতী মানুষের সকরুণ আবেদনের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস—

—এই সেই বিস্তৃত লালকেল্লা।

—সিপাহী-বিদ্রোহের বহু নাটকীয় ঘটনাব রঙ্গভূমি—লালকেল্লা, যার মাথায় তেরঙা জাতীয় পতাকা উড়াবার সংকল্প নিয়েছিলেন নেতাজী। সেই সংকল্পের ছোঁয়াচ লেগেছিল আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের প্রতিটি সৈনিকের মনে। ধ্বনি তুলেছিল তারা—'চলো দিল্লী—দিল্লী চলো'।

সেই দিল্লীতেই এসেছে তারা কাতারে কাতারে—হাজারে হাজারে। আশ্রয়ও মিলেছে সেই লালকেল্লা'রই প্রাসাদাভ্যন্তরে। কিন্তু যেভাবে আসার স্বপ্ন তাবা দেখেছিল, সেই আসায় আর এ'ভাবে আসায় আস্‌মান-জমিন্ ফারাক্। আকাঙ্ক্ষিত বিজয়ের স্থান নিয়েছে অবাঞ্ছিত পরাজয়ের গ্লানি। লালকেল্লাব মাথায় উড়ছে তেরঙা পতাকা নয়—য়ুনিয়ন্ জ্যাক্।

অভিশপ্ত এই কেল্লারই লোহার গরাদের পিছনে তারই একটি হিম্-শীতল কক্ষে দিনের পর দিন কাটে ডাঃ চৌধুরীর। মালয়, সিঙ্গাপুর আর বর্মা রণাঙ্গনের একমাত্র সাথী সেই শিউরামও আর পাশে নেই। সেও হয়ত এমনি আর একটি কক্ষে দিন গুণছে। দেয়ালে কান পেতে ওধারের কথা শুন্‌তে চান—কোন আওয়াজ মেলে না; শুধু বারান্দায় প্রহরারত সেন্ট্রির পদচারণার একটানা আওয়াজ ছাড়া। খট্—খট্, খট্—খট্ আওয়াজটা এক একবার কাছে এগিয়ে আসে, আবার সরে সরে দূরে চলে যায়।

কোর্ট-মার্শাল বিচারের সম্মুখীন হতে হবে একথা আর অজানা নেই। যত তাড়াতাড়ি বিচার প্রহসনটা শেষ হয়ে যায়, ততই ভালো। ফল তো জানাই আছে; তার জন্যে ভাবনা নেই কিছু। কত প্রহসনই তো অভিনীত হয়ে গেছে দূর অতীতে এই লালকেল্লারই বিচারালয়ে। তার সঙ্গে বিংশ-শতাব্দীতে আরও একটি প্রহসন যোগ হবে মাত্র। হোক্—তবু অনিশ্চয়তার সমাপ্তি ঘটুক।

হতাশাময় সেই দিনগুলিকে ছাপিয়ে মনে পড়ে গভীর তমসাচ্ছন্ন একটি রাতের কথা। ২১শে আগস্ট, ১৯৪৫-এর সে রাতটিকে ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না। অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও ঘোষণা করছে—ফর্মোজার তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে। বিদ্যুৎপ্রবাহের মত এ দুঃসংবাদটা ছড়িয়ে পড়ে লাল-কেল্লার বন্দী-শিবিরেও। চারিদিকে নেমে আসে গভীর অবসাদ। বন্দী-শিবিরের প্রাণবায়ু যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ডাঃ চৌধুরী। ভাবেন—একি সত্যি!—না বন্দীদের চরম যন্ত্রণা দেবার জন্য শত্রুপক্ষের এ এক নতুন কৌশল?

হঠাৎ লাফিয়ে উঠেন ডাঃ চৌধুরী। বন্দীশালার দরজার লোহার গরাদগুলো ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি মারেন। চীৎকার করে বলে উঠেন—না, এ সত্যি নয়; এ হতে পারে না। নেতাজী মরেন নি, মরতে পারেন না, এ এক ঘোর চক্রান্ত।—নেতাজী জিন্দাবাদ্—

জয় হিন্দ্।—তড়িৎ চালিতের মত সঙ্গে সঙ্গে সারা বন্দীশিবিরটা প্রকম্পিত করে হাজার কণ্ঠে ধ্বনি উঠে—নেতাজী জিন্দাবাদ্—জয় হিন্দ্—।

বারান্দার ওদিকটা থেকে সেন্ট্রিটা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। তাকে দেখেই আকুল আগ্রহে বলে উঠেন—বলো ভাইয়া! ইয়ে খবর ঝুটা হ্যায়!

—হম্ কৈসে বোল্ সক্তা। জবাব দেয় সেন্ট্রি।

তার জবাবে মনে হয়, সেও যেন কিছুটা বিচলিত। হাজার হোক, ভারতীয় তো। পেটের দায়ে না-হয় বৃটিশের তাঁবেদারি করছে। একদিন ডাঃ চৌধুরী নিজেও তো তাই করতেন।

নেতাজী নেই, একথা ভাবা যায় না। তবু সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকে তাঁর মন। এমনি করে এগিয়ে চলে কালের চাকা। খবর আসে—শাহ্‌নওয়াজ, ধীলন, আর সাইগলের বিচার শুরু হয়ে গেছে লালকেল্লার ভেতরেই কোন এক বিশেষ শেলে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি—প্রায় এক শতাব্দী আগে যেখানে বিচার হয়েছিল দিল্লীর শেষ বাদশাহ্ বাহাদুর শা'র, সেখানেই হয়ত বিচার চলছে নেতাজীর সেই তিন প্রিয় সহকর্মীর। আরও খবর মেলে এই তিন প্রধানের বিচারে যে রায় হবে, তারই উপর নির্ভর করছে অন্যান্য বন্দীদের ভবিষ্যৎ। ফিস্ ফিস্ করে সেন্ট্রিরাই দিয়ে যায় সব খবর।

গোপন থাকে না কিছুই। বাইরে থেকে বাতাসের সঙ্গে আওয়াজ ভেসে আসে—জয় হিন্দ্, বিচার প্রহসন চলবে না—মুক্তি চাই, মুক্তি দাও।

সেন্ট্রির দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন ডাঃ চৌধুরী। জবাবে শুধু অর্থপূর্ণ দৃষ্টি মেলে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে এগিয়ে আসে সেন্ট্রি। বন্দী ভিতরে আছে কিনা তাই উঁকি মেরে দেখবার ভাণ করে। মিনিট দুই, তারপরই চলে যায় আর একটা কক্ষের দিকে।

এদিকে ডাঃ চৌধুরী হঠাৎ আশ্চর্য একটা কাণ্ড করে বসেন। সেলের দরজা থেকে সরে গিয়ে পাগলের মতো ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করে দিলেন—একটা থামকে জড়িয়ে ধরে বার কয়েক গভীর আবেগে চুমু খান, যেন অনেকদিন পর প্রণয়িনীকে হঠাৎ খুঁজে পেয়েছেন। ধীরে ধীরে ক্লান্ত দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে মেঝেতে বসে পড়েন।

ফিস্ ফিস্ করে যে খবরটা দিয়ে গেল ঐ পাহারারত সেন্ট্রিটা—সেকি সত্যি, না ধাপ্পা? "বন্দী মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছে—সারা ভারতবর্ষময় তোলপাড়। যে কংগ্রেস একদিন নেতাজীকে বাধ্য করেছিল দেশ ছেড়ে বিদেশে ছুটে যেতে, সেই কংগ্রেসই আজ সুযোগ বুঝে ডাক দিয়েছে জনতাকে—"আই. এন্. এ বন্দীদের মুক্তি চাই, নইলে দেশময় অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবে। ভাইসব! তোমরা এগিয়ে এসো—এই মুক্তি-আন্দোলনকে সফল করে তোল। —বন্দেমাতরম্।"

এমনিকরেই কালের চাকা ঘুরে। অবিশ্বাস্যকেও বিশ্বাস্য করে তোলে। নইলে যারা এতদিন দল বেঁধে নেতাজীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই ভোলাভাই দেশাই, জওহরলাল নেহরুরা গিয়ে দাঁড়ালেন আজ কোর্ট-মার্শালে তাঁরই অনুগত সহকর্মী শাহ্‌নওয়াজ, ধীলন ও সাইগলের পক্ষ সমর্থনে। বললেন তাঁরা জোরালো গলায়—"অভিযুক্ত আসামীরা রাজদ্রোহ অপরাধে অপরাধী হতে পারেন না। তাঁরা যুদ্ধ করেছিলেন শুধুমাত্র স্বাধীন আজাদ হিন্দ্ সরকারের পক্ষ হয়ে—যে সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছিল অক্ষ-শক্তি জোটের সকল সরকারেরা এবং যে সরকার আন্তর্জাতিক আইন মাফিকই বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে লড়েছে; আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ ওপেন্‌হাইম্, পিট্ কবেট্, আব্রাহাম লিংকন এমন কি বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যান্টনি ইডেন্ এবং প্রধানমন্ত্রী উইন্‌স্টন্ চার্চিলের লেখা ও ঘোষণা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখালো

হল—রাজদ্রোহের অভিযোগে এ মামলা চলতে পারে না; এ সম্পূর্ণ আইন বিরোধী এবং অবৈধ।"

চলতে না পারলেও এ মামলা চলল এবং কোর্ট-মার্শালের বিচারে এই তিন প্রধানের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশও হল। এতদিন যা ছিল কালবৈশাখীর গুরু গুরু আওয়াজের মতই সম্ভাবনা-পূর্ণ ভবিষ্যৎ, সেই আন্দোলন এবার সত্যি সত্যিই প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে এক অপ্রতিরোধ্য গতিতে। দুর্বল সেই কোর্ট-মার্শালের আদেশ সেই দুর্দমনীয় ঝড়ের মুখে এক টুক্‌রো খড়ের মতোই নিমেষে উড়ে যায় দৃষ্টির অন্তরালে। প্রধান সেনাপতি স্যার ক্লড্‌ অচিন্‌লেক্‌ বাধ্য হলেন দ্বীপান্তরের আদেশ তুলে নিতে।

—খবরটা পৌঁছে দেয় হাসি হাসি মুখে সেই সেন্ট্রি। আরও বলে যায় যে দু'দিন পব গান্ধীজি নিজে আসছেন লালকেল্লায় বন্দীদের সঙ্গে আলাপ করতে।

গান্ধীজি আসছেন—নেতাজী নেই। ভাবতেও বুকটা কেমন যেন টনটন্‌ করে উঠে। অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস নেমে আসে, আর মনে ভেসে আসে—

"এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
করে গেলে দান।"

দেশবন্ধুর মৃত্যুকে লক্ষ্য করে কবিগুরুর অনবদ্য এই কথা ক'টি যেন মনের ভেতর গুন্‌গুনিয়ে উঠে। ভারতমাতার দামাল ছেলে সুভাষ, সে মরেনি—মরতে পারে না।

গান্ধীজি এলেন। লালকেল্লার প্রশস্ত চাতালে জড়ো হল বন্দীরা —কাতারে কাতারে, হাজারে হাজারে। প্রার্থনা শেষে বললেন মহাত্মা—"সুভাষ ছিল ভারতমাতার চঞ্চল ছেলে। আমি তাঁকে

স্নেহ করেছি, ভালওবেসেছি। স্বাধীনতার জন্তে তাঁর একাগ্র সাধনাকে, তাঁর অদম্য সাহসকে শ্রদ্ধা করেছি। সেই সাধনা, সেই উদ্দামতাই তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল আমার স্নেহ থেকে। বেছে নিলো সে নিজের পথ—যা আমার পথ নয়। সিঙ্গাপুরে, মালয়ে, বর্মায়—তোমরা যারা তাঁর সাথী ছিলে, আমি সুভাষের হয়ে তোমাদের মঙ্গল কামনা করি। অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট সহ্য করেছ তোমরা। যে পথ তোমরা বেছে নিয়েছিলে তার সঙ্গে এক মত না হলেও আমি বলব—আমারই মত তোমরাও দেশমাতৃকার নিরলস সেবক। তাই বড়লাট লর্ড ওয়াভেল্‌কে আমি অনুরোধ জানিয়েছি—তোমাদের মুক্তি দিতে। আশা করি অচিরেই তোমরা মুক্তি পাবে। মুক্তির পর তোমরা দেশে ফিরে গিয়ে প্রেম দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে শত্রুকে জয় করবে—এ'আশাই আমি করব। মনে রেখো—হিংসার পথ সত্যিকারের মুক্তির পথ নয়।—জয় হিন্দ—।"

"জ-য়-হি-ন্-দ্"—হাজার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে।

কে একজন উচ্চকণ্ঠে গেয়ে উঠে—"কদম্ কদম্ বাড়্হায়ে যা, খুশিকা গীত গায়ে যা—।" সঙ্গে সঙ্গে আর সবাই যোগ দেয় সেই উদ্দামসঙ্গীতে। হাসিমুখে উপস্থিত জনতাকে নমস্কার জানিয়ে কদম্ কদম্ গেটের দিকে এগিয়ে যান মহাত্মাজী।

ভিড় ঠেলে পাশে এসে দাঁড়ায় শিউরাম আর কর্তার সিং। হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের সন্ধান মেলে অনেকদিন পর। আনন্দে উভয়কে জড়িয়ে ধরেন ডাঃ চৌধুরী। বন্দীরা তখন দলে দলে ভাগ হয়ে উল্লাসে মেতে উঠেছে। গান্ধীজির আগমন উপলক্ষ্যে বন্দীশিবিরের আইন কানুন আজকের মত রাত দশটা পর্যন্ত শিথিল করা হয়েছে। লালকেল্লার প্রশস্ত ময়দান হাজার জনতার হৈ-হুল্লোড় আর বিচিত্র ধরনের নাচে-গানে প্রাণবন্ত হয়ে গম্ গম্ করতে থাকে। উন্মত্ত শিবের জটামুক্ত গঙ্গার অশান্ত জলপ্রবাহের মতই উদ্দাম জনস্রোত সামনের সব বাধা ভাসিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলে সগর

রাজার সহস্র সন্তানের মুক্তি উৎসবের শংখধ্বনি অনুসরণ করে। উৎসবের আবেগে ভেসে যায় সেন্ট্রিতে আর বন্দীতে ভেদা-ভেদ। সবাই মিলে একই সঙ্গে গা ভাসিয়ে দেয় এই বাঁধভাঙ্গা আনন্দের সেই অদমনীয় পবিত্রস্রোতে। মাঝে মাঝে ধ্বনি তোলে—"জ-য় হি-ন্-দ্, নে-তা-জী জি-ন্-দা-বা-দ্—।

বাঁধনহারা এই জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে ডাঃ চৌধুরীর মনে পড়ে যায় বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ"-এর বিদ্রোহী সন্তানদের উদাত্ত কণ্ঠের সঙ্গীত—

—"এই যৌবন তরঙ্গ রুধিবে কে—
হরে মুরারে-হরে মুরারে—"

তিনি শুধু ভাবেন—সত্যিই কি আই এন. এ আজ পরাজিত?—না, দৃশ্যতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়ের ভিতর দিয়েই এগিয়ে দিয়েছে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসানের দিন? এই পরিণতির কথা ভেবেই কি জীবনের শেষমুহূর্তেও দ্বিধাহীনচিত্তে বলে গেছেন নেতাজী—"অদূর ভবিষ্যতে ভারত স্বাধীন হবেই।"

কর্তার সিং ডাকে—কি ভাব্‌তেছেন, ডাগ্‌দর্‌ সাব্‌?

সচকিত হয়ে ডাঃ চৌধুরী বলেন—চলো, ওদিকে গিয়ে একটু গল্প করা যাক। তুমিও চল শিউরাম।

—হাঁ জী চলিয়ে। আপ্‌সে হমারাভী কুছ্‌ বাতেঁ করনা হ্যায়্‌—বলেই কর্তার সিং ডাঃ চৌধুরীকে অনুসরণ করে। শিউরামও এগিয়ে যায়।

তিনজনে কেল্লার একপ্রান্তে একটু নির্জন স্থান বেছে নিয়ে ঘাসের উপর বসে পড়েন।

প্রথমেই কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করে শিউরাম—সব্‌সে পহেলেয়ে তো বতাইয়ে, আপ্‌কা তবিয়ৎ ক্যায়সে হ্যাঁয়, সাব্‌?

—ভাল আছে। তোমরা কেমন আছ বল।

—আচ্ছে হ্যাঁয়। কিন্তু গান্ধীজি যো বোল্‌লেন কি বড়লাটকো

বোলিয়াছেন হামাদের ছোড়িয়ে দিতে, ক্যা সাচ্‌মোচ্‌ আপ্‌কো· বিশোয়াস্‌ হোয় কি হামাদের ছোড়িয়ে দেবে?

—জরুর্‌ দেগা—দেনেহী হোগা—হাঁটুর উপর বাঁ হাতে তাল ঠুকে জবাব দেয় কর্তার।

—কি করে এত জোর দিয়ে একথা বল্‌ছ তুমি, কর্তার সিং—জিজ্ঞাসা করেন ডাঃ চৌধুরী।

—ওহি বাৎ হী তো বোল্‌নে চাহ্‌তা হুঁ, শুনিয়ে—

এক নিশ্বাসে কর্তার সিং ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় যা বলে গেল, তা শুনে আর কোন সন্দেহই থাকে না যে শুধু যে তাদের মুক্তিই আসন্ন তা নয়, অদূর ভবিষ্যতে নেতাজীর স্বপ্ন সফল করে ভারতের স্বাধীনতা লাভও অনিবার্য।

কর্তার সিং-এর ছেলে প্রেম সিং যুদ্ধ শেষে ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। কিছুদিন আগে লালকেল্লায় এসে বাপের সঙ্গে দেখাও করে গেছে সে। কর্তার সিং-এর সেলের সেন্ট্রিটা প্রেম সিং-এর প্লাটুনেরই সিপাহী ছিল। সুতরাং বাপকে লেখা একটা চিঠি দিয়ে যেতে কোন অসুবিধাই হয়নি তার। তাতে সে লিখেছে—সারা দেশে গণদাবী খুব জোরদার হয়ে উঠেছে আই এন. এ বন্দীদের মুক্তি দেবার জন্যে। জনসাধারণের এই দাবীর সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক বিরাট অংশও সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছে। এই ব্যাপার নিয়ে কিছুদিন আগে বম্বে ও করাচীতে নৌ-বহরে সাংঘাতিক বিদ্রোহ হয়ে গেছে। এমন কি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ্যাট্‌লিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—ভারতবর্ষে জাতীয় ভাবধারা এমনভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একাংশের মধ্যেও এর সংক্রমণ সন্দেহাতীত নয়।

রাত প্রায় দশটা। ওদিক্‌কার হৈ-হুল্লোড়ের ধ্বনি স্তিমিত হয়ে এসেছে। লালকেল্লার শীর্ষদেশে পূর্ণিমার চাঁদ খিল্‌খিল্‌ করে হাসছে। ডাঃ চৌধুরী উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের বলেন—"এবার

সেলে ফিরে যাও। অচিরেই আমরা মুক্তি পাব, কোন সন্দেহ নাই।" পরস্পরকে আবার গভীর আলিঙ্গন করে সেলের দিকে পা বাড়ান ডাঃ চৌধুরী।

সে' রাতের মত এমন ঘুম অনেকদিন ঘুমোননি—।

মাসখানেকও অপেক্ষা করতে হয়নি—রিলিজ্-অর্ডার এসে যায়। লালকেল্লার দুর্ভেদ্য প্রাচীর প্রকম্পিত করে আবার গর্জে উঠে জয়ধ্বনি—"জ-য় হি-ন্-দ, নে-তা-জী জি-ন্-দা-বা-দ্।"

সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে বেদনাশুক বিদায়ের পালা। অনেক দিনের—অনেক দুঃখের সাথীরা বিদায় নিলেন একে অপরের কাছে অশ্রুসিক্ত নয়নে, কর্তার সিং চলে যায়, সাথে থাকে শিউরাম। দিল্লী-হাওড়া এক্সপ্রেসের একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় দু'জনে পাশা-পাশি ঠাঁই করে নিলেন। শিউরাম নেমে যাবে মোগলসরাইতে, ডাঃ চৌধুরী যাবেন কলকাতা।

নিদাঘ তপ্ত প্রান্তর প্রকম্পিত করে স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে দুপুর বেলার দিকে ট্রেন এসে দাঁড়ায় মোগলসরাই। শিউরামকে এবার নামতে হবে। তার সঙ্গে ডাঃ চৌধুরীও এসে প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়ান। বলেন—শিউরাম, তোমার ঠিকানাটা দাও। প্রয়োজনমত চিঠি লিখব। তারপর নোটবইয়ে সযত্নে শিউরামের ঠিকানাটা টুকে নেন।

গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা বেজে উঠে। শিউরামকে আলিঙ্গন করে নিজের কামরায় ফিরে যান ডাঃ চৌধুরী। যতক্ষণ দেখা যায় তিনি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকিয়ে থাকেন প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা শিউরামের অপস্রিয়মান মূর্তিটার দিকে। অলক্ষ্যে ডাঃ চৌধুরীর চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে।

। ষোল ।

প্ল্যাটফর্মটা পার হয়ে গাড়িটা গতিবেগ বাড়াতেই চোখে-মুখে একটা উত্তপ্ত হাওয়ার ঝাপ্‌টা লাগে। বাইরে বইছে প্রচণ্ড 'লু'-প্রবাহ। তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দেন ডাঃ চৌধুরী। বন্ধ জানালাটার গায়ে মাথাটা ঠেস দিয়ে বসেন। অবসাদে চোখ বুজে আসে।

হঠাৎ অনুভব করেন—কে একজন যেন পাশে এসে বসেছে। যে সিট্‌টায় খানিকক্ষণ আগেও বসেছিল শিউরাম। চোখ মেলে অলস দৃষ্টিতে তাকান। দেখেন, লোকটার একগাল দাড়ি। কেমন যেন উস্‌খুস্‌ করছে, আর তাঁরই দিকে তাকাচ্ছে। পকেটমার নয় তো?—এই তো, সামনেই কামরাটার দেয়ালে লেখা রয়েছে একটা সাবধান বাণী—"আপ্‌না সমান্‌ পর্‌ নজর্‌ রাখিয়ে। চোর, জুয়াচোর্‌, ঔর্‌ পকেট্‌মার্‌ নজ্‌দীগ্‌ হ্যায়্‌।" তার ওপর বিহারের এ অঞ্চলটা সম্পর্কে বাইরে খুব সুনাম নেই।

লোকটা কিন্তু একদৃষ্টিতে তাঁরই দিকে তাকিয়ে থাকে। কৌতূহল আর চাপতে না পেরে একটু বিরক্তির সুরেই প্রশ্ন করেন—আমায় কিছু বলবেন?

হতচকিত করে দিয়ে লোকটা সোজাসুজি একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারে—গৌতম না?

অবাক হয়ে এবার ভাল করে তাকান ডাঃ চৌধুরী। তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরেন লোকটাকে। প্রায় চীৎকার করে বলে উঠেন—কমল—তুই কমল? যা' একগাল

দাড়ি রেখেছিস্, চিনবো কি করে, বল ? কামিয়ে ফেলিস না কেন ঐ জঙ্গলটা ?

—সময় পাইনে।

সময় পাস্ না ?—বলেই হো-হো করে হেসে ওঠেন ডাঃ চৌধুরী। ওঃ! যা গরম পড়েছে, তার ওপর আবার দাড়ি! আয়না দিয়ে নিজের মুখটা একবার দেখেছিস্, কী হাল করেছিস্ সেদিনকার তোর এমন সুন্দর চেহারাটার ? ঘামে-বালিতে লেপটে গিয়ে যেন প্যাচ্ প্যাচ্ করছে।

—দোহাই তোর। দেহ সৌন্দর্য নিয়ে চর্চা করবার সময় ঢের পাওয়া যাবে। এ্যাদ্দিন পর দেখা হলো। কোথায় বলবি, কোথা থেকে আসছিস্, কোথায়ই বা যাচ্ছিস্ ; তা নয়, যতসব দাড়ি আর ঘামের কথা দিয়ে শুরু হল তোর যত মাথা ঘামানো।

—আচ্ছা, তাই বলি শোন্। ছিলাম আই. এন্. এ বন্দী হয়ে লালকেল্লায়, মুক্ত হয়ে এখন চলেছি কল্‌কাতায়।

—পোষাকটা দেখে তাই কিছু একটা আঁচ করছিলাম।

একনজরে নিজের পোষাকটার দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বলেন—হ্যাঁ, এটা আজ আমার বড়ই গর্বের ধন। নেতাজী নিজ হাতে এই গৌরবের টিকাটা পরিয়ে দিয়েছিলেন, বলেই বুকের ব্যাজটায় হাত বুলাতে থাকেন। যাক্, এবার তুই বল্, কোত্থেকে আসছিস্ ? যাবি তো কলকাতায়, তা তো বুঝতেই পারছি। "অল্ রোডস্ লিভ্ টু রোম্", তাই না ?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। যাচ্ছি কলকাতায়, আসছি বেনারস থেকে।

—বেনারস কেন ? তীর্থভ্রমণ না কী ?

—পার্টি কন্‌ফারেন্স্।

—পার্টি—মানে ?

—কমিউনিস্ট পার্টি।

অকস্মাৎ কমলের কাঁধ থেকে ডাঃ চৌধুরীর হাতটা খসে পড়ে। বৃশ্চিক দংশনের মত একটা জ্বালা বোধ করেন। মুখটা তাঁর গম্ভীর হয়ে যায়।

অবাক হয়ে কমল বলে—কী হল, গৌতম ?

নিজেকে সামলে নিয়ে জবাব দেন ডাঃ চৌধুরী—আমি তোর অস্পৃশ্য।

—কি সব বলছিস্ তুই ?

—ঠিকই বলছি। আমি আই এন্. এর লোক। তোদের ভাষায়—"কুইসলিং"; অর্থাৎ দেশদ্রোহী।

—কিন্তু যখন এসব কথা উঠেছিল, সেসব দিন তো অনেক পেছনে ফেলে এসেছি আমরা সবাই। কত যুগ পর আমাদের আবার দেখা হ'ল, এখন আর সেসব তর্ক কেন রে ?—বলেই গভীর আলিঙ্গনে ডাঃ চৌধুরীকে জড়িয়ে ধরে কমল। নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা দিয়েই এই যাত্রাটাকে বরং সুখপ্রদ করে তোলা যাক্, কী বলিস্ ?

এক মুহূর্তেই যেন পরিবেশটা হাল্কা হয়ে যায়। ডাঃ চৌধুরীব সংবেদনশীল মন সাড়া দিতে বাধ্য হয় কমলের ঐকান্তিক আহ্বানে। তিনি বলেন—সুখের ভাণ্ডাব আমার আজ শূন্য, কমল। বলতে গেলে শুধু দুঃখের কাঁদুনিই গাইতে হয়।

—তাই বা মন্দ কী ? তবু তো বুকটা একটু হাল্কা হবে ?

একটু চুপ করে থেকে জবাব দেন ডাঃ চৌধুরী—ঠিকই বলেছিস্, অদৃষ্টকে ধন্যবাদ জানাই জীবনের এই সন্ধিক্ষণে সেই লোককেই আমার সামনে এনে হাজির করেছেন তিনি—একমাত্র যার সামনে খুলে ধরতে পারি আমার দুঃস্থ এই মনের দুয়ার।

—খুব হয়েছে। ওসব আবেগ-টাবেগ দূরে ঠেলে কী বল্‌বি তাই বল্।

—সব থেকে আমার খারাপ লেগেছে কোন্ সময়টা জানিস্ ?

১৯৩০ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত ঘটনাবহুল পর্বটা। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে গান্ধীজির চমকপ্রদ লবণ আইন অমান্যে আমাকে সবরমতী-ডাণ্ডি সুদীর্ঘ পথ পদক্রমা, এপ্রিলে মাস্টারদার নেতৃত্বে তোদের চট্টগ্রাম লুণ্ঠন। চারমাস যেতে না যেতেই ঢাকায় পুলিশের আই. জি. লোম্যান আর জেলা পুলিশ সুপারের ওপর গুলিবর্ষণ, আবার তারই চারমাসের মাথায় খোদ মহাকরণে জেল দপ্তরের আই. জি. সিম্পসন্ হত্যাকাণ্ড। তারপর কুমিল্লায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ স্টিভেন্স্ হত্যা, মেদিনীপুরে পর পর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ পেডি, ডগলাস্ আর বার্জকে হত্যা। ১৯৩২-এ গভর্ণর জ্যাক্সন্ আব এণ্ডারসন্‌কে হত্যার প্রচেষ্টা। সর্বশেষ ধলভূমে মাস্টারদা'কে গ্রেপ্তার এবং ১৯৩৪ সালে তাঁব ফাঁসি। এমনি সব চাঞ্চল্যকর ঘটনাপ্রবাহে আসমুদ্র হিমাচল সারা ভারতে প্রবল উত্তেজনার উদ্বেলতা। একদিকে সন্ত্রাসবাদের পুনরুত্থান, যার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ হল কল্পনা, প্রীতিলতা, শান্তি, সুনীতি, বীনা, উজ্জ্বলা—এমনি আরও কত বীরাঙ্গনার নাম। এ যেন এক অহিংস আর সহিংস সংগ্রামের সহাবস্থান; বিশ্বের ইতিহাসে যার কোন দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। কিন্তু সে যুগের সামিল হবার সুযোগ পেলাম না আমি। কেন তোরা আমাকে ডেকে নিলি না? কেন আমাকে নবলব্ধ সার্জারি বিজ্ঞান প্রয়োগ করতে হল শত্রুপক্ষের হাডসনের জীবন রক্ষার কাজে, দেশের কাজে নয়? যখন সে কথা মনে করি, দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়, কমল।

বলতে বলতে গলা ধরে আসে, ডাঃ চৌধুরীর। কমল বলে—দুঃখ করিস্ নি, গৌতম। মাস্টারদা'কে আমি বলেছিলাম তোর আর দিলীপের কথা। তিনি বললেন—লিভ্ দেম্ এ্যালোন। ওদের পরে দরকার হবে। সে সুযোগ আর হয় নি। আমাদের সবাইকে পাইকারী হারে গ্রেপ্তার করে পাঠানো হল বিভিন্ন জেলে বা ডিটেন্‌সন্ ক্যাম্পে-এ। দীর্ঘ সাত বছর পর খালাস পেয়ে

চাটগাঁয়ে যখন ফিরে গেলাম তখন দেখি সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী গুপ্তসমিতির অবশিষ্ট বলে আর কিছুই নেই। সৃষ্ট হয়েছে বিরাট "কমিউনিকেশন গ্যাপ"। চলে এলাম কলকাতা। মুক্ত বিপ্লবীরা অনেকেই ফিরে গেছেন কংগ্রেস-এ।

—কংগ্রেস-এ কেন? প্রশ্ন করেন ডাঃ চৌধুরী।

—তা' ছাড়া কোথা যাবেন? তুই তো জানিস্, সেকালে কংগ্রেস ছিল সর্বভারতীয় একটা প্ল্যাটফর্ম; যেখানে একদিকে যেমন ছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজা গোপালাচারী, জগজীবন রামের মত অহিংসবাদীরা, তেমন ছিলেন মাস্টারদা'র মত সহিংসবাদীরা আর তাদের মধ্যস্থানে ছিলেন জওহরলাল, জয়প্রকাশের মত ভাসা-ভাসা একটা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীরা। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন সুভাষ বাবু। তাঁর কাছে তন্ত্র-কন্ত্র এসব অবান্তর; ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাই একমাত্র মূলমন্ত্র। তা' অহিংস বা সহিংস যে কোন তন্ত্রের মাধ্যমেই হোক্। তাই তাঁকে সইতে না পেরে ১৯৩৯ সালে তাড়িয়ে দেওয়া হল কংগ্রেস থেকে। বাধ্য হয়ে তাঁকে গড়তে হল "ফরওয়ার্ড ব্লক" নামে এক নতুন দল। যাক্ ওসব পুরনো কাশুন্দি। এবার নিজের কথায় ফিরে আসি।

—জেল থেকে বেরিয়ে চারদিকে এই ছন্নছাড়া অবস্থায় তুই কী করলি? প্রশ্ন করেন ডাঃ চৌধুরী।

—কলকাতা এসে হালবিহীন নৌকার মত জনসমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছি। একদিন বিকেলে গড়ের মাঠে বেড়াতে গিয়ে দেখি একটা জনসভা হচ্ছে। বক্তৃতা দিচ্ছেন মার্কসবাদী মুজঃফর আহ্মেদ। তাঁর বক্তব্যে পেলাম একদিকে গ্রাম্য মাঠের সোঁদা গন্ধ, অপরদিকে শহরে কলকারখানার পোড়া তেলের উগ্র গন্ধ। সব মিলে মেহনতী মানুষের মুক্তি সংগ্রামের একটা জ্বলন্ত ছবি। নতুন করে চিনলাম ভারতমাতাকে। দীক্ষা নিলাম মার্কস্‌বাদে। আর তোর কথা বল্।

—আমার কথা আরও সংক্ষিপ্ত। ১৯৪০ সালে যোগ দিলাম সেনাবাহিনীতে। ভারতীয় বাহিনীর একটা ব্রিগেড-এর মেডিক্যাল অফিসাররূপে; পাড়ি দিলাম বর্মা রণাঙ্গনে। ১৯৪৩ সালে যোগ দিই নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজে। ১৯৪৫-এর শেষপাদ থেকে গতকাল পর্যন্ত বন্দী ছিলাম লালকেল্লায়। সুতরাং তোদের ভাষায় আমি একটা জলজ্যান্ত "জাপানী দালাল"। হেসে দিয়ে বলেন ডাঃ চৌধুরী।

—বার বার তুই এক কথায়ই ফিরে যাচ্ছিস্ গৌতম। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে কমল। আচ্ছা বল্ তো—তোদের কার্যকলাপ মূলতঃ জাপানের আক্রমণ নীতিকেই মদত দেয়নি কী?

—না, দেয়নি। নেতাজী জাপানের সঙ্গে আঁতাত করেছিলেন স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে, ভারতের মুক্তির জন্যে, জাপান-এর নীতির সমর্থনে নয়। তাই, প্রথমেই তিনি গঠন করেন স্বাধীন আজাদ হিন্দ্ সরকার। তারপর সেই সরকারের পক্ষে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় নিয়মানুযায়ী জাপানের সঙ্গে করেছিলেন "ট্রিটি অব্ এ্যালায়েন্স"। অনুরূপ অবস্থায় স্তালিনও কী হাত মেলান নি সাম্যবাদের পরম শত্রু চার্চিলের সঙ্গে।

—সম্পূর্ণ ব্যাপারটা যুক্তি তর্কের অবকাশ রাখে, একথা আমি অকপটে বিশ্বাস করি, গৌতম। তবে একটা কথা আছে, নাথিং ইজ্ আনফেয়ার ইন্ লভ্ এ্যাণ্ড ওয়ার। এ সবই ওপরতলার বিচার্য। তা' নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামানোই ভাল।

ডাঃ চৌধুরী বোঝেন, কমল কথাটা এড়িয়ে যেতে চায়। কারণটাও তার বুঝতে কষ্ট হয় না। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টির কথা ছেড়ে দিয়ে বলে—শুধু তোরাই বা কেন, কংগ্রেসও তো প্রকারান্তরে তোদেরই বক্তব্য সমর্থন করেছে, যদিও আজ ওরা অন্য সুরে কথা বলছে।

—যথা?

—বর্তমানে আই. এন্. এ আন্দোলনের সামিল হয়েছে ওরা।

—এটাই ওদের যথার্থ স্বরূপ। এই আন্দোলনটা প্রকৃতপক্ষে গণ-অভ্যুত্থান। কংগ্রেস-এব এতটুকু অবদান নেই এই আন্দোলনে। অথচ ভাবটা এমন দেখাচ্ছে যেন ওরাই আন্দোলনের পুরোধা।

—এটা তোর অবিচার, কমল।

—অবিচার নয়। কংগ্রেস-এর বহু আন্দোলনই এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি, তার পরিবর্তনও দেখেছি আমরা বাববার। আপসের সুযোগ পেলেই ওরা আন্দোলন বন্ধ করে গোলটেবিল-এ সবার আগে গিয়ে বসেন। তার লক্ষণ খুবই স্পষ্ট। দেখছিস্ না ক্যাবিনেট মিশন-এব দরজায় কেমন ওরা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

—ওদের প্রতি তোব এত অবিশ্বাস কেন ?

—বরাবব ওরা স্বাধীনতা চেয়ে আসছে আপসের মাধ্যমে। চেয়েছে শুধু তাদেরই হাতে 'ট্রানস্ফার অব্ পাওয়ার—গণ-স্বাধীনতা নয়, বৃটিশ বুর্জোয়া শাসক কর্তৃক কংগ্রেস বুর্জোয়ার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। এই আপস-আপস খেলার পথে কাঁটা ছিল তিনটি—এক—বাংলার সন্ত্রাসবাদ, দুই—বাংলার সংগ্রামী নেতা সুভাষচন্দ্র এবং তিন—ক্রমবর্ধমান কমিউনিস্ট দল। যাক্, অনেক কথা বলেছি, হয়তো 'বোরিং' লাগছে।

—না-না, তুই বলে যা। আমি যেন এক নতুন দিগন্তের সন্ধান পাচ্ছি।

—কংগ্রেস-এব সৌভাগ্য যে বাংলার সন্ত্রাসবাদ ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে লেলিহান শিখা তুলে শেষবারেব মত দপ্ কবে নিভে গেছে। আমরা হাজার হাজার যুবক-যুবতী আব তরুণ-তরুণী হলাম পিঞ্জরাবদ্ধ। ১৯৩৭ সালে, অর্থাৎ আমরা জেল থেকে বেরুবার আগেই কংগ্রেস 'রেস্পন্সিভ্ কো-অপারেশন' নামীয় একটা অলীক রাজনৈতিক স্লোগান তুলে ঢুকে পড়েছে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধানসভাগুলোতে। দ্বিতীয় কাঁটা সুভাষচন্দ্রকে দরজা

দেখিয়ে দিল ১৯৩৯ সালে। বাকি রইলাম আমরা, অর্থাৎ মার্কসবাদীরা। আমাদের দরজা দেখিয়ে দিয়েছে হালে, অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে। এবার কংগ্রেস তাব নির্ভেজাল বুর্জোয়া দল হিসাবে আবির্ভূত ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে। আই. এন্. এ আন্দোলনেব ছত্রছায়ায় কংগ্রেস-এর এই নতুন খেলার ফলশ্রুতি হিসাবে ক্ষমতা হস্তান্তর সত্যি যদি এসে যায়, তা'হলে হবে এক বুর্জোয়া শাসিত রাষ্ট্র, যার সর্বদেহ কুরে কুরে খাবে, এমন এক মজুতদার, কালোবাজারী ও মুনাফাবাজেব দল, যাদের জন্ম দিযে গেছে সদ্য সমাপ্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

—সে খাবার কী?

—সে আর এক কাহিনী। তার আগে আব একটি ঘটনার উল্লেখ করতে হয়! ১৯৪২ সাল। বৃটেন তখন চতুর্দিক থেকে নাৎসী বাহিনীর হাতে মাব খাচ্ছে। সুযোগ বুঝে বৃটেন-এর ওপর চাপ সৃষ্টিব জন্যে জওহরলাল দ্বারস্থ হলেন চায়নার চিয়াং-কাইসেক এবং আমেরিকাব প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট-এর কাছে। আশ্বাস দেওয়া হল—বৃটেন যদি ভাবতকে স্বাধীনতা দেয়, তা'হলে কংগ্রেস তার সর্বশক্তি নিয়ে জাপানকে পরাভূত করবে বর্মা ফ্রন্ট-এ। অনেক টালবাহানার পব চার্চিল পাঠালেন ভারতবন্ধু বলে খ্যাত স্যার স্ট্রাফোর্ড ক্রীপ্স্কে অন্তর্বর্তীকালীন একটা প্রস্তাব দিয়ে—যার মূল বক্তব্য হল—ভাবতকে "ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস্" তুল্য ক্ষমতা অবশ্যি দেওয়া হবে, কিন্তু তা' হবে যুদ্ধান্তে। আপাততঃ ফরেন এ্যাফেয়ার্স, ডিফেন্স, ফিনান্স এবং কমিউনিকেসন-এর মত যুদ্ধকালীন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলো ছাড়া অন্যান্য বিভাগে নেওয়া হবে গভর্ণর জেনারেল-এব কাউন্সিলে ভারতীয় কাউন্সিলার। বলা বাহুল্য কংগ্রেস এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। পৃথিবীব দুই প্রান্ত থেকে ফেটে পড়ে দু'টি বোমা—একটি ছাড়লেন গান্ধীজি, অপরটি উইন্স্টন্ চার্চিল। গান্ধীজি বলেন—বৃটিশ প্রস্তাব পোস্ট ডেটেড চেক্ অন্ এ

ক্রাম্‌ব্লিং ব্যাঙ্ক, যার একমাত্র জবাব, কুইট্‌ ইণ্ডিয়া। চার্চিল হুঙ্কার ছাড়েন—আই হ্যাভ্‌ নট্‌ বিকাম দ্য ফার্স্ট মিনিসটার অব্‌ হিজ্‌ ম্যাজেস্টিজ গভর্ণমেণ্ট টু লিকুইডেট্‌ দ্য বৃটিশ এম্পায়ার। সঙ্গে সঙ্গে কারারুদ্ধ হলেন গান্ধীজিসহ সব কংগ্রেস নেতা। তারিখ ও সময়টা ছিল ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট-এর গভীর রাত্রি।

'চার্চিল-এর এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যের জবাব দিল ভারতের গণদেবতা। দেশময় সুরু হয় অকল্পনীয় এক গণ-অভ্যুত্থান। মেদিনীপুর জেলার তমলুকে সতীশ সামন্তের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল ভারতের বুকে প্রথম জাতীয় সরকার। ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে কোর্ট-থানা দখলের নেতৃত্ব দিলেন বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা। পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন, কিন্তু পতাকা ছাড়লেন না। কোর্ট-কাছারী বন্ধ। মামলার বিচার হচ্ছে স্বদেশী সরকারের আদালতে। নেমে এল অমানুষিক অত্যাচার। অনেক মাসুল দিতে হল মেদিনীপুর-বাসীদের। সামগ্রিকভাবে কংগ্রেস কিন্তু সরকারীভাবে এগিয়ে এল না তাদের সাহায্যে। বরং কারান্তরাল থেকে গান্ধীজি বললেন—এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর বা কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরই দেওয়া 'কুইট্‌ ইণ্ডিয়া' স্লোগান রয়ে গেল শুধু কাগজে কলমে। অথচ কংগ্রেস আজ সেই আন্দোলনের সব কৃতিত্ব দাবী করছে—কিমাশ্চর্যম্‌ অতঃপরম্‌! তাই বলছিলাম, সেদিন বেশি দূরে নেই—আজকের এই আই এন্‌ এ আন্দোলনের সব কৃতিত্ব ওরাই দাবীদার হবে, তোরা চলে যাবি বিস্মৃতির অন্তরালে।

কমল চুপ করে যায়। ডাঃ চৌধুরী ডুবে যান তার চিন্তা-সাগরে। উত্তপ্ত গাড়িটা কোথাও একটু ছায়ার আশায় সব শক্তি নিয়ে যেন ছুটে চলেছে। যাত্রীরা সব দু' হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ঢুলছে। হঠাৎ ধাক্কায় এদিক্‌-ওদিক্‌ তাকিয়ে নিয়ে আবার ঝিমিয়ে পড়ছে।

কিছুক্ষণ পর ডাঃ চৌধুরীই প্রশ্ন করেন—মুনাফাবাজের কথা কী যেন বলছিলি না, কমল?

—হ্যাঁ, বলছিলাম এ এক নতুন সমাজ দিয়ে গেছে আমাদের—যত না বৃটিশ ততোধিক আমেরিকা। বর্মা ফ্রন্ট-এ বিধ্বস্ত বৃটিশ আর্মির যেটুকু অংশ ভারতে ফিরে আসে তারা সরে গেল নিরাপদ আশ্রয়ে—পুনর্বিন্যাসের নামে। জাপান তখন ভারতের দোর গোড়ায়। পূর্ব সীমান্ত রক্ষার জন্যে এগিয়ে এল আমেরিকা, অফুরন্ত তার ম্যান্ পাওয়ার আর অস্ত্র-সস্ত্র নিয়ে। ক্রমশঃ সেই বিশাল সেনাবাহিনী ছড়িয়ে পড়ে শহরে, বন্দরে, গ্রামে, গঞ্জে। প্রয়োজন হয় তাদের ছাউনি নির্মাণে লক্ষ লক্ষ টাকা আর শ্রমিকের। এগিয়ে আসে হাজার হাজার স্থানীয় ঠিকাদার। শুরু হয় কোটি কোটি টাকার ছিনিমিনি খেলা। মওকা পেয়ে ঠিকাদাররা হাঁকে একগুণের স্থলে দশগুণ টাকার। ঠিক হ্যায় বলেন সামরিক কর্তৃপক্ষ। গড়ে উঠে অশুভ আঁতাত। "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন"—অর্থাৎ "আংকল্ স্যাম্।"

এ অবস্থায় যা হবার তাই হল। জন্ম নিল এমন এক বলিষ্ঠ অর্থবান নতুন শ্রেণী, যাদের হাতে বাঁধা পড়ে গেল রাষ্ট্রনেতাদের টিকি আর ট্যাক্। এই গোষ্ঠীকেই আমরা বলি মজুতদার, কালোবাজারী আর মুনাফাবাজ। এরাই এখন ছড়িয়ে বিরাজমান বড়বাজার থেকে পার্কস্ট্রীট্ পর্যন্ত। ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়বে সারা ভারতে। ভুলেও মনে করিসনে যে যুদ্ধ শেষ হয়েছে বলে, এরাও চলে যাবে। না তা যাবে না—"দে আর্ বর্ন্ টু স্টে এ্যাণ্ড স্প্রেড্ওভার্"—"দে হ্যাভ্ কাম্ টু স্টে,"—লক্ষ-কোটি ছারপোকার মত এদের বংশবৃদ্ধি হবে দিনের পর দিন, আমাদের কুরে কুরে খাবে বলে, আর রাষ্ট্রযন্ত্র এদেরই ইঙ্গিতে উঠবে-বসবে। এদের পেছনে লাগতে যাবে তো তোমার গর্দান কবুল। এদের একমাত্র মূলমন্ত্র "টাকায় সব কেনা যায়" বা পৃথিবী টাকার।" সে কেরামতি ওরা যুদ্ধকালীনই দেখিয়ে দিয়েছে চোখে আঙুল দিয়ে। ১৯৪৩ সালের সেই অবিস্মরণীয় বিভীষিকাময়ী মহা-দুর্ভিক্ষের মহা-নায়ক এরাই,

—যার কাছে রেজাক্ খাঁর আমলের "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"-ও লজ্জায় মুখ লুকোয়। তবে তখন ছিল প্রাকৃতিক খরা, আর এবার হল মনুষ্যসৃষ্ট খরা—এই-ই যা।

—বর্মাতে ভাসা-ভাসা শুনেছি—প্রাচুর্যের মধ্যে সেই নজির-বিহীন মহা-দুর্ভিক্ষের কথা নেতাজী স্বয়ং রেডিওর মাধ্যমে বারবার আবেদন জানিয়েছেন তদানিন্তন সরকারের কাছে, বর্মা থেকে চাল পাঠাবার জন্যে—লক্ষ লক্ষ টন্। আবেদন জানিয়েছেন গান্ধীজির দরবারেও। কিন্তু কোনদিক থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি—বলেন ডাঃ চৌধুরী।

—গান্ধীজি তখন কারাগারে, তাঁর কিছুই করবার ছিল না। আর তদানীন্তন সরকার স্বয়ং এই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী—তারই কাছে আবেদন? এ'যেন মরুভূমির কাছে পানীয়ের আবেদনের মতই অর্থহীন? যাক্‌গে সে'সব কথা। সে'দিন আমরা যা' দেখেছি এখনও মনে হলে গা শিউরে ওঠে। ১৯৪২ সাল, সময়টা জুন থেকে অক্টোবর। সারা বার্মাদেশ তখন জাপানের হাতে। হাজারে হাজারে বার্মা-রিফুউজি আসছে আরাকানের পথে, ইম্ফলের পথে ভারতে আশ্রয় প্রার্থী হয়ে। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশের অভূত-পূর্ব পরাজয় জাপানের ভারত আক্রমণ আশংকায় সরকার উদ্‌ভ্রান্ত। জাপানী আক্রমন প্রতিহত করবার উপায় হিসেবে চালু হয় তথা-কথিত—"ডিনায়্যাল্ পলিসি"—অর্থাৎ জাপানীকে কোনপ্রকার সুযোগ দেওয়া হবে না অগ্রসরের পথে স্থানীয় যানবাহন ব্যবহারের বা খাদ্য-সংগ্রহের। নদী মাতৃক বাংলাদেশের নৌকা হাজারে হাজারে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। গ্রামাঞ্চল থেকে ধান-চাল সব সরিয়ে নেওয়া হয়। আর সেই ধান-চাল জমা হতে থাকে আড়ৎদার আর জোৎদারের গোলায়—সেখান থেকে চলে যায় কালোবাজারী আর মুনাফাবাজদের গুদামে। পরে সেই চাল পরিবেশিত হল শহরের ধনকুবেরদের ভোজনশালায়, বা সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে।

অন্যদিকে গ্রামের পর গ্রামে শুরু হয় হাহাকার, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফলিয়েছিল ফসল, তাদের পেটের খিদে মেটাতে রইল না একটিও চালের দানা। তাদের বরাতে জুটল শুধু কচু আর ঘেঁটু আর বন-জঙ্গল থেকে কুড়িয়ে আনা যতসব অখাদ্য-কুখাদ্য। শহরে-বন্দরে যুদ্ধকালীন টাকার ছড়াছড়ি—অথচ, গ্রামাঞ্চলে নেই একটিও পয়সা, যাতে মা-মেয়ের একটু লজ্জা নিবারণের বস্ত্রাদি সংগ্রহ করবে। ক্রমশঃ শাড়ি হয়ে দাঁড়ায় গামছা, গামছা হয় ন্যাকড়া। শেষ পর্যন্ত মেয়েরা স্থান নিতে বাধ্য হল অন্তঃপুরের অন্তরালে। একটু জল সংগ্রহ করতে হলেও দিনের বেলায় তাদের বেরুবার উপায় নেই—রাতের অন্ধকারই হল তাদের একমাত্র কাম্য। পেটের একটু দানা যোগাবার তাগিদে শহবে কামুকদের আড়কাটির কাছে বিক্রীত হয়ে গেল কত শত বোন আর কত বনিতা; অনুসন্ধান করলে যাদের হয়ত আজ খোঁজ মিল্‌বে কলকাতা আর ঢাকাব কোন কুখ্যাত অলিতে-গলিতে। শুরু হয় হাজার-হাজার, লাখ-লাখ ক্ষুধার্ত কংকালসার মানুষের মরণ-মিছিল, শহরের দিকে। যে শহরের হোটেলে-রেঁস্তোরায় ও ময়রার দোকানে আলো ঝল্‌মল্‌ কাঁচের সার্সির পেছনে থরে-থরে সাজানো রয়েছে লোভনীয় নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী সেই শহরেরই রাস্তায় রাস্তায়, অলিতে গলিতে হাজারে হাজারে কংকালসার প্রেতমূর্তির মিছিল। হাতে হাতে সব ভাঙ্গা অপরিচ্ছন্ন মাটির বা টিনের থালা বা বাটি, আর মুখে তাদের অনর্গল করুণ আবেদন—"মাগো, একটু ফ্যান দাও," "বাবা গো একটু খেতে দাও।" নিষ্প্রভ চোখে তাদের শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুজল—।—বল্‌তে বল্‌তে কমল পকেট থেকে রুমালটা বের করে চোখ চাপা দেয়। আশপাশের লোকগুলো অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, বলে না কিছুই। গৌতমও চুপ করে কী ভাব্‌তে থাকে।

একটু দম নিয়ে কমল আবার বলতে শুরু করে—এমনি করে

সারা বাংলায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ অনাহারে বুভুক্ষায় মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ে—হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে। মৃত্যু তাদের সবাইকে সমগোত্রীয় করে দেয়। "ইট্ ওয়াজ্ এ ম্যান্‌মেড্ ফ্যামিন্"—যার তুলনা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যাবে না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর তেতাল্লিশের কাছে লজ্জায় মুখ লুকিয়েছে যেন। অথচ, জ্ঞানপাপী এই নর-বিনাশের জন্য যারা দায়ী, সেই সব নরহন্তা কালোবাজারী আর মুনাফাবাজের দল রয়ে গেল বহাল তবিয়তে। বরং আরও দাপটের সঙ্গে আজও বেড়াচ্ছে সমাজের বুকের উপরে।

পরিবর্তনশীল দুনিয়া। তাই হয়ত নেহাৎ লোক লজ্জার খাতিরে কয়েকদিনের মধ্যেই সরকার পক্ষ থেকে কলকাতার অঞ্চলে অঞ্চলে তথাকথিত কয়েকটি "লঙ্গরখানা" খোলা হয় বটে এবং তাতে পরিবেশিত হয় বস্তাপচা চালে ডালে মেশানো একটি তরল পদার্থ; —যাকে কর্তৃপক্ষ বলতেন "খিচুড়ি"—আর লোকে ঠাট্রা করে বল্‌তো—"লপ্‌সী"—তারই জন্য ক্ষুধার্ত মানুষের সে কী খেয়োখেয়ি! রাস্তায় ডাস্ট্‌বিনের উচ্ছিষ্টের জন্য মানুষে কুকুরে কী সে লড়াই!

চোখ বুঁজে একটু ভেবে দেখ্—কলকাতার ফুট্‌পাথ দিয়ে চলেছিস্ একটু অন্যমনস্কভাবে, কিছু একটা ভাব্‌তে ভাব্‌তে। হঠাৎ একটা অন্তর্ভেদী চীৎকার—"বাবা গো- -বাঁচাও"—সচকিতে থম্‌কে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলি—একটা কংকালসার অর্ধ উলঙ্গ মেয়েমানুষ, কোলে তার ততোধিক শীর্ণ একটা বাচ্চা; দুম্ করে তোর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে, আর তার হাতে একটা মাংসের হাড়ের টুক্‌রো, একটা কুকুর লাফিয়ে পড়েছে তার হাত থেকে সেটা কেড়ে নেবার জন্যে। মেয়েমানুষটা উর্ধমুখী হয়ে সজল নয়নে তোর আশ্রয় ভিক্ষা করছে। কী করবি তখন?—বলেই গৌতমের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকায় কমল।

অবাক্ বিস্ময়ে ডাঃ চৌধুরী বলেন—এও কী সম্ভব, কমল?

—হ্যাঁ, এ-ও সম্ভব হয়েছিল সেদিন কলকাতার সম্ভ্রান্তপল্লীর

সদর রাস্তা রাসবিহারী এ্যাভিন্যুর ওপর, আমারই সামনে। প্রথমটা একটু হক্‌চকিয়ে যাই। তারপর পাশে পড়ে থাকা একটা ইটের টুক্‌রো তুলে নিয়ে কুকুরটাকে তাড়া করি। তাড়া করতে করতে আমিও পালিয়ে যাই। ফিরে এসে যে সেই মেয়ে আর তার বাচ্চাটার কী হল তা দেখবার মত সাহস আর ছিলনা আমারও। সেই কমল, যে কমল একদিন পিস্তল হাতে বন্দুকধারী পুলিশের সামনে এগিয়ে যেতেও ভয় করেনি, সেই কমলও সে দৃশ্য সইতে না পেরে পালিয়ে গেল।

—আর শুনতে পারিনে এসব কাহিনী। তুই এবার চুপ কর দয়া করে।

কমলের তখন বলবার রোখ চেপে গেছে। বলে—না, চুপ করব না। শুরু যখন করেছি, তখন আমায় বলে যেতেই হবে।

—তবু, এ প্রসঙ্গটার এখানেই যবনিকা টেনে দে। বরং অন্য প্রসঙ্গে আয়—,

—বেশ, তাই হোক। এই তো গেল ১৯৪৩ সাল। বম্বে বন্দরে নৌ-বাহিনীর ট্রেনিং জাহাজ "তলোয়ার"-এ রেটিংদের মধ্যে দেখা দিল একটা চাঞ্চল্য—একটা চাপা অসন্তোষ। ক্রমে সেটা বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গের মত আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি তখন তুঙ্গে। মিত্র-বাহিনীর ক্ষমতাও তখন খুব প্রবল। ব্রিটিশ-বাহিনী এগুচ্ছে বর্মায়, আফ্রিকায়—রুশবাহিনীর প্রতি-আক্রমণে জার্মানবাহিনী পরাজয়ের পর পরাজয়ে বিভ্রান্ত। তবে বম্বের নৌ-বিদ্রোহের প্রস্তুতিটাও ছিল একটু নড়বড়ে। ফলে সেই বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা অঙ্কুরে সামান্য প্রত্যাঘাতেই ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু অন্তরে তাদের তুষের আগুনের মতোই উত্তেজনা ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে। আর ভবিষ্যতের প্রস্তুতিও চলতে থাকে সংগোপনে। এদিকে কংগ্রেস-এর সোস্যালিস্ট গ্রুপ—যার প্রবক্তা জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পট্টনায়ক, অরুণা আসফ আলি এবং আরও

অনেকে। ওঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন নেতাজীর ফরোয়ার্ড ব্লক আর আমাদের দলের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সবাইকে নিয়ে গঠিত হল "বিদ্রোহ পরিচালক সমিতি"। দু বছরের চাপা আগুন এই সেদিন ১৮ই ফেব্রুয়ারী দাবানলের মতো জ্বলে উঠে রূপ নিলো পূর্ণাঙ্গ এক নৌ-বিদ্রোহের। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল করাচী বন্দরেও। সামিল হ'ল হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-ক্রিশ্চান্ নির্বিচারে সমগ্র নৌ-বাহিনীর রেটিং আর অফিসার বর্গ। তাদের দিকে বন্ধু-সুলভ হাত বাড়িয়ে দেয় স্থল ও বিমান বাহিনীর একটা অংশ। চারিদিকে একটা চাপা উত্তেজনাময় চাপা-চাঞ্চল্য। সমগ্র সেনা বাহিনীর শৃঙ্খলা যেন ভাঙ্গনের মুখে, মরিয়া হয়ে ভারত-সরকার সর্বশক্তি নিয়ে সেই বিদ্রোহ দমনে এগিয়ে আসেন।

বাধা দিয়ে ডাঃ চৌধুরী বলে—তা হলে এটা ছিল হিন্দু-মুসলমানদের এক রেটিং ও জোয়ানদের সংযুক্ত অভিযান?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই—জবাব দেয় কমল—আর লক্ষণীয় যে এ'বিদ্রোহের সামিল হ'ল ধর্মনির্বিশেষে বম্বে সহরের নাগরিকবৃন্দ, রাজনৈতিক দিক থেকে সম্মিলিত ডাক দিলেন হরতালের—বম্বে বন্ধ্। অপূর্ব সাড়া মেলে তাতে। বম্বে প্রেসিডেন্সীতে তখন মোরারজি দেশাই-এর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেস সরকার। তিনি চারিদিকে পুলিশ লেলিয়ে দিলেন এই হরতাল ভাঙ্গতে—কিন্তু বিফল হলেন। "তলোয়ার" জাহাজে রেশন বন্ধ করে দেওয়া হল—বিদ্রোহীদের অনাহারে মারবার জন্যে—নৃশংসতার চূড়ান্ত আদেশ। কিন্তু বম্বে-অধিবাসী এগিয়ে এলেন রাতের অন্ধকারে তাদের রসদ জোগাতে।

—অপূর্ব—আনন্দ চাপতে না পেরে বলে উঠেন ডাঃ চৌধুরী'।

—হ্যাঁ, সত্যিই অপূর্ব। কিন্তু এর চেয়েও অপূর্ব আরও অকল্পনীয় ঘটনা শুনবার জন্য প্রস্তুত হ' গৌতম। শুনলে-আনন্দে নয়—লজ্জায় তোর মুখ লুকোতে ইচ্ছে হবে—

—বলিস্ কি?

ঠিকই বল্‌ছি। জানিনা, পর্দার আড়ালে দিল্লী আর লণ্ডনের মধ্যে কী বার্তা বিনিময় হ'ল। হঠাৎ ২০-শে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ্যাট্‌লী পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন—প্যাথিক্ লরেন্স্, এ-ভি আলেকজেণ্ডার্ এবং স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্-কে—ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার বিশিষ্ট এই তিন সদস্যকে—নিয়ে একটি ক্যাবিনেট্ মিশন্ যাচ্ছে ভারতবর্ষে। তাঁরা তথাকার সর্বদলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা পূর্বক স্বাধীন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখা সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের কাছে সুপারিশ জানাবেন। তদনুযায়ী যথাসত্বর ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।—

—এটা একটা কূটনৈতিক চাল ছাড়া আর কিছুই নয়—বলেন ডাঃ চৌধুরী।

—ঠিক বলেছিস্। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আমাদের কাছেও যে ব্যাপারটা এত পরিষ্কার, তখন কংগ্রেস ভাবছে—এটা একটা সুবর্ণ-সুযোগ। সুতরাং, নৌ-বিদ্রোহ বন্ধ করা আশু-প্রয়োজন। এমন কী, মহাত্মা গান্ধীও দেখ্‌লেন এই বিদ্রোহের পেছনে তথা-কথিত হিংসা-বৃত্তির কালোছায়া। যে বিদ্রোহের সমর্থনে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে বম্বের জনসাধারণ গড়ে তুলেছিল সর্বাত্মক এক গণ-আন্দোলন, কংগ্রেস নেতারা তখন বলে উঠ্‌লেন—"বন্ধ করো এ আন্দোলন।" শুধু তাই নয়; আন্দোলনকারীদের জানালেন তীব্র ভর্ৎসনা। কংগ্রেসের মদত পেয়ে গোরা সৈনিকেরা চালায় অমানুষিক অত্যাচার—কামানের গোলাতে বিধ্বস্ত হয় ট্রেনিং-জাহাজ—"তলোয়ার"—আর তার সাথী—"ডাফ্‌রিন্"। অসীম সাহসে পাল্টা গোলাবর্ষণ চালায় বিদ্রোহীরা। কিন্তু অসম যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পন করা ছাড়া আর উপায় রইল না তাঁদের। নেতারা প্রতি-শ্রুতি দিয়েছিলেন আত্মসমর্পন করলে, ওঁরা দেখ্‌বেন সরকার যাতে সদয় ব্যবহার করেন। শেষ পর্যন্ত সে 'প্রতিশ্রুতিও রাখেননি ওঁরা।

অসময়ে ঝড়ে গেল সম্ভাবনাময় শত শত তরুণ জীবন—রণাঙ্গনে নয়, কোর্টমার্শালের মৃত্যুদণ্ডাদেশে।

প্রতিকারহীন একটা ব্যর্থতার ক্ষোভে আর দুঃখে কমলের বুক যেন ভেঙ্গে পড়তে চয়। ধিক্কারের সুরে ডাঃ চৌধুরী বলেন—ছিঃ ছিঃ—কী লজ্জা।

—এ শুধু তোমার আমার লজ্জা নয়—সারা ভারতের লজ্জা। কংগ্রেস মুসলিম লীগ্ নির্বিশেষে দেশের নেতারা (?) তখন ক্যাবিনেট্ মিশনকে কীভাবে সংবর্ধনা জানাবেন এবং তাঁদের সামনে কী প্রস্তাব রাখ্বেন, তারই খস্ড়া রচনায় ব্যস্ত। বিপ্লবের চেয়ে আপসে স্বাধীনতা লাভই তাঁদের বিচারে একমাত্র সোপান। মোদ্দা কথাটা কী জানিস্ গৌতম—সত্যিকারের গণ-অভ্যুত্থান কখনও কংগ্রেসের কাম্য ছিল না। যখনই কোন আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা-কামী জনতা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে, তখনই কোন এক বাহানায় কংগ্রেস সেই আগুনে জল ঢেলে দিয়েছে। ১৯৪৬-এ নৌ-বিদ্রোহকে উপলক্ষ্য করে তারই আর একবার পুনরাবৃত্তি হল মাত্র। তাই আমি বলছিলাম—এবার সত্যিই যদি দেশের ভাগ্যে সিঁকে ছিঁড়ে মোয়া পড়ে, তা 'হবে স্বাধীনতা নয়, "হোয়াইট্ বুর্জোয়া" কর্তৃক "ব্রাউন বুর্জোয়া"-র হাতে শুধুমাত্র ক্ষমতার হস্তান্তর; যার সঙ্গে গণদেবতার কোন ভূমিকাই থাকবে না, ফলে দাঁড়াবে, যেখানে "হোয়াইট বুর্জোয়া" চালাতো চাবুক, সেখানে "ব্রাউন্ বুর্জোয়া"-র প্রশ্রয়ে "মজুতদার মুনাফাবাজ কালোবাজারী" সরীসৃপেরা তাদের প্রাণসত্তা কুরে কুরে খাবে মনের আনন্দে।

অনেক কথা বলার পর পরিশ্রমে চুপ করে যায় কমল। কিন্তু তাকে থামতে দেন না, ডাঃ চৌধুরী। আবার প্রশ্ন করেন—এসব ক্ষয়ের হাত থেকে আমাদের কী মুক্তি নেই—কমল।

—আছে, নিশ্চয়ই আছে। মুক্তি পেয়েছে রাশিয়া, মুক্তি পেয়েছে ইওরোপে বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরী,

চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানী আর প্যোলাণ্ড। এশিয়ায় সর্ববৃহৎ দেশ চীনও এগিয়ে চলেছে মাও সে-তুং এর নেতৃত্বে। সে মুক্তি ভারতেরও আসবে একাদন। প্রশ্ন শুধু, কবে ?

—তুই কী মনে করিস ?

একথা আজ পরিস্কার, ভারতে হু'টি বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ—বিপ্লবে বিশ্বাস করে না। তারা চায় বৃটিশের হাত থেকে আপসে ক্ষমতা আদায় করে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে গদি দখল করতে। কিন্তু সে আশা তাদের সুদূর পরাহত। যতদিন সম্ভব বৃটিশ তাদের "ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল" পলিসি চালিয়ে যাবে।

—তারপর ?

—তারপর আবার কী, রক্তস্নান। এ রাশিয়ার মত বিপ্লবের রক্তস্নান নয়, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে ভায়ের রক্তে ভায়ের স্নান। তাই বলে হতাশ হোসনি গৌতম। বুর্জোয়া আর ধনবাদী জগতের নিয়মই তাই। তাদের রাষ্ট্রকে গালভরা "ডেমক্রেসি" নামে অখ্যাত করেন তারা। কিন্তু কার্যত হিটলার-এর ফ্যাসিজম্ আর এদের ক্যাপিটালিজম্-এব মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

—বলিস্ কী ?

ঠিকই বলছি, বলতে পারিস নাৎসীদের বর্বরতা আর নাগসাকি আর হিরোসিমাকে এটম বোম্ব-এর আঘাতে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দেওয়া—এতু'টিব মধ্যে তফাৎ কোথায় ? দুর্ভাগা এ দু'টি শহরের কত লক্ষ মানুষ হয় মরেছে নয় বোমাব তেজস্ক্রিয়তায় ঝলসে গিয়ে পাগল হয়ে আজও জাপানের মাটিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার কোন হিসাব কী ওরা কিছু রেখেছে ?

বলতে বলতে কমলের চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরোয়। তবু সে বলে চলে—ধানবাদের পূজারিদের হাতে সাধারণ মেহনতী মানুষের মুক্তি নেই। সেক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানে কোন বিভেদ

নেই। তাই এদের যেদিন সংঘবদ্ধ করে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে পারব আমরা, সেদিনই হবে ভারতের প্রকৃত মুক্তি।

স্টেশনের পর স্টেশন পেরিয়ে চলেছে গাড়িটা। অনেক রাত হয়েছে। বাইরে কালো গাঢ় অন্ধকার। কমল বলে—নে, অনেক বকেছি। এবার একটু ঘুমিয়ে নেয়া যাক্। দ্বিরুক্তি না করে উভয়েই উঠে যায় উপরের বাংক-এ। ঘুম যখন ভাঙে ট্রেনটা তখন হাওড়া স্টেশনে ঢুকছে, চারদিক উষার আলোয় উদ্ভাসিত।

প্ল্যাটফর্ম-এ নেমে ডাঃ চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করে কমল—কোথায় উঠ্বি?

—ভাবছি হ্যারিসন রোড-এর কোন একটা হোটেলে আশ্রয় নেবো। ট্যাক্সিতে শিয়ালদার কছে একটা হোটেলে-এ ডাঃ চৌধুরীকে নামিয়ে দিয়ে বলে—ডেকার্স লেন-এ আমাদের পার্টি অফিসে খোঁজ করলেই আমার সন্ধান মিলবে। বলেই এ্যাস্প্লানেড-এর দিকে যাবার জন্যে ড্রাইভারকে নির্দেশ দেয়।

বিছানায় শুয়ে শুধু কমলের কথাগুলোই তার মনের আশেপাশে ঘুরতে থাকে সারারাত। আর একটা প্রশ্নই বারবার মনকে নাড়া দেয়—অতঃ কিম্?

। সতেরো ।

—অতঃ কিম্ ?

পরদিন বিকেল বেলা হ্যারিসন রোড-এর দিকে বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ান ডাঃ চৌধুরী, আর ভাবেন 'অতঃ কিম্' ?

অগনিত পথচারী। ট্রাম, বাস, ঠেলাগাড়ি আর রিকসা থেকে শুরু করে যতরকম চলমান প্রাণী ও যানবাহন হতে পারে তারই বিরামহীন একটা মিছিল চলেছে রাস্তাটা বেয়ে।

অবিশ্রান্ত সেই মিছিল। সহসা নজরে এলো ওধারের ফুটপাতটা দিয়ে চলেছে তিনটি নারী। বুকের ভেতরটায় আচমকা একটা মোচড় অনুভব করেন। নারীত্বের আকর্ষণে নয়, পোষাকের বৈশিষ্ট্যে। নার্সের পোষাক। বিশেষ একটা ভঙ্গিতে কোমরে জড়ানো শাড়ির আচলটা ততোধিক বৈচিত্রে মাথার খোঁপায় জড়ানো ধবধবে সাদা রুমালটা।

চোখের সামনে ভেসে উঠে দীপালির ছবি। এমনি পোষাকে সে যাতায়াত করত আর্মানিটোলার বাড়ি থেকে মিড্‌ফোর্ড হাসপাতাল।

অজান্তেই আজকের প্রশ্নের জবাব পেয়ে যান। অভিলাষ নামক অজ্ঞাত একটা পুরুষের সঙ্গে দীপালি যদি কোথাও গিয়ে থাকে, তবে সে এই কলকাতা, আর কোথাও নয়। নিজেকে জন-অরণ্যে রাখবার জন্যে। সেই জন-অরণ্যের প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি অলি-গলি তছনছ করে দীপালিকে খুঁজে বের করতেই হবে, এটাই তার জীবনের ব্রত।

দৃঢ় সংকল্প নিয়ে রাস্তায় নেমে আসেন ডাঃ চৌধুরী। শিয়ালদার

মোড়ে এসে কী মনে করে এ্যাসপ্লানেড-গামী ট্রামটায় চেপে বসেন। হাজির হন কমলের পার্টি আফিসে। দরজার সামনেই ফুটপাথে দাঁড়িয়েছিল কমল। তাঁকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে—গৌতম যে, কী মনে করে? চ' চ', ভেতরে চ'। পাশের ঘরটায় ঢুকে বলে—বোস্—চা নিয়ে আসি।

চা খেতে খেতে আবার প্রশ্ন করে, চুপ করে আছিস কেন? বল, একদিন যেতে না যেতেই, হঠাৎ এখানে?

—বড় একা বোধ করছিলাম হোটেলটায়, তাই চলে এলাম।

—বেশ তো, এলিই যদি, কিছু একটা বল্? কেউ তো আমরা বোবা-কালা নই?

ডাঃ চৌধুরীর মুখ দিয়ে তবু কিছু বেরোয় না। মাথা নত করে কী বলবেন তাই ভাবতে থাকেন।

চুপ করে বসে থাকা কমলের ধাতে সয় না। বলে—নিশ্চয়ই তুই বৌদির কথা ভাবছিস্।

চমকে উঠেন ডাঃ চৌধুরী। অবাক হবার ভাণ করে বলেন—বৌদি? তিনি আবার কে?

আমার কাছে লুকোস্ নি, গৌতম। দিলীপের কাছে সব আমি শুনেছি। ঢাকায় তুই বিয়ে করেছিলি একজন নার্সকে। শুনতে পাই নি শুধু তুই যুদ্ধে চলে যাবার পর তিনি কোথায় গেলেন। ট্রেনে তোকে জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম। কিন্তু আমাদের আলোচনা এমন পর্যায়ে চলে গেল যে আর কিছু বলার সুযোগই পেলাম না।

—দিলীপের কাছে? তার সঙ্গে তোর কোথায় দেখা হল?

—হাওড়ায়। আমি যেমন সরে এসেছি মার্কসবাদে, তুই যেমন ছিটকে গিয়েছিস সুবিধাবাদে, সেও তেমনি লাইন টপ্‌কে ঢুকে পড়েছে সরকারী গোয়ালে।

—তার মানে?

—মানে, সে আজ মস্ত এক হোমরা-চোমরা আই. পি. এস্. অফিসার। হাওড়া জেলার পুলিশ সুপার।

—তুই তার পাত্তা পেলি কী করে?

—পার্টি করতে গেলে সরকারী হেঁসেলের সব কিছু খবরাখবর রাখতে হয়। সেই সূত্রেই দিলীপের সন্ধান পেয়ে একদিন হাওড়ায় তার সঙ্গে দেখা করে এসেছি। যাবি তুই।

—যাবি মানে? আমি তো পা বাড়িয়েই আছি। তোর সময় হলেই হয়।

—বেশ। কাল হবে না। পরশুদিন চল দুজনে মিলে দিলীপের কাছে যাই। অনেক পুরনো কাসুন্দি ঘাটা যাবে। বৌদির কথাটাও শোনা যাবে সবাই মিলে।

—ঠিক আছে। আজ তবে চলি।

—দাঁড়া, এখুনি দিলীপকে টেলিফোন করে জেনে নিই সময়টা। পাশের ঘরে টেলিফোন করে ফিরে এসে বলে—পরশু রাত আটটায় যেতে বলল। খানাপিনাটা সেখানেই হবে। আমি সাতটা নাগাদ তোর ওখানে চলে যাব।

সেদিন যথাসময় দিলীপের ওখানে যখন পৌছুয়, তখন দিলীপ ও তাঁর স্ত্রী ড্রইংরুমে বসে বিশ্রম্ভালাপ করছে। ওদের জড়িয়ে ধরে দিলীপ সোফায় বসিয়ে দিয়ে স্ত্রী শর্মিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। বলে—কমলের সঙ্গে তো তোমার আগেই পরিচয় ঘটেছে। ইনি গৌতম চৌধুরী যার কথাও অনেকবার বলেছি। বর্তমানে লাল-কেল্লার গারদ থেকে সদ্য-মুক্ত আই এন্. এ ডাক্তার।

সহাস্যে ডাঃ চৌধুরীকে নমস্কার জানায় শর্মিলা, বলে—আজ কিন্তু আই. এন্. এর সব কাহিনী আমাদের শোনাতে হবে ডাঃ চৌধুরী, নইলে লালকেল্লা থেকে মুক্তি পেয়েছেন বলে আমাদের এখান থেকে মুক্তি নেই। জানেন তো উনি পুলিশের লোক। গারদে পুরে দেবেন।

মিসেস্-এর কথায় সবাই হো-হো করে হেসে উঠে। অনেকদিন পর ডাঃ চৌধুরীর বুকটাও যেন হালকা হয়। সহাস্যে বলেন—যথা আজ্ঞা, বৌদি। কিন্তু রাত হয়ে যাবে যে। আমরা ফিরব কখন?

—ফিরতে হবে না। শোবার ব্যবস্থা এখানেই করে রাখা হয়েছে। এবার আমায় একটু মাপ করতে হবে। ওদিক্‌কার ব্যাপারটা একটু দেখে আসি। দিলীপের দিকে তাকিয়ে বলে—যথাসময় সফট্ বা হার্ড ড্রিংক বেয়ারা দিয়ে যাবে।

দিলীপ বলে—আমার ও গৌতমের জন্যে হার্ড, আব কমলেব জন্যে সফট্। মৃদু হেসে গৌতমকে বলে—আশা করি যুদ্ধের কৃপায় ওটা তোমার অভ্যেস হয়ে গেছে।

জবাবে ডাঃ চৌধুরী মাথা নেড়ে সম্মতি জানান।

ডিনার শেষে সবাই আবার ড্রইং রুমে এসে বসেন। শুরু হয় ডাঃ চৌধুরীর বর্মা ফ্রন্ট-এর রোমাঞ্চকর কাহিনী।

কাহিনী যখন শেষ হয় রাত তখন দু'টো। ডাঃ চৌধুবী বলেন, রাত অনেক হয়ে গেল—বৌদি আপনি এবার শুতে যান।

হঠাৎ দিলীপ বলে—কিন্তু বৌদির কথা তো শোনা হল না, গৌতম?

মুহূর্তে ডাঃ চৌধুরীর মুখটা ছায়ের মত সাদা হয়ে যায়। সবাই বিব্রত হয়ে পড়ে।

নিজেকে সামলে নিয়ে ক্লান্তদৃষ্টিতে বলেন—দীপার সঙ্গে অনেক-দিন আগেই আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

চমকে উঠে সবাই একসঙ্গে বলে উঠে—সে কী? কেন?

কেন, সে কথা আজ থাক। যাবার সময় শুধু একটা চিঠি রেখে যায়, এই ছাখো—বলেই বুক পকেট থেকে পার্সটা বের করে আস্তে আস্তে সযত্নে রাখা সেই চিঠিটা নিয়ে দিলীপের হাতে দেন ডাঃ চৌধুরী—যেটা অভিলাষের সাথে চলে যাবার রাতে দীপা রেখে গিয়েছিল তাদের আর্মানিটোলার বসবার ঘরে সেন্টার টেবিলটার ওপর।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে একসঙ্গে চিঠিটা পড়ে নিয়ে দুই বন্ধু প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকায় ডাঃ চৌধুরীর দিকে। মৃদুস্বরে বলে চলে—অতীত এসে আজ পথরোধ করে দাঁড়ায়। অভিলাষ—সে লোকটাই বা কে?

—কিচ্ছু জানি না। জানবার সময়ও পাইনি তখন। যুদ্ধের টানে সুদূর বর্মায় নিক্ষিপ্ত হই আমি। আজ তাই তোদের সাহায্য ভিক্ষা করছি—অতীতের সেই অজ্ঞাত গুহার সন্ধান জানতে—করুণস্বরে কথা কটি বলে অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ডাঃ চৌধুরী।

দিলীপ তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে—এতো ভেঙ্গে পড়িস্ নে, গৌতম। আমরা তোর পাশে রয়েছি এবং থাকবোও—এ কথাটা কি আবার মুখ ফুটে বলতে হবে রে? তারপর একটু ভেবে নিয়ে বলে—আচ্ছা গৌতম, বৌদি'র কোন ছবি আছে তোর কাছে?

দীপার চিঠিটা তুলে নিয়ে পার্সের অন্য ভাঁজ থেকে পাশপোর্ট সাইজের একটা দীপার ফটো দিলীপের হাতে তুলে দেন ডাঃ চৌধুরী।

ছবিটা এক নজরে দেখে নিয়ে দিলীপ বলে—ঠিক আছে, আমার কাছে এটা রইল। পরে তোর হোটেলে পাঠিয়ে দেব। কলকাতার এই বিস্তৃত জনসমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া কোন মানুষকে খুঁজে বের করা খুবই শক্ত। তবুও তা যদি কেউ পারে তো আমাদের মত পুলিশের লোকেরাই পারবে। যোগাযোগ রাখিস্। কেননা, নানা কাজের ঝামেলায় বিব্রত থাকি। বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা তো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। নিশ্চয়ই ভুলে যাবো না, তবু—বলেই ডাঃ চৌধুরীর ঘাড়ে দুটো ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করে বলে—আজ এ পর্যন্তই থাক। নেঃ, চ'এবার ঘুমোতে যাওয়া যাক্। রাত তখন তিনটে।

। আঠারো ।

হোটেলের শূন্য ঘরটায় দুপুরবেলা বিছানায় শুয়ে কাল রাতের কথাই ভাবছিলেন ডাঃ চৌধুরী। পাশাপাশি দুটো ছবি ভেসে উঠে—দীপালি আর শর্মিলা। কত সুখী দিলীপ! আর আমার সারাজীবনটাই অভিশপ্ত। চলে গেলেন বাবা, চলে গেলেন মা. চলে গেল মণিকা, সবশেষ বেঁচে থেকেও চলে গেল দীপালি। আজ আমি একা—বড় একা।

ভাবতে ভাবতে দু' চোখ ভেঙে ঘুম আসে।

সকালবেলা হোটেল বয় চা ও খবরের কাগজ দিয়ে যায়। প্রথম পৃষ্ঠাতেই মস্ত খবর—শা'নওয়াজ আর মেহবুব কলকাতা আসছেন। পরশু বিকেলবেলা শ্রদ্ধানন্দ পার্ক-এ তাঁদের নাগরিক সম্বর্ধনা জানানো হবে কলকাতাবাসীদের তরফ থেকে। চুম্বকের আকর্ষণের মত মনটা চলে যায় মেক্‌টিলার রণাঙ্গনে; নেতাজী-শাহ্‌নওয়াজের সেই বাক্‌যুদ্ধ। রণাঙ্গন ছেড়ে নেতাজী আর কোথাও যাবেন না। যুক্তিজাল বিছিয়ে শাহ্‌নওয়াজ তাঁকে নিয়ে চলে গেলেন রেঙ্গুনের পথে। সেই যে গেলেন আর ফিরে এলেন না তিনি। ফিরেছেন শাহ্‌নওয়াজ, ফিরেছেন মেহবুব, ফিরেছেন আরও অনেকেই—শুধু তিনিই নেই।

মনটা তাঁর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। এক চুমুকে বাকি চা-টুকু নিঃশেষ করে বারান্দাটায় পায়চারি করতে থাকেন। রেলিংটা ধরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর জামা কাপড় পাল্‌টে রাস্তায় নেমে এ্যাসপ্লানেড-গামী ট্রামটায় চেপে বসেন।

কমল অফিসেই ছিল। তাঁকে দেখে বলে কী ব্যাপার?

—হোটেলে একা একা ভাল লাগছিল না, তাই চলে এলাম।

—বেশ করেছিস—নে চা খা—সামনেই ধূমায়িত এক কেটলি চা।

অবাক হয়ে ডাঃ চৌধুরী বলেন, তোদের সামনে সব সময়ই কী চা আর পেয়ালা সাজানো থাকে? যখন খুশি ঢেলে নিলেই হল?

হ্যাঁ থাকে। কেন না ওটাই আমাদের প্রধান পানীয়। সঙ্গে দু'চারটে বিস্কুটও থাকে। কারণ অনেক সময় ঐ খেয়েই আমাদের দিন কাটাতে হয়।

অবাক হয়ে ডাঃ চৌধুরী বলেন—তাই নাকি? অমন ষণ্ডা-গুণ্ডা চেহারাটা টিকিয়ে রেখেছিস্ কী করে?

—কথায় বলে, 'শরীরের নাম মহাশয়, যা সয়ানো যায় তাই সয়'। সর্বহারাদের মন ক্ষুধা-তৃষ্ণা থেকে সরিয়ে রাখবার জন্যে বোধ হয় এসব কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছিল। তাই আমাদের আনাগোনা তাদেরই ডেরায়, বলতে তাদের এসব মন-ভুলানো কথায় কান না দিতে। দেখলে অবাক হবি, তাদের ডেরা এমন এক একটা জায়গায়, যেখানে চব্বিশ ঘণ্টাই চলছে বাংলা হিন্দী বিমিশ্রিত অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল, আর চোলাই মদের উৎকট গন্ধ, চীৎকার, আর মারামারি। এক কথায় তোরা যাকে বলিস্—বস্তি। যেখানে ঢুকতে তোদের পেট গুলিয়ে উঠবে, নাকে চেপে ধরবি সেণ্ট মেশানো রুমাল। সেখানেই কিন্তু আমাদের আনাগোনা, সেখানেই আমাদের আড্ডা, আর সেখানেই হয়তো আমাদের অনেকদিনই রাত্রিবাস করতে হয়। তাই সব সময় সঙ্গে রাখতে হয় ফ্লাস্কে ভর্তি চা, আর কিছু বিস্কুট। এই জীবনযাত্রা বেশ ভালই লাগে।

—তা-রাত কাটাতে হয় কেন?

—বস্তিবাসী রামের ছেলেটার আজ সাতদিন নাগাদ জ্বর, উঠছে আর নামছে, কিন্তু কিছুতেই ছাড়ছে না। ওদিকে রহিমের কচি

মেয়েটা রাস্তার কলে জল আন্‌তে গেলে পাশের আর একটা মেয়ে ধাক্কা মেরে তাকে ফেলে দেয়। বা হাতটা তার যায় ভেঙ্গে। বেদনায় মেয়েটা কুঁক্‌ড়ে কুঁক্‌ড়ে কেঁদে মরছে দেখবার তার কেউ নেই। হাসপাতালে নিয়ে যাবে কে? বাপ-ব্যাটা তখন তাড়ি খেয়ে উন্মত্তের মত চেঁচাচ্ছে, আর বউটাকে ধরে পেটাচ্ছে, বলছে—

—ক্যানরে হারামজাদি, তুই নিজে না-গিয়ে ওই কচি মেয়েটাকে জল আনতে পাঠিয়েছিলি?

এ-ধরণের সব কাণ্ড-কারখানার মোকাবিলা আমাদেরই করতে হয়, গৌতম। ওদের দিকে তো কেউই তাকায় না; কেউ খোঁজও নেয় না, কেন ওই হতভাগাদের এমন দুর্ভাগ্য! কেউ এই অভিশপ্ত জীবনের হাত থেকে রক্ষা পাবার পথ বাৎলায় না ওদের। কেউ বলেও না—পৃথিবীর আর দশজন মানুষের মত সোজা হয়ে দাঁড়াবার অধিকার ওদেরও আছে। প্রয়োজন শুধু উদ্দেশ্যবিহীন এই জীবন যাত্রা থেকে উদ্দেশ্যমূলক কোন জীবনের পথে যাত্রাব সঠিক পথনির্দেশ। সে পথ—মার্কস্‌বাদের পথ। তাই আমাদের আনা-গোনা শহর, তথা গ্রামাঞ্চলের সর্বহারাদের দুনিয়ায়; মূলতঃ যাদের একই সমস্যা; সুস্থ আর সবল জীবনযাপনের সমস্যা।—তাই বলছিলাম—গরম চায়ের ফ্লাস্ক্‌ আর কিছু বিস্কুটই আমাদের নিত্য সঙ্গী। কারণ, যাদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা, যারা নিজেরাই দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোটাতে পারে না, তারা আমাদের রসদ জোগাবে কোত্থেকে বল?

কথাগুলো শুনে ডাঃ চৌধুরীর মন আবেগে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। সমাজের এদিকটা নিয়ে ভাব্‌বার সুযোগ তাঁর জীবনে কখনও আসেনি। ডাক্তারি পাশ করে হাসপাতালের গণ্ডিতেই রইলেন বাঁধা। তারপরই চলে গেলেন বার্মাযুদ্ধে। যুদ্ধ-হাসপাতাল ছিল তখন তাঁর দিন রাতের একমাত্র ভাবনা। পদ-পদবী নির্বিশেষে সব স্তরের সৈনিকদের সেবাই ছিল একমাত্র ধ্যান ও সাধনা। সামাজিক

স্তরভেদের সমস্যা তাঁর ছিল একেবারে অজানা। সেনাবাহিনীতে দেখেছিলেন অনাবিল একটা মমত্ব ও সমত্ববোধের মহামিলন। শত্রুর ক্ষেপণাস্ত্র আর গোলাগুলি জেনারেল, মেজর, ক্যাপটেন বা সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ মানে না। হয় তো তারই প্রতিফলন হয় অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের পরস্পরের আচার ব্যবহারে। অলক্ষ্যে গড়ে উঠে 'কমরেডিয়ারি'—

ডাঃ চৌধুরী চুপ করে আছেন দেখে কমল বলে—চুপ করে রইলি কেন?—কিছু একটা বল্—

—কী যে বল্‌ব কিছুই বুঝতে পারছি না।

—কিছুদিন আমার সাকৃরেদি কর, সবই বুঝতে পারবি।

—হয় তো পারব। এখনই শুরু কর না বরং তোদের মত আর পথের প্রাথমিক পর্বটা—কথাটা হালকা সুরেই বলেন, ডাঃ চৌধুরী।

আমাদের মত ও পথ খুবই সহজ, খুবই সরল। সংসারে যারা অবহেলিত, বঞ্চিত, জোতদার, মহাজন আর পুঁজিপতিদের দ্বারা যারা শোষিত, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাদের দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করতে হয়, সবাই যাদের ঘৃণা, করুণার চোখে দেখে, তাদেরও যে সুস্থ সবল মানুষের মত বেঁচে থাকবার অধিকার আছে, সেই চেতনাটাই তাদের মনে জাগিয়ে তোলা। প্রয়োজন হলে শোষণ-কারীদের অনিচ্ছুক হাত থেকে সেই অধিকার কেড়ে নিতে হবে বল প্রয়োগের মাধ্যমে—যেমনটা হয়েছিল রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে রক্তক্ষয়ী অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে।

চমকে উঠেন ডাঃ চৌধুরী। যুদ্ধবিরোধী মন তার কমলের কথায় সায় দিতে চায় না। মুখে তা প্রকাশ না করে শুধু বলেন, আজ তা হলে চলি কমল—

—বিপ্লবের নামে ভয় পেয়ে গেলি না কী?

আমি সহজে ভীত হই না, এটা তোর অজ্ঞাত নয়। বর্মা ফ্রণ্ট-এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চোখের সামনে দেখেছি, ভয় পাইনি কোনদিন,

তবে তুই যা বলছিস, তাতে বাধবে গৃহযুদ্ধ। সেটা ভাবনার বিষয়বস্তু বই কী—

—একথাটাও তবে ভেবে দেখাব যে সমাজ-বিপ্লব পোষাকি আন্দোলনের পথে আসে না, আসে রাজনৈতিক বিপ্লবের রক্তাক্ত পথে—তা বিশ্বযুদ্ধই হোক—বা হযুদ্ধই হোক।

ফেরার পথে ট্রামে বসে কমলের কথাগুলো মনকে অধিকার করে থাকে। চমক ভাঙে শিয়ালদার মোড়ে যানজটের কোলাহলে। ট্রামটা দাঁড়িয়ে আছে, এগুবার পথ নেই। অপেক্ষা না করে বাকি পথটা হেঁটেই হোটেলে ফেরেন। দেখেন দরজার পাশে দিলীপের স্পেশ্যাল ম্যাসেঞ্জার তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। সেলাম ঠুকে বলে—সাহেব এ চিঠিটা আপনাকে দিতে বলেছেন, আর জবাবটা আমার হাতেই দিতে বলেছেন।

চিঠিটা নিয়ে ঘরে ঢুকে জবাব লিখতে বসেন—

"দিলীপ, তোমার চিঠি পেয়ে খুবই খুশি হলাম। এতদিন পর দীপালিকে খুঁজে পাবার একটা সূত্র পেয়েছি, সেটাই আমার পরম সৌভাগ্য।

যাই হোক তুমি লিখেছ প্রধান প্রধান দৈনিক কাগজে ছবিটা ছাপালে অনুসন্ধানের পথ অনেকটা সুগম হতে পারে এবং তার জন্যে আমার অনুমতি চেয়েছ। কিন্তু আমার মন বলছে এমন একটা কলঙ্ক দীপালির অতীত জীবনের সঙ্গে আছে যা অনেকবার সে নিজেই বলতে চেয়েছে, কিন্তু আমিই তাকে বলতে দিই নি। বলেছি অতীত নিয়ে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি চাই বর্তমানই শুধু আমাদের চিরসুন্দর হয়ে বেঁচে থাক। সে তখন গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত সকরুণ একটা দৃষ্টি নিয়ে, যে দৃষ্টির ভাষা আমি বুঝতে পারি নি।

খবরের কাগজে ছবি বেরুলে তারও নজরে পড়বার খুবই সম্ভাবনা। তখন সে হয় তো চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাবে।

অনুসন্ধানটা তাই গোপন সূত্রেই চলুক, যেটা তোমাদের পুলিশ বিভাগের পক্ষেই সম্ভব।

কাল সন্ধ্যায় তোমার ওখানে যাব। সম্ভব হলে কমলকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। আশা করি, তুমি থাকবে। যাবার আগে টেলিফোন করে জেনে নেব। ধন্যবাদ—ইতি ৩০।৪।৪৬

গৌতম।

দিলীপের ম্যাসেঞ্জার চলে যেতেই হোটেলের বয় এসে খবর দেয়—আপনার টেলিফোন। নিচে গিয়ে টেলিফোনে সাড়া দিতেই ওপার থেকে কমল বলে—তোকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ব্যাপারটা অবশ্যি তুই জানিস্। আজ বিকেলে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক-এ শা'নওয়াজ ও মেহবুব-এর নাগরিক সম্বর্ধনা। তুই তো নিশ্চয়ই যাচ্ছিস্, আমিও যাব, আমাদের পার্টি কাগজের প্রেস রিপ্রেজেন্‌টেটিভ হয়ে। প্রেস গ্যালারীতে থাকব। সভাতে আমার সঙ্গে দেখা করিস্।

—ঠিক আছে আমারও প্রয়োজন আছে তোর সঙ্গে। তুই টেলিফোন না করলেও আমিই করতাম।

—কী প্রয়োজন ?

—সে তখনই বলব—বলে ফোনটা ছেড়ে দেন ডাঃ চৌধুরী।

সভা শুরু হবে সাড়ে পাঁচটায়। দুপুর থেকেই শ্রদ্ধানন্দ পার্ক লোকে লোকারণ্য। পাঁচটায় পার্ক-এ গিয়ে দেখেন তিল ধারণের জায়গা নেই। ভিড় ঠেলে কোনরকমে প্রেস গ্যালারীর ঠিক পেছনটায় দাঁড়াবার মত একটু জায়গা করে নেন ডাঃ চৌধুরী।

সওয়া পাঁচটা নাগাদ অশ্বপৃষ্ঠে শা'নওয়াজ ও মেহবুব আমহার্স্ট স্ট্রীটে সামনের গেটে এসে পৌঁছুন। পেছনে বিরাট মিছিল।

জনতার স্বতঃস্ফূর্ত জয়ধ্বনি—নেতাজী জিন্দাবাদ, শা'নওয়াজ-মেহবুব জিন্দাবাদ—জয় হিন্দ্।

জনতার মাঝখানে রাস্তা করে নিয়ে দুপাশে স্বেচ্ছাসেবক দল দাঁড়িয়ে যায় হাতে হাত মিলিয়ে। ধীরে ধীরে দু'হাত তুলে জনতার

অভিবাদন গ্রহণ করেন শা'নওয়াজ ও মেহবুব। মঞ্চে তাঁদের বসিয়ে দেয় স্বেচ্ছাসেবকেরা।

বিধানসভার স্পীকার সৈয়দ নৌসের আলি সভাপতি, আর কলকাতার মেয়র প্রধান অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির নির্দেশে সভার কাজ শুরু হয়; কাজী নজরুল ইসলামের "শিকল পরা দল, আমাদের শিকল পরা দল" গানটি দিয়ে।

সভাশেষে প্রেস গ্যালারীতে গিয়ে কমলকে বলে—দিলীপের চিঠিটার কথা। ঠিক হয় দু'জনে মিলেই দিলীপের ওখানে যাবে কাল সন্ধ্যার পর।

সে রাতটা ভীষণ গুমোট। শেষ রাতের দিকে সবে ঘুম আসছে এমনি সময় কে একজন দরজা ধাক্কাতে শুরু করে। একবার নয়, দু'বার নয়—বারবার প্রচণ্ড আঘাত।

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলেন—হু ইজ্ দ্যাট্?

জবাব আসে—কণ্ডাক্টার গার্ড স্যার। প্লীজ্ ওপেন্ দ্য ডোর।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দরজাটা খুলতেই হয়।

গার্ড-এর সঙ্গে ঢোকেন এ্যাটাচি কেস হাতে মধ্যবয়সী অপর এক ভদ্রলোক।

যথারীতি মাপ চেয়ে নিয়ে গার্ড বলেন—এ ভদ্রলোকও কলকাতা যাচ্ছেন। ওপরের বার্থটা খালি। আশাকরি আপনার কোন আপত্তি নেই।

—দ্যাট্‌স্ অলরাইট্, বলে মুখ ফিরিয়ে নেন ডাঃ চৌধুরী।

—মেনি থ্যাংক্‌স্, বলে ওপরের বার্থ-এ উঠে এ্যাটাচি কেস্‌টায় মাথা রেখে সটান শুয়ে পড়েন ভদ্রলোক।

—এটা কোন্ স্টেশন? মুখ ফিরিয়ে গার্ডকে জিজ্ঞাসা করেন ডাঃ চৌধুরী।

—চক্রধরপুর।

গার্ড নেমে যেতেই দরজার ল্যাচটা এঁটে দেন ডাঃ চৌধুরী।

॥ উনিশ ॥

পরদিন দুপুরের খাওয়া সেরে ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে সিলিং ফ্যানটা জোরে চালিয়ে শুয়ে পড়েন ডাঃ চৌধুরী। রাতভোর অনিদ্রার ক্লান্তিতে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে যান।

ঘুম ভাঙে কমলের ডাকে। জোরে ধাক্কা মেরে কমল বলছে—ওঠ্ শীগগির, এখুনি বেলেঘাটা যেতে হবে।

—বেলেঘাটা? অবাক হয়ে উঠে বসেন ডাঃ চৌধুরী। প্রশ্ন করেন—আজ না দিলীপের ওখানে যাবার কথা?

—সে আমি দিলীপের সঙ্গে টেলিফোন-এ ঠিক করে নিয়েছি। ওর ওখানে যাব কাল সন্ধ্যায়।

হোটেল থেকে বেশি দূর নয়। হেঁটেই চলে যায় দুই বন্ধু। দক্ষিণ শহরতলী রেল লাইনের ওভারব্রীজটা পার হয়ে খানিক দূর এগিয়েই তর্‌তর্ করে সদর রাস্তা থেকে খানিকটা নেমে যায় কমল। পিছু পিছু ডাঃ চৌধুরী। সামনের বস্তিটায় ঢুকবার মুখেই রুমাল দিয়ে নাকটা চেপে ধরেন। বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসের সঙ্গে।

কমল কৌতুক অনুভব করে। বলে—দাঁড়ালি কেন, ভিতরে চল্।

যেতে যেতে চারদিকে তাকান আর ভাবেন—প্রাসাদ নগরী কলকাতার আনাচে-কানাচে অনেক বস্তি ছড়িয়ে আছে। তার সংখ্যা কত, কী তার পরিবেশ কিছুই জানেন না তিনি।

কমল বলে—কবে সেই ১৯২১ সালে বলেছিলি, তুই দেশকে

ভালবাসিস্। সেই দেশটার সত্যিকারের রূপটা যে কী তা নিজেই দেখে নে আজ। এখানে যারা থাকে সে জাতের মানুষই সারা ভারতের লোক সংখ্যার আশি শতাংশ। দেখে নিয়ে বল, এই পোড়া দেশের পোড়া মানুষগুলোর সেবাই তুই করবি, না প্রাসাদ নগরী কলকাতার প্রাসাদবাসীদের সেবা করে নিজেকে ধন্য মনে করবি ?

ডাঃ চৌধুরীর মুখে কথা নেই। শুধু দেখেন কাঁচা নর্দমা যা দিয়ে বয়ে চলেছে যত রাজ্যের নোংরা আর কর্দমাক্ত ময়লা জল। দু'ধারে সারি সারি খোলার ছাউনি দেওয়া ছোট্ট ছোট্ট ঘর। তাতেই রান্না-খাওয়া-শোয়া সবই চলে। দরমার বেড়া আছে কী নেই। যা আছে তাও ভেঙে-চুরে চৌচির। ক্ষুধার্ত মানুষের মরিয়া হয়ে ঘর বাঁধবার এক করুণ ছবি।

ডানে-বাঁয়ে কয়েকটা গলি পেরিয়ে একটা দরজায় টোকা মেরে কমল ডাকে—রিয়াজুদ্দিন ঘরে আছ ?

ভেতর থেকে সাড়া আসে—দরজা খোলাই আছে। ভেতরে আসুন, কমলদা।

ভেতরে মাদুর একটা পাতাই ছিল। রিয়াজুদ্দিন তাদের সম্বর্ধনা জানিয়ে ছোট্ট আর একটা আসন নিয়ে বসে।

কমল বলে—এত জরুরী তলব কেন ? পাশে বসা ডাঃ চৌধুরীকেও রিয়াজুদ্দিন-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

রিয়াজুদ্দিন বলে—হপ্তা দু'য়েক হল, পিক্লু নামে এক কুখ্যাত গুণ্ডা আমাদের বস্তিতে এসে আশ্রয় নেয়।

পিক্লু নামটা শুনেই চমকে উঠেন ডাঃ চৌধুরী। কমলের হাঁটুতে একটা চাপ দেন। কমল ফিরে তাকায় এবং মাথা নেড়ে জানায় সেও বিস্মিত।

—কোথাকার লোক সে ? রিয়াজুদ্দিনকে প্রশ্ন করে কমল।

—বিহারের। আমাদের বস্তিবাসী মুর্তজার ফুফা। আমরা

প্রথমটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু কয়েকদিন হল লক্ষ্য করি বস্তিবাসীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য। দু'একজন আমাকে আকারে ইঙ্গিতে বলে—হিন্দুঁদের এখান থেকে সরিয়ে দিতে। স্বয়ং মুর্তজা এসে আমাকে বলে—চাচা, পিক্‌লুটা সবাইকে উস্‌কাচ্ছে। কী করি বল তো?

—আমি বল্‌লাম—তাড়িয়ে দে।

—তা' হলে আমাকেই, হয় তো মেরে ফেলবে। আগে বুঝতে পারি নি, ও এতবড় হারামী।

—পিক্‌লুর সঙ্গে আমি নিজে একবার কথা বলতে চাই, বলে কমল।

—সে এখন ক্যাম্পবেল হাসপাতালে।

—সেখানে কেন?

—শুনেছি গতকাল সে রাজাবাজারে গিয়ে ছোট্ট-খাট্টো একটা দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছিল। পুলিশকে দু' রাউণ্ড গুলিও ছুঁড়তে হয়েছিল। সেই গুলিতে আহত হয়ে পিক্‌লু এখন হাসপাতালে।

—বেশ এখানকার কথাবার্তা সেরে সেখানে যাব। এবার বল, এখানকার পরিস্থিতিটা কী রকম।

—খুবই গরম। মাথা গরম কিছু কিছু ছেলে বলছে পিক্‌লু মারা গেলে তারা বদলা নেবে এখানে।

কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভেবে নেয় কমল। তারপর বলে—চল বস্তিটা একবার ঘুরে ফিরে দেখে নিই।

ডাঃ চৌধুরীও যন্ত্রচালিতের মত তাদেব সঙ্গ নেন। পিক্‌লু নামটা যেন তার সব চেতনা কেড়ে নিয়েছে।

কমলের আগমনবার্তা ততক্ষণ সারা বস্তিটায় ছড়িয়ে পড়েছে। সরু গলিটা পেরিয়ে গেলেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানটায় সবাই জড় হয়েছে। তাদের চোখে-মুখে ভীতি ও আতংকের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কমল দাঁড়িয়ে সবাইকে একনজরে দেখে নেয়। তারপর বলে—

"ভাই ও মা বোনেরা, রাজাবাজারের দুঃখজনক ঘটনা যাতে এখানেও না ঘটে তারই জন্যে ছুটে এসেছি আপনাদের কাছে। আমাকে এবং আমার সাথী আরও অনেক ছেলেকে আপনারা জানেন। আর এও আপনারা জানেন আপনাদেব যে কোন বিপদে আপদে আমরাই এসে পাশে দাঁড়াই। তাই, আমার ও তাদের সকলের হয়ে শুধু একটিমাত্র অনুরোধ জানাব, সবাই একবার নিজেদের, আম্মা, বিবি আর বাচ্চাদের চোখপানে চেয়ে দেখুন—বলেই চুপ করে যায় কমল।

সবাই একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে। মিনিটখানেক পর আবার বলে কমল—দেখেছেন ?

মন্ত্রমুগ্ধের মত সবাই শুধু মাথা নাড়ে।

—কী দেখলেন, উল্লাস না ত্রাস।

কেউ মুখ খোলে না, বোবা হয়ে গেছে যেন ?

পাশে দাঁড়ানো আধাবয়েসি একজনের কাঁধ ধরে ঝাঁকি মেরে জিজ্ঞাসা করে কমল—বলুন, সত্যি করে বলুন, কী দেখছেন সবাকার চোখে মুখে ?

—ত্রাস, ক্ষীণকণ্ঠে বলে লোকটা।

হঠাৎ একটা কাজ করে বসে কমল। সামনে দাঁড়ানো দুটি যুবকের সামনে বুক চিতিয়ে বলে—বদলা নিতে হয় আমার ওপর বদলা নও, দাও ছোরা বসিয়ে। তবু বদলা নিও না, মা-বোন-বাবা আর ভায়েদের ওপর—সকাল হলে যাদের মুখ আবার তোমাদেবই দেখতে হবে।

অকস্মাৎ ভাষা খুঁজে পায় জনতা। সমবেত কণ্ঠে বলে—বদলা আমরা চাই না কমলবাবু।

—বাবু নয়, বলুন—কমরেড কমল, বলুন—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।

—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি উঠে শতকণ্ঠে।

জনতাকে অসীম ধন্যবাদ জানিয়ে রিয়াজুদ্দিন ও ডাঃ চৌধুরীকে নিয়ে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ায় কমল। এতটা সময় কেটে গিয়েছে, ডাঃ চৌধুরী শুধু চিত্রার্পিতের মত তাদের অনুসরণ করেছেন। এবার বলেন—ক্যাম্পবেল-এ চল্ কমল দেরি নয়।

সহাস্যে কমল বলে—সেখানেই যাচ্ছি, চল্। তুমিও চল রিয়াজুদ্দিন পিক্‌লুকে সনাক্ত করতে হবে।

হাসপাতালে যখন পৌঁছুল তখন রাত প্রায় আটটা। সার্জিকেল ওয়ার্ড-এর সামনে যেতেই আলো-আঁধারি বারান্দাটা বেয়ে ওয়ার্ড বয় এগিয়ে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দেখে নেয়। তারপর সহাস্যে বলে—ও কমলদা? কী মনে করে?

—একটা জখমি লোককে দেখতে এসেছি। পিক্‌লু তার নাম।

—সে তো মিনিট পনেরো হ'ল মারা গেছে।

—তবু একবার দেখি, আমরা যে পিক্‌লুর কথা ভাবছি সেই কীনা।

ওয়ার্ড বয় তাদের পিক্‌লুর শয্যাপার্শ্বে নিয়ে গিয়ে সাদা চাদরে ঢাকা মৃতদেহটার মুখ থেকে নিঃশব্দে সরিয়ে নেয় চাদরটা।

কমল, ডাঃ চৌধুরী ও রিয়াজুদ্দিন এর মুখের দিকে তাকায়।

রিয়াজুদ্দিন বলে—এই তাদের বস্তিবাসী পিক্‌লু।

ডাঃ চৌধুরীও বলেন, মিড্‌ফোর্ড হাসপাতালে যে লোকটার বাঁ গালে তিনি অপারেশন করেছিলেন এই সেই লোক।

শিয়ালদা মোড়ে রিয়াজুদ্দিনকে ছেড়ে দিয়ে কমল ও ডাঃ চৌধুরী হেটেলের দিকে পা বাড়ায়।

হোটেল-এর দরজায় এসে, কমল বলে—এমন মুখ গোমড়া করে আছিস্ কেন। কাল সন্ধ্যায় তো যাচ্ছি দিলীপের কাছে। দীপা বৌদির সন্ধানের প্রাথমিক সূত্র আবিষ্কৃত হ'ল আজ। দিলীপের সাহায্যে রহস্য উদ্‌ঘাটনের পথও একটা খুলে গেল। ডোন্ট্ ওয়ারি। কাঁধে একটা মৃদু চাপ দিয়ে শিয়ালদার দিকে চলে যায় কমল।

পরদিন রাত আটটায় যেতেই দিলীপ বলে—আমার বদলির হুকুম এসে গেছে বাঁকুড়ায়।

হঠাৎ একটা বোমা ফাটলেও কমল ও ডাঃ চৌধুরী এতটা চম্‌কে উঠত না। ধপ্‌ করে ড্রইং রুমের সোফায় বসে পড়ে ছু'জন।

ডাঃ চৌধুরীর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুয় না। তিনি শুধু দৃষ্টিহীন চোখে তাকিয়ে থাকেন সামনের দেয়ালটার দিকে।

কমল জিজ্ঞাসা করে—তোর তো ছু'বছব হয় নি এখনো হাওড়ায়। তবু অকস্মাৎ বদ্‌লি কেন?

কমলের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় দিলীপ। বলে—তুই না রাজনীতি করিস্?

—হ্যাঁ, করি। কিন্তু তোব বদলিব ব্যাপারে রাজনীতি আবার কী?

—বুঝেছি, তোদের দল এখনও গদির স্বাদ পায় নি বলে কথাটা তোর মাথায় ঢুকছে না। কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ ছু'দলই সেই নিষিদ্ধ ফলের আস্বাদ পেয়েছে। তাই রাজনীতির টানা-পোড়েনটা এখন বুরোক্র্যাট্‌দের গায়েও লাগে। আমরা হাড়ে হাড়ে প্রায়ই অনুভব করি রাজনীতির প্রথম শিকার আমরাই, বাংলাদেশের মসনদে এখন মুসলিন লীগ। আর এ রাষ্ট্রতরণীর হাল ধরে বসে আছেন স্বয়ং সুরাবর্দ্দি সাহেব। আর তাঁরই হাতে রয়েছে পুলিশ দপ্তর। পাকিস্তান দাবির সংগ্রামী আন্দোলনেব প্রস্তুতি পর্ব এখন থেকেই শুরু বলেই আমার ধারণা।

—তা' বলে সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে চালাতে হবে দাবা-বোড়ের খেলা।

—রাগ করিস্ নি, এটাই তো রাজনীতিকদের ধর্ম। গদি পেলে তোরাও হয় তো এ খেলাই খেলবি। জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে খেপিয়ে তুলবি অজ্ঞ জনসাধারণকে। লাগবে মারদাঙ্গা। বাধ্য হয়ে পুলিশকে চালাতে হবে গুলি। আসবে পুলিশের বিরুদ্ধে

পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। বিরোধী পক্ষকে শান্ত করবার জন্যে বসবে কমিশন। তদন্ত চলবে মাসের পর মাস। জনসাধারণ ততদিনে ভুলে যাবে সব কিছু। ব্যস কিস্তীমাৎ। যাক্ ওসব কথা। এখন তোদের কথা বল।

অবান্তর প্রশ্নে সময় কেটে যাচ্ছে দেখে এতক্ষণ উস্খুস্ করছিলেন, ডাঃ চৌধুরী। সাগ্রহে তিনিই জিজ্ঞাসা করেন—তুই চলে গেলে দীপালি-তদন্তটা কী হবে, দিলীপ ?

—সে তুই ভাবিস্ সি। আমার জায়গায় যিনি আসছেন তিনি অবশ্যি মুসলমান, কিন্তু প্রিয়জনের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমানে কোন ভেদাভেদ নেই তাঁর কাছে। বিশেষ করে তিনি আমারই ব্যাচ-এর আই. পি এস্ এবং আমার নিকটতম বন্ধুদের মধ্যে একজন। তাকে দীপালি ফাইলটা বুঝিয়ে দিয়ে যাব। আমার বিশ্বাস তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা চালাবেন এ ব্যাপারে। তোদের সঙ্গে পরিচয় করিয়েও দিয়ে যাব তাঁকে।

ঘটনাচক্রে পিক্লুর সন্ধান পাওয়া গেছে এবং কীভাবে পাওয়া গেছে সব কথা দিলীপকে জানায় ডাঃ চৌধুরী। শুনে হাতের কাছে ফোনটা নিয়ে অপর প্রান্তে অপারেটরকে বলে—বেলেঘাটা থানা, প্লীজ। একটু পর প্রশ্ন করেন—মিঃ হোসেন—দিস্ ইজ্ গুপ্ত ফ্রম হাওড়া। কথা শেষে ফোনটা রেখে বলে—কাল বেলা তিনটেয় তোরা দুজন চলে যা বেলেঘাটা থানায়। ও সি আমায় কথা দিয়েছেন খবরাখবর নিয়ে ঐ সময় তোদের আশাপ্রদ কিছু একটা হয় তো জানাতে পারবেন।

বেলেঘাটা থানায় যেতেই ও. সি. কাদের হোসেন জানান—পিক্লু ছিল অভিলাষ সরকারের বেতনভুক মস্তান। টাকা খেয়ে অভিলাষকে মদ আর মেয়েমানুষ জোগান দেওয়াই ছিল তার প্রধান কাজ।

—অভিলাষ সরকারটি কে ?—প্রশ্ন করে কমল।

এ অঞ্চলের লক্ষপতি এক মাছের ভেড়ির মালিক। সম্পত্তিটা অবশ্যি করে গিয়েছিলেন তার বাবা। অভিলাষই তার একমাত্র উত্তরাধিকারী। ওকে নতুন কিছু আর করতে হয় নি বা করেন নি। বরং মদ আর মেয়েমানুষের পেছনে সব উড়িয়ে গেছেন।

—গেছেন মানে—তিনি জীবিত নেই ?

—না। কয়েক বছর আগে মাজদিয়া স্টেশনে ঢাকা মেল দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। শরিকি মামলায় সম্পত্তি আজ রিসিভারের হাতে।

আর কিছু জানবার নেই। দীপালিকে খুঁজে পাবার শেষ সূত্রও নিয়তির কঠিন আঘাতে যেন ছিন্ন হয়ে যায়।

ও. সি-কে ধন্যবাদ জানিয়ে হোটেলে যখন ফেরেন তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা। অনাসক্তকণ্ঠে কমলকে বলেন ডাঃ চৌধুরী—এক কাপ চা খেয়ে যা।

—চা খেতে আমার সময় অসময় লাগে না, তা তো জানিস। চ' ওপরে চ'।

চা খেতে খেতে আবার বলে—এমন করে চুপ করে থাকিস্ নি। আমি মনে করি, আকস্মিকভাবে যখন পিকলু আর অভিলাষের সন্ধান পাওয়া গেছে, তখন এমনি আকস্মিকভাবেই একদিন না একদিন বৌদি'রও সন্ধান মিলে যাবে।

—জোর করে ঠোঁটের কোনে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে ডাঃ চৌধুরী বলেন—তুই দেখছি একজন কন্‌ফার্‌মড অপ্‌টিমিস্ট—

—হোপ্ রাইজেস্ এটারনেল্ ইন্ হিউমেন ব্রেস্ট। শুধু তাই নয়, আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, অপ্‌টিমিজম্ পেইজ ইন্ দ্য লং রান। আর এই বিশ্বাসই দেশে দেশে মার্কসিস্টদের শত অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যাবার রসদ যোগাচ্ছে।

—আমি যদি তাই হতে পারতাম—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লেন ডাঃ চৌধুরী।

—চেষ্টা করে যা—একদিন না একদিন পারবি।

কমল চলে যায়। ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দেন ডাঃ চৌধুরী। ঘরের কোণটায় একটা মাকড়সা নিরলস জাল বুনে চলেছে। ওদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ভাবেন—চেষ্টা করে যা—একদিন না এক-দিন পারবি।

॥ বিশ ॥

সকালবেলা বিছানা ছেড়ে উঠবার সব আগ্রহ যেন হারিয়ে ফেলেছেন ডাঃ চৌধুরী। দীপালিকে খুঁজে বেড়াবার সব দরজাই আজ বন্ধ। কর্মহীন জীবন কাটাবার পথও কিছু নেই, একমাত্র প্রাইভেট্ প্র্যাক্‌টিস ছাড়া। কলকাতার মত এত বড় শহরে তারই বা সুযোগ কোথায়। মূলতঃ তিনি একজন সার্জন। এদেশে সার্জনের প্রাইভেট্ প্র্যাকটিশ খুবই সীমিত, দু'একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া। দীপালিকে খুঁজে বেড়াবার এ যেন আব একটা অন্ধগলি।

—কমলের ডাকে উঠে বসেন। বলেন, তুই এত সাত সকালে?

—কাল যখন চলে গেলাম মনে হল তুই তখন নৈরাশ্যের অতল গহ্বরে ডুব দিয়েছিস। ভোরবেলা মনটা উস্‌খুস্ করছিল, তাই চলে এলাম।

—বেশ করেছিস। বোস তুই আমি চোখ মুখটা ধুয়ে আসি। বাথরুমে যাবার মুখে হোটেল বয়কে ডেকে দু'কাপ চা ও টোস্ট দিয়ে যেতে বলে।

চায়ে চুমুক দিয়ে কমল বলে—আমি যাবার সময় তুই যেন বিড়বিড় করে কী বলছিলি বল?

—কই তেমন কিছু বলেছি বলে তো মনে পড়েনা?—একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে বলে—ওঃ হ্যাঁ, আমি ভাবছিলাম তোর মত অপ্‌টিমিস্ট যদি হতে পারতাম। আর হয়তো তোর শেষ কথাটাই বিড়বিড় করে বলছিলাম—

—তা আর এমন শক্ত কী? একটু চেষ্টা আর অভ্যাস করলেই হয়ে যাবে।

—কেমন করে হবে তাও তো বুঝি না। এই তো একটু আগেই শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, অতীতটা গেছে, এবার ভবিষ্যৎটাও অন্ধকার।

—অন্ধকার কেন?

দীপালিকে খুঁজে বের করবার আশা ছেড়ে দিয়েছি। এবার ভাবছি জীবনটা তো কর্মহীন হয়ে গেল। খাব কি?

—কেন, প্রাইভেট্ প্র্যাক্টিসে লেগে যা—

—তারই বা স্কোপ কোথায়? এদেশে ফিজিসিয়ন্ ছাড়া প্রাইভেট্ প্র্যাক্টিস্ জমানো যায় না। আমি তো সার্জন।

—ম্যাটেরিমেডিকার বইটা খুলে বোস্, সব হয়ে যাবে। কী এমন শক্ত, তোর মত ট্যালেন্টেড্ একটা মানুষের কাছে? প্রথমটা হয় তো বেশি রুগী আসবে না। পার্টি সোর্সে আমিও রুগী জোগাড় করে দেব দুটো একটা। তারপর দেখবি ক্রমে ক্রমে ভিড় জমে যাবে। এই পোড়াদেশে চিকিৎসার অভাবে কত মানুষ বছরে মারা যাচ্ছে তার হিসেব কেউ রাখে? অথচ একটাকা দু টাকা দিয়ে যদি ডাক্তার পাওয়া যেত মৃতের সংখ্যা অন্ততঃ অর্ধেক নামিয়ে আনা যেত না কী?

কমলের কথায় ডাঃ চৌধুরী অভিভূত হয়ে পড়েন। আবেগভরে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেন—পূর্বজন্মে তুই আমার কে ছিলি কমল?

কমল ডাঃ চৌধুরীর কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলে—নো সেন্টিমেন্ট, প্লিজ! আমি কমিউনিস্ট্, পূর্বজন্ম-টন্ম জানি না। শুধু জানি, তুই আমার নিকটতম বন্ধু। বন্ধু হিসেবে আমার একমাত্র কর্তব্য তোকে অবসাদের গ্রাস থেকে টেনে এনে একজন সক্রিয় সমাজসেবীর আসনে বসিয়ে দেওয়া, এ প্রচেষ্টা একেবারে স্বার্থহীন তা ভাবিস্নি। অগণিত বস্তিবাসী সর্বহারা মানুষ অপেক্ষা করছে

তোরই মত একজন একনিষ্ঠ ডাক্তারের জন্য। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই আমার একথার তাৎপর্য বুঝতে পারবি।

—কী রকম ?

—কাগজে নিশ্চই দেখেছিস্ বম্বের এক জনসভায় মিঃ জিন্না হুঙ্কার ছেড়েছেন মুসলিম লীগের একমাত্র দাবী 'পাকিস্তান'। হয় ভারত ভাগ হবে, নয় ভারত ধ্বংস হবে। এই দাবী আদায় করবার জন্যে আগামী ১৬ আগস্ট সারা ভারতবর্ষে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করবে। এক কথায়, এ আহ্বান গৃহযুদ্ধের আহ্বান। তারই পাদপূরণ হিসেবে লক্ষ্ণৌতে কে একজন বলেছেন—যদি সত্যিকারের 'ফায়ার ওয়ার্কস্' দেখতে চাও তাহলে সেদিন কলকাতা যেও। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রামেব কুরুক্ষেত্র হিসেবে কলকাতাকেই বেছে নিয়েছে মুসলিম লীগ। আমাব মনে হয় সেদিন থেকে কলকাতার বস্তিতে বস্তিতে তোবই মতন অজ্ঞাত অখ্যাত সার্জন-কাম ফিজিসিয়ানের প্রয়োজন দেখা দেবে সব চেয়ে বেশি। আজ এখন চলি, কাল সকালে ডেকার্স লেন-এ আসিস্, আবও কথা হবে।

কমল চলে গেলে ডাঃ চৌধুরীব চোখটা আবার ফিরে যায় দেয়ালের কোণে সেই মাকড়সার জালটাব দিকে। ভাবেন, যুগ যুগান্ত ধরে মানুষ এমনি কবেই জাল বুনে চলেছে নিজের চারপাশে। সেটা নিজ হাতেই ধ্বংস না করলে তার মুক্তি নেই। গান্ধী, জওহরলাল, জিন্না সবাই নিমিত্তমাত্র—শুধু আবেদন বা হুংকাবধ্বনি শোনাবাব গ্রামোফোন রেকর্ড, যে রেকর্ড বেজে চলেছে অবিরাম।

পরদিন ডেকার্স লেন-এ যেতেই কমল বলে—তোব বসবাব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বউবাজাব অন্নদা মেডিকেল স্টোর্স-এ। রোজ সকাল আটটা থেকে বারোটা, বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা। রুগী-প্রতি দু' টাকা ফি—চল, তোকে বসিয়ে দেবার ব্যবস্থাটা পাকা করে আসি।

শুরু হয় নতুন কর্মজীবন। কলকাতার রাস্তাঘাট প্রকম্পিত

করে মিছিলের পর মিছিল চলে। স্লোগানের পর স্লোগান উঠে। একদিক থেকে ভেসে আসে—'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, পাকিস্তান জিন্দাবাদ।" অপরদিক থেকে জবাব আসে—বন্দে মাতরম্। জয় হিন্দ্।

অবসরের ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার দিকে তাকিয়ে মিছিলের প্রবাহ দেখেন আর ভাবেন—মহাত্মা গান্ধীর ভারতবর্ষে, নেতাজির ভারতবর্ষে এ কোন ধ্বংসের পথযাত্রী আজ! একজনের কণ্ঠ উন্মত্ত জনতার প্রগলভ চীৎকারে চাপা পড়ছে, আর একজনের কণ্ঠ চিরতরে নীরব। "হে মোর দুর্ভাগা দেশ"—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সামনে দাঁড়ানো রুগীর দিকে নজর দেন ডাঃ চৌধুরী।

দেখতে দেখতে ক্যালেণ্ডার-এর পাতায় দেখা দেয় ১৬ই আগস্ট। সকাল থেকেই আকাশে বাতাসে একটা শঙ্কার আভাষ। চলমান যানবাহনগুলো তাদের সরব ধ্বনি হারিয়ে ফেলেছে। চলছে ধীরগতিতে, পাছে একটা এ্যাকসিডেন্টকে উপলক্ষ্য করেই না শুরু হয় প্রলয় নাচন। অফিসযাত্রীরা সচকিতভঙ্গীতে চলেছে ডালহৌসির দিকে। সকলেরই মনে সন্দেহ সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরা যাবে কী না। বিকেল পাঁচটায় ময়দানে মুসলিম লীগ আহ্বায়িত জনসভা। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেওয়া হবে সেই সভায়।

ডিস্পেন্সারিতে রুগী দেখছেন ডাঃ চৌধুরী। সন্ধ্যা ছ'টায় টেলিফোনটা বেজে উঠে। তুলে নিতেই ওপার থেকে কমল উদ্বেগের কণ্ঠে বলে—ধরম্তলায় লুঠপাঠ, অগ্নিসংযোগ শুরু হয়েছে। তাড়াতাড়ি ডিস্পেন্সারি বন্ধ করে দিয়ে হোটেলে চলে যা। সেখানে পৌঁছে আমাকে একটা টেলিফোন করবি।

হোটেলে ফিরে দেখেন লক্ষ্মী ব্যাংক-এর কর্মী ভূপতিবাবুকে ঘিরে চলছে এক উত্তেজিত জটলা। তিনি বলছেন অফিসের জানালায় দাঁড়িয়ে তিনি ময়দানের সভাটা দেখছিলেন। বক্তারা কী বলছেন

কিছুই শোনা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু প্রায় লাখো খানেক জনতার সবাই হাত-পা ছুড়ছে আর ঝাণ্ডা হাতে লাফাচ্ছে। সভা ভাঙ্গতেই চীৎকার চেঁচামেচি। সবাই এগিয়ে যায় ধরমতলার দিকে। মোড়ের মাথায় মস্‌জিদটার কাছে এসেই কী তাণ্ডব নৃত্য আর ধ্বনি—লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। একদল পুলিশ ট্রাম গুমটিটার কাছে দাঁড়িয়ে শুধু তামাশা দেখছে। বোমার পর বোমা ফাটছে। দেখা যায় চাঁদনি-চকের দিক থেকে একরাশ কালো ধোঁয়া আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে; আগুনের শিখাও দেখা যায়। আর্ত মানুষের চীৎকারে আর জনতার কোলাহলে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠছে। পুলিশ পার্টি তবু নিশ্চল দাঁড়িয়ে প্রস্তরীভূত দেয়ালের মত।

হাঁপাতে থাকেন ভূপতিবাবু। ম্যানেজারবাবু এক গ্লাস জল এগিয়ে দেন। একচুমুকে পুরো জলটা নিঃশেষ করে ম্যানেজারবাবুকে বলেন—আমার বিলটা আজ রাতেই মিটিয়ে নিন দীনেশবাবু, থাক আমার চাকুরী—প্রাণটা নিয়ে রাত ১১টার ট্রেনেই আমি দেশে চলে যাব।

সবাই শান্ত হয়ে যার যার ঘরে ফিরে গেলে কমলকে টেলিফোন করেন ডাঃ চৌধুরী। কমল বলে—তুই ডালহৌসী ঘুরে কাল সকালেই আমাদের অফিসে চলে আয়।

—তা' হয় না। বলেন ডাঃ চৌধুরী।

—কেন হয় না?

—হোটেলে যদ্দিন একটি লোকও থাকবে, আমিও তদ্দিন এখানেই আছি।

—বেশ, তোর সুবিধে মতই আসিস্, তবে টেলিফোনে যোগাযোগটা রাখতে ভুল করিস্ নি।

দ্বিতীয় দিনে হোটেল ফাঁকা হয়ে যায়। সবাই চলে গেছে একমাত্র ডাঃ চৌধুরী, ম্যানেজার আর হোটেলের কয়েকজন কর্মী ছাড়া। সন্ধ্যাবেলা ম্যানেজারবাবু জানান, মালিক টেলিফোনে

নির্দেশ দিয়েছেন পনেরো দিনের জন্যে হোটেল বন্ধ করে দিতে। সুতরাং এ সুযোগে তিনি ও অন্যান্য কর্মীরা দেশে চলে যাবেন।

—আপনারা সব যাবেন কখন ?

—কাল সকালে।

—বেশ, আমিও তাই যাব।

প্রথম দিন আকস্মিক আক্রমণে হতচকিত হিন্দু জনতা রুখে দাঁড়ায় দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে। শুরু হয় আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণ। ডেকার্স লেন-এর টেলিফোনটার বিরতি নেই। কমল সর্বসময়ের জন্যে তার কাছেই বসে থাকে, পাশে ডাঃ চৌধুরী। খবর আসছে সারা কলকাতা উভয়পক্ষের উন্মত্ত জনতায় ছয়লাপ। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, কারও প্রাণ বা ঘর-বাড়ী কিছুই বাদ নেই, সেই আক্রমণ থেকে। পুলিশ বে-সামাল। সুরাবর্দ্দির সাকৃরেদ কুখ্যাত গুণ্ডা মীনা পেশোয়ারী পুলিশ ভ্যানের নিরাপদ আশ্রয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেখানে সেখানে। হাট-বাজার, দোকান-পাট সব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আকাশের দিকে লেলিহান জিহ্বা বাড়িয়ে দিচ্ছে অগ্নিশিখা, ছড়িয়ে পড়ছে কালো ধূম্রজাল। সুন্দরী কলকাতা বিবস্ত্রা, ধর্ষিতা নারীর মত বোবা-কান্নায় যেন মাটিতে মিশে যেতে চায়।

তিন দিন, তিন রাত্রির পর দেখা যায় রাস্তায় রাস্তায়, বস্তিতে বস্তিতে শুধু মৃতদেহের ছড়াছড়ি। সুরাবর্দ্দি বুঝতে পারেন কলকাতার ফায়ার ওয়ার্কস্ যতটা একতরফা হবে ভেবেছিলেন ততটা একতরফা নয়। বৃটিশ লেবার পার্টির লাটসাহেব যিনি কলকাতা এসেই হালকা সুরে বলেছিলেন, "দ্য আদার গভর্ণরস্ নিউ হান্টিং এ্যাণ্ড সুটিং, আই নো অন্‌লি সান্টিং এ্যাণ্ড হুটিং। হোয়াট্ সর্ট অব এ গভর্ণর স্যাল আই বী"—এ হেন লাটসাহেবরও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। শহরকে তুলে দেওয়া হয় মিলিটারির হাতে। সুরাবর্দ্দি,কংগ্রেস নেতা শরত বসুকে আহ্বান জানান,শহর পরিক্রমার

জন্তে মিলিত শান্তি মিছিল নিয়ে' নির্দ্বিধায় এগিয়ে আসেন শরতবাবু।

চতুর্থ দিনে বেরোয় শান্তি মিছিল। সেদিনই সাহসে ভর করে বাবুঘাটে বসেন ডাঃ চৌধুরী, একটু মুক্ত বাতাসে বিনিদ্র রজনীর অবসাদ কাটানোর আশা নিয়ে। কিন্তু কোথায় গেল গঙ্গার সেই ক্লান্তিহরণ নির্মল বাতাস? তার বুকের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে ঢাউস ঢাউস শবদেহ। পর পর পঞ্চাশ গুণে দুর্গন্ধে ওয়াক্ করে মুখ ফেরাতে হয়। ফোলা-ফাঁপা দেহগুলো ঠুক্রে ঠুকরে খাচ্ছে অগণিত কাক-শকুন। মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন উড়ছে। প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন মিঃ জিন্না তাঁর সদম্ভ উক্তি—উই স্যাল হ্যাভ্ ইণ্ডিয়া ডিভাইডেড্ অর্ ইণ্ডিয়া ডেস্ট্রয়েড্। কলকাতার বুকে যে ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তারপর আর অখণ্ড ভারতের কল্পনা আকাশকুসুম রচনার মতই অবাস্তব স্বপ্ন। আর এখানে বসা চলে না। দুর্গন্ধে নাড়ি-ভুড়ি বেরিয়ে আসছে। ডেকার্স লেন-এ ফিরে যান ডাঃ চৌধুরী।

ছয় সহস্র নিরীহ মানুষের মৃত্যু ও বহুমূল্য ধনসম্পত্তি ধ্বংসের বিনিময়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত কলকাতার নাগরিকদের জীবনে ধীরে ধীরে ফিরে আসে দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিক কর্মধারা। হ্যারিসন রোড-এ হোটেলও খোলে। একে একে সবাই আবার ফিরে আসেন।

নজিরবিহীন পাইকারী এই গণহত্যার নৃশংসতায় বৃটিশ মন্ত্রী-সভারও টনক নড়ে। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল-এর উপর নির্দেশ আসে প্রত্যাখ্যাত কেবিনেট মিশ'নর সুপারিশ নিয়ে অন্তঃসারশূন্য আলোচনা বন্ধ করে দিতে। পরিবর্তে আপ 'ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিয়ে একটা অন্তবর্তী সরকার গঠন করা যায় কি না তার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে। অনেক বৈঠক আর অনেক আলোচনার পর তাই করা হয় সমহারে দুপক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে—প্রধান মন্ত্রী

জওহরলাল নেহরু, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল, অর্থমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁ। অন্যান্য দপ্তরও সমসংখ্যক হারে উভ-দলীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

কিছুদিন যেতে না যেতেই অভূতপূর্ব এই রাষ্ট্রতরণীর টাল-মাটাল অবস্থা। একপক্ষ যদি সামনে টানেন দাঁড়। অপরপক্ষ পেছনে মারেন উল্টোদিকে লগি। কংগ্রেস মন্ত্রীদের অর্থ বরাদ্দের দাবী অম্লানবদনে প্রত্যাখ্যান করেন অর্থমন্ত্রী। ওয়াভেলকে প্রতিপদে প্রয়োগ করতে হয় তাঁর বিশেষ ক্ষমতা। সে এক সকরুণ অবস্থা! যা' কল্পনা করে কে একজন বলেন—মাচ্ হ্যারাস্ট্ গভর্নর জেনারেল।

সকালবেলা খবরের কাগজে কৌতুকাবহ ও চাঞ্চল্যকর সব সংবাদ পড়ছিলেন ডাঃ চৌধুরী। হঠাৎ খেয়াল হল আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবরে তো মেতে আছেন, এদিকে তাঁর নিজস্ব ভাণ্ডার যে বাড় বাড়ন্ত। ডিস্পেন্সারিতে বসে যা পান তাতে সব খরচ কুলোয় না। সঞ্চয় তেমন কিছু নেই। মনে পড়ে চাটগাঁয়ে সেই ছেড়ে আসা বাড়িটার কথা, ১৯৪০ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার পর আর কোন খোঁজ খবর রাখতে পারেন নি। মুহূর্তে মন ঠিক করে নিচে গিয়ে টেলিফোন করেন কমলকে। বলেন, তিনি চাটগাঁ যাবেন বাড়িটার বিলি ব্যবস্থা করতে। কমল বলে, তথাস্তু। সেও অনেকদিন দেশে যায় নি। সেও যাবে। অনেকদিন দাদা বৌদির সঙ্গে দেখা হয় নি। তাঁরা প্রায়ই লিখছেন একবার যাবার জন্যে। তবে এখনই না গিয়ে পূজোর ছুটিতেই যাওয়া ভাল।

—বেশ, তাই ভালো। এক সঙ্গে দুজন যাব। দীর্ঘ জার্নিটা জমবে ভাল—বলেন ডাঃ চৌধুরী।

॥ একুশ ॥

গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুরগামী স্টিমার সবেমাত্র বহর স্টেশন ছেড়ে পদ্মার বুকে গা ভাসিয়েছে। শরতের বেলাশেষের মৃদুমন্দ হাওয়ায় আন্দোলিত পদ্মানদীর শুভ্র জলরাশি তরঙ্গায়িত হয়ে ছুটে চলেছে সাগর সন্ধানে। অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভা সেই তরঙ্গে বিচ্ছুরিত হয়ে যেন একটা মায়াপুরীর স্বপ্নজাল বুনে চলেছে। সামনের দিকে প্রথম শ্রেণীর ডেকটায় পাশাপাশি ছুটো ডেক চেয়ারে চুপ করে বসে ছুই বন্ধু সেই তরঙ্গ আর রক্তরাঙ্গা পড়ন্ত রোদের চিক্‌মিকি খেলা দেখতেই মগ্ন। ডাঃ চৌধুরীর মনে পড়ে বহু বছর আগেকার কথা। মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হবার জন্যে সেদিন তিনি চাটগাঁ থেকে ঢাকা যাচ্ছিলেন। সেটা ছিল সকালবেলা, সূর্য সবে পূব গগনে উঁকি মেরেছেন। সেই সকালেও উদীয়মান সূর্য পদ্মা মেঘনার সঙ্গমস্থলে এমনি আরেক মায়াজাল বিছিয়েছিল। প্রকৃতির একই খেলা। মানুষের জীবনেও বুঝি এমনিতর একই অনুভূতি চক্রাকারে ঘুরে বেড়ায়—পরিবর্তনশীল এই জগতে।

—কী ভাবছিস, গৌতম ?

—তুই কী ভাবছিস।— পাল্টা প্রশ্ন করেন, ডাঃ চৌধুরী।

ভাবছি, প্রকৃতির এই রূপ দেখবার ভাগ্য কটা মানুষের ভাগ্যে জোটে, ছু'চারটা অর্থবান ব্যক্তি ছাড়া ?

—মাই গড্, ঢেউ আর সূর্যরশ্মির চিক্‌মিক্ খেলার স্বপ্নরাজ্যেও তোর সেই বিত্তবান আর বিত্তহীনদের কী টেনে না আনলেই নয় ?

—তোর কাব্যজগৎ নিয়ে তুই থাক্, আমি চললুম তৃতীয় শ্রেণীর ডেক-এ—বলে কমল পেছন দিকে পা বাড়ায়।

—কাব্যে এত অরুচি কেন, তোদেব সুকান্ত কাব্য লেখে না? মানিক গল্প লেখে না?

—হ্যাঁ লেখে, কিন্তু সুকান্তর চোখে পূর্ণিমার চাঁদ ঝল্‌সানো রুটি, ঢেউ আর সূর্যবশ্মির চিক্‌চিক্ খেলা নয়। সেই ঝলসানো রুটির কবিতা যে ক্ষুধার্ত জনতার কথা ভেবে সে লিখেছে, তাদেরই দেখবার জন্যে যাচ্ছি আমি খোলা ডেক্-এর চত্বরে—বলেই দুপ্‌দাপ্ করে চলে যায় কমল।

সামনের ডেক্-এ বসবাব ব্যাপারটা নিয়ে গোয়ালন্দ স্টেশনেই দুজনে তুমুল তর্ক বেধেছিল। স্টিমারে উঠেই ডাঃ চৌধুবীর খেয়াল হয় দোতলায় সামনেব ডেক্-এ না বসলে এ পথে স্টিমার জার্নির পুরো আনন্দটা উপভোগ কবা যায় না। প্রস্তাব কবেন অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে চাঁদপুর পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটবার। কমলেব প্রবল অপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাই কবেন। গোমড়া মুখে সারাদিনটা একতলা দোতলা কবেই কাটিয়ে দেয় কমল। বেলাশেযে জোর কবে ধরে এনে তাকে পাশের ডেক্ চেয়ারটায় বসিয়ে দেন ডাঃ চৌধুরী। কিন্তু বেশিক্ষণ এ আরাম তার সইল না। ছুটে বেরিয়ে গেল। চাঁদপুর পৌছুতে আর কতক্ষণই বা। তাই ডাঃ চৌধুবী আর বাধা দিলেন না।

সন্ধ্যা নেমে আসে। এবাব আব মেঘনা-পদ্মার সঙ্গমস্থলে শুভ্র আর নীলজলের মিশ্রিত লীলা দেখা যায় না। পরিবর্তে চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক অপূর্ব দৃশ্য। দূরে--বহুদূরে মেঘনার জলের গা ঘেসে দেখা যায় আকাশের গায়ে তারার মত কয়েকটি আলোব বিন্দু। তরঙ্গে মিশে গিয়ে তারার মতই বিন্দুগুলো মিট্‌মিট্ করছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত সেদিকে তাকিয়ে থাকেন। চোখের পাতা নড়ে না। বিন্দুগুলো আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে আসছে। পাতালপুরী

থেকে জলপরীরা মাথায় প্রদীপ নিয়ে নৃত্যের তালে তালে রঙ্গমঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে যেন। অনেকটা উঠে এল। এবার সত্যি সত্যি হেলে দুলে নাচতে শুরু করেছে সব কটি পরী। কোথায় এলাম আমি, ইন্দ্রপুরী ?

চিন্তা জাল ছিন্নভিন্ন করে গুরুগম্ভীর স্বরে স্টিমারটা হাঁকে—ভোঁ—ভোঁ। চমক ভেঙ্গে দেখেন মেঘনা থেকে ছোট্ট নদীটার দিকে বাঁক নিচ্ছে স্টিমারটা। চাঁদপুর ঘাট এসে গেছে। যে আলোর বিন্দুগুলি দেখে তিনি ইন্দ্রপুরীর স্বপ্ন দেখছিলেন—তারা সব ভোল পালটে বিজলী বাতির পোস্ট হয়ে সার বেধে দাঁড়িয়ে গেছে তীরবর্তী রেল স্টেশনটাকে ঘিরে। নিজের কেবিনের দিকে এগিয়ে যান মালপত্র গুছোতে। কমলও এসে হাত লাগায়।

পূজোর ক'টা দিন দাদা বৌদির আশ্রয়ে আনন্দেই কেটে যায়। সরকারী চাকরী থেকে বছর পাঁচেক আগে দাদা অবসর নিয়েছেন। তাঁর বড়ছেলেও বছর দুই হয় বাবার অফিসেই চাকরী পেয়েছে। মনের মত একটি বউ এবার ঘরে আনতে পারলেই ইহজগতের সব কিছু আশা আকাঙ্খা পূর্ণ হয় বৌদির।

অনেকদিন পর দেবর আর তাঁর বন্ধুকে একসঙ্গে পেয়ে বৌদির খুশি আর ধরে না। দিনরাত শুধু যুদ্ধের ক'টা বছর কী আতঙ্কের ভেতর দিয়ে কেটেছে সে গল্প তাঁর মুখে লেগেই আছে। উঃ, কী ভীষণ সেদিনকার বিকেলবেলাটা, বলেন বৌদি—১৯৪২ সালের মে মাস—গরমে গা ভেপসে উঠছে—দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে সবে-মাত্র মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়েছি, অমনি মাথার ওপর গুর্ গুর্ শব্দ, এক ঝাঁক বাজপাখী যেন পাখার আওয়াজ তুলে শিকার সন্ধানে বেরিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিপদ সংকেত সাইরেন বেজে উঠে। আকাশ ভেঙে গুরুম্ গুরুম আওয়াজ ভেসে আসে পশ্চিমদিক্ থেকে। পর পর আট দশবার। গায়ের নিচে মাটিটা কেঁপে উঠে। ভয়ে ঢুকে পড়লাম পাশের তক্তপোষটার নিচে। অল্ ক্লিয়ারের

একটানা সাইরেনটা বেজে উঠতেই বেরিয়ে এলাম সামনের রাস্তাটায়। পাড়া-পড়শিরাও এসে জুটল। জানা গেল পতেঙ্গা এয়ারস্ট্রিপ্-এ বোমা ফেলে বিনা বাধায় জাপানী প্লেন ফিরে গেছে। বার্মা এখন ওদেরই দখলে। এবার চাটগাঁয়ের পালা। এমনি সব জটলা চলছে। শহর ছেড়ে সবাই পালাতে সুরু করেছে। তোমার দাদা বললেন—চল, আমরাও চলে যাই দেশের বাড়িতে। আমি বলি আমরা না হয় গেলুম, কিন্তু ছেলেটাকেতো এখানেই থাকতে হবে চাকরীর খাতিরে। অতএব যাওয়া হল না।

সাহস করে তো রইলুম শহরেই। টানা দেড় বছর শহরের ওপর আর হানা দেয়নি জাপানীরা। 'এই এল, এই এল' বলে এখন-তখন গুজব রটে বটে, কিন্তু কার্যত দেখা গেল ওরা আরাকানের পর এক কদমও এদিকে পা বাড়ায় নি।

হঠাৎ আবার হানা। শীতের রাত। ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে বড়দিনের দু' একদিন আগে হবে। লেপ-মুড়ি দিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছি, চীৎকার করে উঠল এ আর পি সাইরেন। উঠব কী না ভাবছি অমনি কানে তালা লাগিয়ে বোমা ফাটার ভীষণ শব্দ। কাছেই কোথাও ফেলেছে। সারা বাড়িটা থর থর করে কেঁপে উঠে। লেপ নিয়ে মশারি ছিঁড়ে গড়িয়ে চলে গেলাম আবার সেই তক্তপোষের নিচে। অল ক্লিয়ারের পর বাইরে এসে দেখি রেল স্টেশনের দিকে ধোঁয়া ও আগুনের ফুলকি আকাশের দিকে উঠছে। নিশ্চয়ই স্টেশনটা শেষ করে দিয়ে গেছে এবার। পরদিন সকালে খবর পাই, না, স্টেশনের বিশেষ কিছু হয়নি। বোমা পড়েছে রিয়াজুদ্দি বাজারে! বহু লোক নিহত ও আহত হয়েছে।

এমনি আরও অনেক কাহিনী বলেন বৌদি। যুদ্ধ যদি বা এড়িয়ে এলাম এবার শুরু হল হিন্দু-মুসলমানে গৃহযুদ্ধ। এ যুদ্ধ কী এড়ানো যাবে?—কমলকে প্রশ্ন করেন বৌদি।

—এড়ানো যাবে কী না বলা শক্ত—তবে দেশ বিভাগ অনিবার্য বলেই আমার মনে হয়—

—তা হলে আমাদের কী হবে, ঠাকুরপো? শেষ বয়েসে কী ধর্মান্তরী হতে হবে?—ভয়ার্তকণ্ঠে বলেন বৌদি।

—এত ভয় কিসের বৌদি? তেমন কিছু বুঝলে আমি নিজে এসে তোমাদের কলকাতা নিয়ে যাব।

এমনি গল্পগুজবে আর সপ্তাহব্যাপী বাঙালীর পরম উৎসব দুর্গোৎসবের উন্মাদনায় অন্দরকেল্লার বাড়িটার ব্যবস্থা সম্পর্কে মন দিতে পারেননি ডাঃ চৌধুরী। উৎসবের দিনগুলো কেটে যাবার পর ভাড়াটের কাছে একদিন কথাটা পাড়েন। ভাড়াটে জিজ্ঞাসা করেন, ডাঃ চৌধুরীর নিজের কী ইচ্ছা।

—আমার তো পিছু টান নেই কিছু। কেউ কিনে নিলে বিক্রীই করে দেব।

—তাই যদি দেবেন তো আমাকেই দিন না—

—সে তো খুব ভালো। বলুন কত দেবেন।

দামদস্তুর নিয়ে খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর সাব্যস্ত হয় বকেয়া ভাড়া সমেত ভাড়াটেই কিনে নেবেন বাড়িটা নগদ পাঁচ হাজার টাকায়।

কলকাতার পথে যাত্রার দিন দাদা-বৌদি দুজনে এসে ট্রেনে তুলে দিয়ে যান। ট্রেন ছাড়বার মুখে বৌদি আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলেন—দেখিস ভাই, ভুলে যাস্ নি যেন আমাদের। বিপদের সময় তোদের যেন কাছে পাই—

আশ্বাস দিয়ে কমল বলে—কিছু ভেবো না বৌদি, সব ভাবনা আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে বাড়ি ফিরে যাও—

হুইসল্ দিয়ে ট্রেনটাও আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে। যতদূর দেখা যায় জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দু' বন্ধুতে দাদা-বৌদিকে রুমাল নেড়ে বিদায় জানায়। ট্রেনের গতি দ্রুত বাড়তে থাকে।

পাহাড়তলি ছাড়বার পরই ওপরের বাংক-এ চাদর পেতে শুয়ে পড়ে হু' বন্ধু। অকস্মাৎ প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে পাশের শিকলটা ধরে টাল সামলে নিচে নেমে আসে দাঁড়ায় দুজন। কী হয়েছে কামরা সুদ্ধ সবাই কিছুই বুঝতে পারে না। এ্যাক্‌সিডেণ্ট না অন্য কিছু? নিকটবর্তী জানালাটার দিকে এগিয়ে যান ডাঃ চৌধুরী। দিগন্তে আকাশ লালে লাল। কোথায় আগুন লেগেছে যেন।

তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে বার্থটার ওপর উঠে বসেন ডাঃ চৌধুরী। চোখ রগড়ে ঘড়িটা দেখেন। সাড়ে পাঁচটা। রাত শেষ হয়েছে। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে একটা প্ল্যাটফরমে। নীল উর্দিপড়া একটা লোক হাঁকছে টাটানগর--টাটানগর। বাইরে আকাশের দিকে তাকান। ইস্পাতনগরীর আকাশ তখন লালে লাল।

॥ বাইশ ॥

লাল আকাশটার দিকে তাকিয়ে ভাবেন ডাঃ চৌধুরী, টাটানগরের আকাশটা আজ যেমন লালে লাল, তেমনি ষোল বছর আগেও নোয়াখালির কোন এক বা একাধিক গ্রামের আকাশও ছিল লালে লাল।

চাঁদপুব মেলটা দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার মাঠের মাঝখানে। অন্যান্য যাত্রীদের কাছে জানতে পাবেন মাত্র পনেবো মিনিট আগে ট্রেনটা ফেনী স্টেশন ছেড়ে এসেছে। এন্‌জিনেব দিকটা থেকে কোলাহল ভেসে আসছে। পর পর রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়বাব আওয়াজ ভেসে আসে, আব তারই সাথে লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান আওয়াজ। কয়েক ঝাঁক পাথরকুচি এসে কামরাব গায়ে লেগে ঠিক্‌রে পড়ে যায়। মুখ ফিরিয়ে দেখেন কমল উধাও। কামরার এক দিকেব দরজাটা খোলা। কয়েকজন যাত্রী নিচে নেমে জটলা করছে। ডাঃ চৌধুরীও নেমে দাঁড়ান। জমাট অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। শোনা যায় শুধু রাইফেল-এর আওয়াজ, আর আবছা আবছা দেখা যায় বহুলোক মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটছে। মিনিট দশেক পর সব চুপচাপ। শুধু দূর থেকে মানুষের চীৎকার ধ্বনি ভেসে আসে। কমলের সন্ধানে এগুবেন কী-না ভাবছেন, এমনি সময় ওদিক থেকে কমল আসছে দেখা যায়।

সবাই আবার কামরায় উঠে আসে এবং কমলের কাছে জানতে

চায় ব্যাপার কী ? কমল বলে, ফেনী ছেড়ে এসে এঞ্জিনের সার্চলাইট-এ ড্রাইভার দেখতে পায় লাইনের ওপর মস্ত একটা গাছের গুড়ি পড়ে আছে আর বিশ পঁচিশ জন লোক লাঠি সড়কি নিয়ে লাফাচ্ছে। দ্রুত ব্রেক চেপে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দেয় ড্রাইভার। মুহূর্তে মাঠ থেকে বিরাট এক জনতা এসে এঞ্জিনের পেছনের কামরাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বগিটা ছিল মিলিটারি রিজার্ভ। এক কোম্পানী সেনা যাচ্ছিল চাটগাঁ থেকে চাঁদপুর। ওরাও প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। তারপর শুরু করে রাইফেল থেকে গুলিবর্ষণ। মোটামুটি বোঝা গেল নোয়াখালির গ্রামে গঞ্জে বেধেছে দাঙ্গা। মুসলমানদের কে বা কারা খেপিয়ে দিয়েছে এই বলে যে কলকাতায় মুসলমানদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছে হিন্দুরা। তাই তারা বদলা নেবে নোয়াখালিতে। গ্রামে গ্রামে তাই চলছে মারামারি খুনোখুনি, আর আগুনে জ্বলছে বাড়ির পর বাড়ি।

কামরাটা হিন্দু-মুসলমান মিলিত যাত্রীর ভিড়ে ঠাসাঠাসি। খবরটা শুনে একে অপরের দিকে সন্দেহভরা দৃষ্টিতে তাকায়। কেউ গোপনে ছোরা শানাচ্ছে কী না কে জানে। এক অনাগত বিপদের আশঙ্কায় বিহ্বল বিমূঢ়। কমল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার ভালো করে দেখে নেয় সব ক'টি মুখ। তারপর হঠাৎ তীক্ষ্ণস্বরে বলে ওঠে—ভাইসব! চকিতে শতচক্ষু বিস্ফারিত হয়ে তাকায় কমলের দিকে। সে বলে চলে—আমাদের বরাত ভাল সামনের বগিটায় ছিল মিলিটারি—তাই সবাই এখনও বেঁচে আছি। বলতে হবে—আল্লার দোয়া, ভগবানের দোয়া। লাইনটা পরিস্কার করে দিচ্ছে ফৌজি জোয়ানেরাই। ছ' দশ মিনিট পরে গাড়িটাও আবার চলতে শুরু করবে। তারপর ?

কমল দম নেবার ছলে আর একবার শ্রোতাদের ওপর প্রতিক্রিয়াটা দেখে নিয়ে বলে—তারপর সবাই আমরা নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে যার যার গন্তব্যস্থলে পৌছুতে পারব কী না সেটা কিন্তু নির্ভর করছে

আমাদেরই ওপর। আমার আপনার আমাদের সকলের বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তানেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে আমাদের পথ চেয়ে। ফিরে গেলে ওদের মুখে ফুটবে হাসি—না পৌঁছুলে তাদের চোখের সামনে নেমে আসবে অন্ধকার ভবিষ্যৎ, দু' চোখে নেমে আসবে অবারিত পানি। আমরা কী পারি না পরস্পরের জীবন রক্ষার গ্যারান্টি দিতে?

চুপ করে আবার সবার মুখের দিকে তাকায় কমল। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বলে—যারা এই গ্যারান্টি দিতে প্রস্তুত তারা হাত তুলুন। নিঃশব্দে শত হাত প্রসারিত হয় ওপর দিকে। একটা তীব্র হুইসিল মেরে গাড়িটাও আবার চলতে শুরু করে।

পরদিন সন্ধ্যায় নির্বিঘ্নেই পৌঁছুনো গেল শিয়ালদা। সারা পথ স্টিমারে ও ট্রেনে যাত্রীরা নোয়াখালি দাঙ্গার আলোচনায় মুখর। তারই ফাঁকে ঠাট্টাছলে কমলকে একবার বলেন ডাঃ চৌধুরী—তুই তো সব সময় বক্তৃতা দেবার জন্যে মুখিয়েই আছিস্।

তুইও কিছু বল না, চুপ করে আছিস্ কেন?

—আমি রাজনীতি করি। বক্তৃতাই তো আমার পেশা। তবে সব সময় নয়। এখন শোনবার পালা। তাই অপরে কী বলছে শুনে যাচ্ছি সময় মত কাজে লাগাব।

—এক এক সময় আমি অবাক হয়ে ভাবি কমল, দু-দু'বার একই পরিস্থিতিতে দু'-চার কথার জাল বুনে কী করে তুই সম্ভাব্য একটা দাঙ্গা এড়িয়ে গেলি। একবার বেলেঘাটার বস্তিতে, আর এবার রেলের কামরায়?

—খুব সহজ। মানুষের, সে যে জাতেরই হোক্ না কেন, সব চেয়ে দুর্বলতম স্থান তার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনদের মঙ্গল কামনা। দু'-বারই আমি তাদের সেই দুর্বলতম কেন্দ্রে আঘাত হেনেছি। এটাই হল সাফল্যের মূল কারণ।

—যদি তাই হবে তা' হলে আজ দেশের একপ্রান্ত থেকে আর

এক প্রান্ত পর্যন্ত যে দাঙ্গার পর দাঙ্গা চল্‌ছে তা' থামানো যাচ্ছে না কেন? এমন কী মহাত্মা গান্ধীর মত অহিংসার একনিষ্ঠ সাধকের আহ্বানও বার বার দাঙ্গার কঠিন দেয়ালে প্রতিহত হয়ে নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

—এই নিষ্ফলতার কারণও খুবই সবল। যে আহ্বান সীমিত পরিবেশে সফল করে তোলা যায়, বৃহত্তর পরিবেশে তা' সম্ভব নয়। তুই কী মনে করিস্, ক্ষুদ্র এক বস্তিতে এবং ততোধিক ক্ষুদ্র রেলের এক কামরায় যা' সফল হয়েছে হিংসায় উন্মত্ত মারমুখী জনতার সামনেও তা' সফল হত? না, তা না। উল্‌টে আমার মাথায় পড়ত লাঠি, নয় বুকে ঢুকত ছোরা। সেখানে মহাত্মা গান্ধীর মত সর্বজনপূজ্য মানুষের শান্তির আহ্বান ছাপিয়ে মানুষকে হিংসার পথে ঠেলে দেয় মিঃ জিন্নার ডাইরেক্‌ট্ এ্যাক্‌শনের আহ্বান। বেদনাদায়ক হলেও এটা বাস্তব ঘটনা।

এরপর আর কোন কথা খুঁজে পান না ডাঃ চৌধুরী। ট্রেনটাও ধীরে ধীরে শিয়ালদা স্টেশনের ৮নং প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে যায়।

নোয়াখালির তাণ্ডব ও হত্যালীলার বীভৎস নৃশংসতার কাহিনী খবরের কাগজে পড়েন আর ভাবেন ডাঃ চৌধুরী, এই কী মানুষের সত্যিকারের পরিচয়? মাসখানেক যেতে না যেতেই মানুষের ভাগ্যবিধাতা যেন বিকট অট্টহাস্যে বলে ওঠেন—হ্যাঁ, এটাই মানুষের পরিচয়। নোয়াখালির প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় বিহারে। ক্ষিপ্ত হিন্দু জনতা বদলা নেওয়া শুরু করে প্রতিবেশী মুসলমানদের ওপর। কলকাতা-নোয়াখালি নাটকের পুনরাবৃত্তি হয় বিহারের গ্রামে গ্রামে, গঞ্জে গঞ্জে। কলকাতার বুকে দাঙ্গাবিধ্বস্ত উদ্বাস্তুর জনস্রোত ঝাঁপিয়ে পড়ে—একদল শিয়ালদা স্টেশনে, অপর দল হাওড়া স্টেশনে।

সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। তিন চার মাস পূর্বেও যে কলকাতা ছিল দাঙ্গাতাড়িত, হিংসার আগুনে উথাল-পাতাল, যে কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছিল শান্তিকামী হিন্দু মুসলমান আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা

সেই কলকাতারই বুকে আজ আবার আশ্রয়-ভিক্ষা করছে জাতধর্ম-নির্বিশেষে হাজার হাজার গৃহহীন মানুষ।

ধন্য, কলকাতা ধন্য। তোমারই মঞ্চে একদিন রামমোহন, বিদ্যাসাগরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল সমাজে লাঞ্ছিতা, নিপীড়িতা নারীজাতির বেদনার করুণ কাহিনী, তোমারই গঙ্গাতীর প্লাবিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের "যত মত, তত পথে"র মানবিক আবেদনের ঝর্ণাধারায়, ঝংকৃত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র, গীত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের "এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে" মনমাতানো সঙ্গীত, নেমে এসেছিল আরও কত মনীষীর প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের অমৃতধারা। আজও তুমি সেই ঐতিহ্যেরই শাশ্বত ধারক ও ক্লান্তিহীন বাহক। যতদিন তুমি থাকবে ততদিন পিষ্ট, ক্লিষ্ট, নির্যাতিত অসহায় মানুষ আশ্রয় খুঁজবে তোমার বুকের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে, প্রণাম জানাবে তোমারই পূত পাদমূলে।

হোটেলের ছাতে সকালবেলা পায়চারি করতে করতে নিজেরই অজ্ঞাতে হাত জোড় করে যেন শিয়ালদা স্টেশনটাকেই প্রণাম জানান ডাঃ চৌধুরী। পূর্বাকাশকে তখন খুশির রঙে রাঙিয়ে দিয়ে সলাজ বধুর মত ঘোমটার আড়াল থেকে উঁকি মারছেন প্রভাতী সূর্য।

আচমকা একটা হুইসিল-এর বিকট আওয়াজে তন্দ্রা ভেঙে যায়। তাকিয়ে দেখেন, ট্রেনটা তখনও টাটানগরের প্ল্যাটফরমেই দাঁড়িয়ে। ওদিককার ডাউন লাইন ধরে একটা ট্রেন বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে গেল। কর্ণভেদি ঘটাঘট্ ঘটাঘট্ শব্দে দাঁড়ানো গাড়িটা কেঁপে কেঁপে উঠে। সকাল সাড়ে ছ'টা। পুরো একঘণ্টা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে কেন গাড়িটা? একজন রেলকর্মীকে প্রশ্ন করেন ডাঃ চৌধুরী। একটু মাথা চুলকে তিনি জানান মিলিটারি ট্রেনকে

অগ্রাধিকার দেবার জন্য মেল ট্রেনটা ছাড়তে দেরি হচ্ছে। আধ ঘণ্টা পর আরও একটা যাবে। তাবপব ছাড়বে এ ট্রেনটা।

মিলিটারি ট্রেন? অগ্রাধিকাব? ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যাবৃত মনে হয়। এর বেশি কোন জবাব পাওয়া যাবে না, তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সে কথা জানেন ডাঃ চৌধুরী। চোখটা রগড়ে নিয়ে টুথ্ব্রাশ, সাবান আর তোয়ালে নিয়ে টয়লেটের দিকে পা বাড়ান।

টয়লেট থেকে ফিবে দেখেন ওপবের বাংক-এর ভদ্রলোক ঘুম ভেঙে নিচে নেমে বসেছেন। ডাঃ চৌধুরীকে দেখে প্রশ্ন করেন, কী ব্যাপার মশাই, ট্রেনটা ছাড়ছে না কেন? যতটা শুনেছেন তাই বলেন ওঁকে। তাবপব প্রাতঃবাশের সন্ধানে স্টেশন রেস্তোঁরার দিকে চলে যান।

সেখানে তখন টেবিলে টেবিলে অনেক খদ্দের। সবাই মিলে জটলা করছেন। নেফাতে চীনা আক্রমণ চলছে। তাই মিলিটারি ট্রেনেব পর মিলিটাবি ট্রেন ছুট্ছে কলকাতার দিকে। ভারতের সেনাবাহিনী চীনাদের সামনে দাঁড়াতেই পাবছে না। দিনের পর দিন পিছু হট্ছে। বমডিলা গেল বলে। এরই মধ্যে পায়েব তলায় মাটি কাঁপিয়ে আর একটা ট্রেন বেবিয়ে গেল।

কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান ডাঃ চৌধুরী। পাঁচ-ছ' বছর মাত্র হল চু-এন্-লাই এসে ভারত ঘুবে গেলেন। ধ্বনি উঠল হিন্দি-চীনি ভাই ভাই। তারাই আবার ভারতের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল? অবিশ্বাস্য। সব বাজে প্রোপাগাণ্ডা। গুজব। গুজব! গুজবই যদি হবে, মিলিটারি ট্রেনই বা ছুট্ছে কেন। চিন্তিত মনে কামরায় ফিরে আসেন। সহযাত্রী বলেন—বড্ড লেট্ করছে গাড়িটা। ঝামেলায় পড়লুম দেখছি।

—ঝামেলা? কেন? অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করেন ডাঃ চৌধুরী।

—হাওড়ার ফৌজদারি আদালতে হাজিরা দেবার কথা আমার

আজ অপরাহ্নে। তা' এখানেই ৭টা বেজে গেল। বেলা একটার আগে হাওড়া পৌঁছুনো যাবে কী না কে জানে?

—সে আশা ছেড়ে দিন। দেরি যখন একবার হয়েছে, চলতে চলতে আরও দেরি হবে এটাই ধরে নিন।

—তা' ছাড়া উপায় কী? ফালতু একটা কৈফিয়তের ধাক্কায় পড়তে হল, এই যা।

সারারাত একটানা জার্নির নিঃসঙ্গতার পর কথা বলবার একজন সাথী মেলায় ডাঃ চৌধুরী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। প্রয়োজন নেই কিছু কথা বাড়াবার তবু প্রশ্ন করেন, কৈফিয়ৎ কেন?

—সরকারী কর্মচারীরা চব্বিশ ঘণ্টা নানা কৈফিয়তের জালে বন্দী, যে অভিজ্ঞতা আপনার আছে কী না জানি না। জি আর পি-র, অর্থাৎ রেল পুলিশের একজন ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্ট আমি। একটা কেসের তদন্ত সূত্রে এসেছিলাম চক্রধরপুর। আজই আবার অপব একটা কেসে সাক্ষী হিসাবে হাওড়া কোর্টে হাজির হতে হবে আমাকে। সুতরাং সময়ে পৌঁছুতে না পারলে প্রথম দফা কৈফিয়ৎ হাকিমের এজলাসে, দ্বিতীয় দফা হাওড়া জি. আর. পি সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট-এর সামনে। কপাল মন্দ হলে হয়তো শেষ পর্যন্ত যেতে হবে আই. জি. জি. আর পি মিঃ দিলীপ গুপ্তের দপ্তরে।

দিলীপ গুপ্তের নাম শুনে কৌতূহল বেড়ে যায় ডাঃ চৌধুরীর। প্রশ্ন করেন, মিঃ দিলীপ গুপ্ত? আই. পি. এস্ দিলীপ গুপ্ত?

ডাঃ চৌধুরীর প্রশ্নে ভদ্রলোক এবার তাঁর দিকে ভাল করে তাকান। তারপর বলেন—হ্যাঁ, মিঃ দিলীপ গুপ্ত, আই. পি. এস্.। তাঁকে আপনি চেনেন না কী স্যর?

সম্ভ্রমের সুরটা খুবই পরিষ্কার। খুব একটা আগ্রহ না দেখিয়ে নির্লিপ্তভাবে জবাব দেন—যে দিলীপ গুপ্তকে আমি চিনতাম ইনিই সেই ব্যক্তি কী না জানি না। আমি যাঁকে এককালে চিনতাম তিনি প্রথমে হাওড়া, তারপর বাঁকুড়া জেলার এস্. পি. ছিলেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন ; ইনিই সেই মিঃ গুপ্ত।

কথা বলবার আগ্রহে কেমন যেন একটা ভাঁটার টান পড়ে। জানালার কোণটায় মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজেন ডাঃ চৌধুরী।

একটু পর ওদিক থেকে মৃদু অনুরোধ আসে—একটা কথা বলব স্যর ?

—বলুন।

—কলকাতায় নিশ্চয়ই মিঃ গুপ্তের সঙ্গে দেখা হবে আপনার ? দয়া করে আমার কথা একটু যদি বলেন তাঁকে। আমার নাম সুশীল ভট্টাচার্য। যদি কিছু মনে না করেন, আমার এই কার্ডটা দিতে চাই, স্বল্পক্ষণের এই সহযাত্রীকে মনে রাখবার জন্যে—

ভদ্রলোকের কণ্ঠে এমন একটা মিনতির সুর, চোখ মেলে তাকাতেই হয়। মৃদু হেসে বলেন—কী যে বলেন, ভুলব কেন ? দিন। কার্ডটা নিয়ে বুক পকেটে রেখে আবার চোখ বোজেন ডাঃ চৌধুরী।

—অনিদ্রায় আপনি ক্লান্ত, স্যর। আর বিরক্ত করবো না—বলে সুশীলবাবু ওপরের বাংকে উঠে পড়েন। গাড়িটা তখন দেবির সময় যতটা সম্ভব বাঁচাবার তাগিদে প্রাণপণে ছুটছে।

গাড়ি চলে সামনের দিকে। অবাধ্য মন সে চলাকে অগ্রাহ্য করে ছুটতে থাকে পেছন দিকে ; যেমনটি ছুটছে দিগন্ত প্রসারিত মাঠটা আর সব গাছপালা, বাড়ি ঘর।

দাঙ্গায় যে পাগলা ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল কলকাতাব বুকে, সে এখন সারা বাংলা, সারা ভারত ছুটে বেড়ায়। এ যেন মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া। আজ বিহার, কাল উত্তরপ্রদেশ, পরশু পাঞ্জাব এমনি করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বলতে থাকে শহর থেকে শহরান্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত অন্তর্বর্তী সরকার টলমল। জুড়ি গাড়ির

দু'টি ঘোড়া ছুটতে চায় দু'দিকে। সারথি লর্ড ওয়াভেল কিংকর্তব্য-বিমূঢ়। প্রশাসন যন্ত্র অচল। নিরুপায় হয়ে লণ্ডনের নির্দেশ যাজ্ঞা করেন ওয়াভেল।

এমনি করে এসে যায় নতুন বছর ১৯৪৭। মহাত্মা গান্ধী তখন নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের বাণী নিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক পদক্রমায় আত্মনিয়োজিত। একমাত্র আচার্য কৃপালনী ছাড়া আর কোন সর্বভারতীয় নেতা গান্ধীজিকে অন্ততঃ নোয়াখালি পৌঁছে দেবার সৌজন্যটুকুও দেখালেন না। মহাত্মাজির বুকে তাই অসীম বেদনা, মুখে তাঁর রবীন্দ্রনাথের অমরগীতি—যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে—।

চাবদিকে যখন এমনি একটা নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের কালোছায়া, ভারতসহ সারা বিশ্বকে সচকিত করে, ১৮ই ফেব্রুয়ারী বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী ক্লিমেন্ট এ্যাট্‌লী পার্লামেন্ট-এ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, আগামী ১৯৪৭ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতকে তার আকাংখিত-স্বাধীনতা দিতে বৃটিশ সরকার কৃতসংকল্প। একথাও পরিষ্কারভাবে ঘোষিত হয়—এবার কোন কমিটি বা কমিশন নয়—এই নীতি রূপায়িত করবেন এককভাবে নবনিযুক্ত ভাইস্‌রয় লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন।

২৪শে মার্চ লর্ড মাউন্টব্যাটেন কার্যভার গ্রহণ করা মাত্র নয়া দিল্লীর আসর জমে উঠে। জহরলাল নেহেরু প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা, মহম্মদ আলি জিন্না সহ মুসলিম নেতারা সবাই হাজির। শুধু অনুপস্থিত দীর্ঘ ত্রিশ বছর যে মহানায়ক কংগ্রেস-এর জীবনীশক্তি গড়ে তুলেছেন সারা ভারতের জনমনের ধারক ও বাহকরূপে, সেই বাপুজী। নোয়াখালি, তথা বিহার আজ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পর্বতপ্রমাণ এক চ্যালেঞ্জ নিয়ে। তাঁর স্বপ্নের হিন্দু-মুসলমান ঐক্য তাঁরই চোখের সামনে ভগ্নোন্মুখ। সুদূর নোয়াখালির এক গণ্ডগ্রামে হাইমচরে শান্তিবারি সিঞ্চনে তিনি ধ্যানমগ্ন। জরুরী বার্তা আসে

দিল্লী থেকে, বাপুজী, ফিরে আসুন। ফেরৎ জবাব যায়, বিহারকে আমি কথা দিয়েছি, সেখানেই যাব, দিল্লী নয়। পরদিনই হাইমচর ক্যাম্প গুটিয়ে বিহারের পথে যাত্রা করেন গান্ধীজি।

দিল্লীর রাজনৈতিক চিত্র তখন চলচ্চিত্রে ছবির মত বেগবান। লর্ড মাউন্টব্যাটেন দিল্লীতে উপস্থিত নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা থেকে বুঝে নিয়েছেন তাঁর মিশন সার্থক করে তুলবার চাবিকাঠি মহাত্মা গান্ধীর হাতে। তাই বিহারে ভ্রমণরত গান্ধীজির কাছে এবার জরুরী অনুবোধ জানান স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন—বলেন, আপনার জন্যে আমাব নিজস্ব প্লেন পাঠিয়ে দিচ্ছি। ফর গড্‌স সেক্‌, কাইণ্ডলি এ্যাক্‌সেপ্‌ট্‌ ছ রিকুয়েস্‌ট্‌। ভাইসরয়-এর আন্তরিক আহ্বান উপেক্ষা করতে পারেন না বাপুজী। জবাব পাঠান—প্লেন পাঠাতে হবে না। আমি নিজেই ট্রেন-এ আসছি।

রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে সবাই বাপুজীর জন্যে অপেক্ষা করে। তুদিনের মাথায় তিনি দিল্লী স্টেশন থেকেই সরাসরি চলে যান ভাইসরয়-ভবনে। সেদিন সান্ধ্য কাগজে বড় বড় হরফে খবর বেরুয়, বাপুজী তাঁর কথায় অচল, অটল। বড়লাটকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—তিনি চান অখণ্ড ভারত। যদিও তাকে দ্বিখণ্ডিত করতে হয়, তাঁর মৃতদেহের উপর দিয়েই করতে হবে। বরং মুসলিম লীগ তাদের পাকিস্তান দাবিতে অনড় থাকলে তাদের হাতেই তুলে দেওয়া হোক অখণ্ড ভারতের শাসনভার।

স্তম্ভিত ভারত এই অভিনব সংবাদে নির্বাক, নিস্তব্ধ। আকাশে বাতাসে ঝড়ের আভাস। সমবেত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় সব খবরের কাগজে। সন্ধ্যায় দিল্লীর ভাঙি কলোনীতে বাপুজীর উপস্থিতিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বাপুজির প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

সেই মুহূর্ত থেকে সব আলোচনা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন বাপুজি। মগ্ন হয়ে যান তাঁর চিরসাথী চরকায়। আকরিক অর্থে মৃত্যু না হলেও যা ঘটে গেল তা মৃত্যুরই সামিল। জহরলাল-

প্যাটেলের ন্যায় সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে একধারে ঠেলে দিয়ে দিল্লীর মসনদের দিকে আজ ধাবমান। ঠিকই বলেছিল কমল, ক্ষমতার লোভে এরা সব কিছুই করতে পারে।

স্যর, শুনছেন ?—

সহযাত্রীর হঠাৎ আহ্বানে সোজা হয়ে বসেন ডাঃ চৌধুরী।

সুশীলবাবু বলেন, ট্রেনটা ঘাটশিলায় যে আবার থেমে গেল—

—যাক গে, আই ডোন্‌ট্‌ কেয়ার—বিরক্তির সুরে বলে আবার গা এলিয়ে দেন বিছানাটায়। চৈনিক আক্রমণটা মনের অবচেতনে একটা কাঁটার মত বিঁধতে থাকে।

।। তেইশ ।।

পুরো এপ্রিল মাসটা কেটে যায় বড়লাট ভবনের রুদ্ধদ্বার কক্ষে রাজনৈতিক নেতাদেব সঙ্গে মাউণ্টব্যাটনেব ক্লান্তিহীন আলোচনায়। আলোচনা শেষে সরকারী মুখপাত্র যতটুকু বলেন সেটুকুমাত্র সম্বল অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের। চতুর্দিকে একটা নিশ্ছিদ্র গোপনতার শ্বাসরোধী নীরবতা। তারই ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু জানা যায় তা হল ভারত ভাগ অনিবার্য।

এপ্রিল গড়িয়ে এল মে। সংবাদ রটে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত মাউণ্টব্যাটনের সুপারিশ নিয়ে তাঁর চীফ্-অব্-স্টাফ্ লর্ড ইসমে বিমানে লণ্ডন চলে গেছেন বৃটিশ সরকাবের অনুমোদনের জন্যে।

এই মরি তো সেই মরি করে কাগজের প্রতিনিধিরা ছুটলেন লাট ভবনে, যদি ঘোড়াব মুখ থেকে কিছু সংবাদ মেলে সেই আশায়। কিন্তু ঘোড়া উধাও। মাউণ্টব্যাটেন চলে গেছেন সিমলায়, দিল্লীর উত্তপ্ত হাওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে। অদম্যদের কেউ কেউ ছুট্‌লেন সেখানে। অবাক কাণ্ড, পণ্ডিত নেহরুও সিমলায়। ফিরে এলেন সাধারণ একটু সংবাদ নিয়ে। মাউণ্টব্যাটেন বলেছেন মে মাসের মাঝামাঝি দিল্লীতে তিনি সাংবাদিকদের সবাইকে আমন্ত্রণ করবেন এবং তাঁদের সামনে তাঁর প্রস্তাব প্রকাশ করবেন। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই খবর আসে মাউণ্টব্যাটেন নিজে পাড়ি দিয়েছেন লণ্ডন এর পথে। পণ্ডিত নেহরু ফিরে আসেন দিল্লীতে। তাঁর চির গম্ভীর মুখে হাসির ক্ষীণতম রেখাও নেই।

৩১শে মে ফিরে এলেন মাউণ্টব্যাটেন। সন্ধ্যাবেলা সর্বদলীয়

নেতাদের আমন্ত্রণ জানালেন লাট ভবনে। তাঁদের সামনে সমগ্র প্ল্যানটা তুলে ধরে বললেন, আজ মধ্যরাত্রির মধ্যেই তাঁকে জানাতে হবে তাঁরা গ্রহণ করেছেন পুরো প্ল্যানটা। একটা সেমিকোলনও বাদ দেওয়া চলবে না। অন্যথা তাঁকে পদত্যাগ করে চলে যেতে হবে লণ্ডনে। পরবর্তী অধ্যায়ে যা ঘটবে তার টাল সামলাতে হবে উপস্থিত নেতৃবর্গকে। যথাসময়ে নেতাবা স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায হোক্ জানালেন তাঁদের সম্মতি।

দিল্লী শহর গুজবের ওপর গুজবে ছয়লাপ। অবশেষে সব গাল-গল্পের অবসান ঘটিয়ে মাউণ্টব্যাটেন সহ জহরলাল, জিন্না ও বলদেব সিং অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও মারফৎ হস্তান্তরের সংক্ষিপ্ত একটা রূপরেখা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। সবাই জানল, অখণ্ড ভারতের মৃতদেহ থেকে জন্ম নিচ্ছে খণ্ডিত ভারত, পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তান। মনে মনে না হোক প্রকাশ্যে নেতারা সবাই খুশি খুশি ভাব। দেশবাসী খুশি কী না তা জানবার সময় নেই ওদের। কিন্তু যাঁর বুকে 'ভারত ভেঙ্গে ভাগ করবার' এই খেলা শেল হয়ে বিধবে তিনি তখন দিল্লীর ভাঙি কলোনীতে নিদ্রায় মগ্ন। সত্যি আজ একা—বড় একা। পরদিন সাংবাদিকেরা তাঁর মত চাইলে একটা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে শুধু বলেছিলেন—ওঁরা এখন থেকে ঘরে ঘরে শুধু আমার ছবি টাঙাবে, আমার কথা শুনবে না। কী অমোঘ ভবিষ্যৎবাণী। আজ মহাকরণের ঘরে ঘরে, অফিসে আদালতে সর্বত্র বাপুজির ছবি ঝুলছে—তাঁর বাণী চিরনির্বাসনে।

৪ঠা জুন দিল্লীতে প্রেস কন্‌ফারেন্স। সম্পূর্ণ প্ল্যানটা তুলে ধরা হয় সাংবাদিকদের সামনে একটি সরকারী হোয়াইট পেপার-এর মাধ্যমে। কিছুক্ষণ নিশ্ছিদ্র নীরবতা, শুধু পাতা 'ওলটাবার খস্ খস্ আওয়াজ। হঠাৎ পেছনের জনৈক সাংবাদিকের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—সবই তো বলেছেন, কিন্তু একটি কথা বলেন নি—কবে এবং কখন ক্ষমতার এই হস্তান্তর ঘটবে জানতে পারি কী?—

আকস্মিক এই প্রশ্নে মাউণ্টব্যাটেনের মত পাকা কূটনীতিকও যেন সাময়িকভাবে হতচকিত হয়ে যান। সমস্ত হলটায় গুমোট একটা স্তব্ধতা নেমে আসে। তিনশতাধিক ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সাংবাদিকের ছয়শত চোখ মাউণ্টব্যাটেনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তিনি টেবিলে রাখা কাঁচের পেপার উইয়েট্ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন। সহসা ঋজু দেহ তুলে ধরে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ধীরগম্ভীর কণ্ঠে বলেন মাউণ্টব্যাটেন—

দ্য ফাইন্যাল ট্রান্স্ফার অব্ পাওয়ার উইল্ টেক্ প্লেস এ্যাট্ মিডনাইট্ অন্ ফোরটিন্থ্ আগস্ট নাইটিন ফরটি সেভেন।

সারা 'হল'টা স্তম্ভিত হয়ে অবিশ্বাস্য এই ঘোষণাটি শুনে। তারপরই অদম্য উল্লাসে করতালিতে ভেঙে পড়ে।

দ্রুততালে দিন এগিয়ে চলে। রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে সারা দেশ অপেক্ষা করে ১৪ই-১৫ই আগস্টের মিলনমুহূর্ত সেই দ্বিপ্রহর রাতটির জন্যে। কলকাতাবাসীর মনে কিন্তু শান্তি নেই। ঠিক এক বছর আগেকার ভয়াবহ তিনটি দিন—১৬ই থেকে ১৮ই আগস্ট—ঘুরে ঘুরেই তাদের স্মৃতিপটে জেগে উঠে রাত্রির ঘুম কেড়ে নেয়। কলকাতার বুকে আবার রক্তের বন্যা বইবে না তো? সন্ধ্যেবেলা হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাঃ চৌধুরীও সে কথাই ভাবছিলেন হ্যারিসন রোডে চলমান জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে। একটা চীৎকার শুনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখেন অগণ্য হকার বালক কাগজ তুলে ধরে হাঁক্ছে—জবর খবর, জবর খবর—সুরাবর্দি আশ্রয় মেগেছেন গান্ধীজীর পায়ে। দ্রুত নেমে গিয়ে একটা কাগজ কিনে আনেন।

হ্যাঁ, অভাবনীয় ব্যাপারই বটে। ভারত ভাগ করে ট্রান্স্ফার অব্ পাওয়ারের সব সর্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ গ্রহণ করবার পরই গান্ধীজী অনুভব করেন ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে তার আর কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর একমাত্র ব্রত, হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে আবার নোয়াখালি যাবার মনস্থ করে সোদ-

পুরে সতীশ দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত 'গান্ধী :আশ্রমে'র শান্ত পরিবেশে কিছুদিন যাপন করছিলেন—সব কোলাহল থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে। আত্মনির্বাসিত গান্ধীজির নিকট একদিন সকালে সুরাবর্দি দেখা করে অনুরোধ জানায় ১৫ই আগস্ট থেকে কিছুদিন যেন তিনি খাস কলকাতায় অবস্থান করেন। গান্ধীজির প্রশ্নের জবাবে সুরাবর্দি জানান তাঁর উপস্থিতি কলকাতার জনগণকে হিংসার মারাত্মক অগ্নিশিখা থেকে বিরত রাখবে বলে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস।

বাপুজী বলেন, দিল্লীর স্বয়ং মাউন্টব্যাটেন তাঁকে অনুরূপ অনুবোধ জানিয়েছিলেন। তিনি তা রাখতে পারেন নি। এ সময়টা নোয়াখালি যেতে চান, যাতে ওখানে ১৯৪৬ সালের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। একই সময় দু'জায়গায় থাকা তো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

সুরাবর্দি বলেন, বাপুজী, আপনি তো শুধু হিন্দুদেরই বাপুজি নন্ মুসলমান সমাজেরও তো! কলকাতার লক্ষ লক্ষ মুসলমানও তো আপনারই মুখের দিকে তাকিয়ে। তাদেরই প্রতিনিধি হিসাবে আপনাকে কলকাতা থাকারই আবেদন জানাচ্ছি আমি। বিশ্বাস করুন, এটা আমার অন্তরের কথা। আপনার কাছে কোন কপটতার আশ্রয় নেব না আমি। নোয়াখালির নিরাপত্তার ব্যাপারে আপনি আদেশ করুন আমাকে কী করতে হবে। আমি দ্বিধাহীনচিত্তে তাই করতে প্রস্তুত।

সুরাবর্দির আন্তরিকতায় আর কোন সন্দেহ থাকে না গান্ধীজির। স্মিতহাস্যে বলেন—বেশ রাজী, কিন্তু দু'টি শর্ত—

—বলুন, কী শর্ত—

—এক, আমার থাকবার জন্যে একটা বস্তি বেছে দিতে হবে যার আশে পাশে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে। যে ক'দিন ওখানে আমি থাকব তোমাকেও থাকতে হবে আমারই সঙ্গে। রাজী—

—রাজী—

—দুই, নোয়াখালির মুসলমান মাতব্বরদের কাছ থেকে লিখিত গ্যারান্টি এনে দিতে হবে এই মর্মে সেখানে কখনও আর একটি হিন্দুরও সাম্প্রদায়িক হিংসার শিকার হতে হবে না। আর বাংলার প্রধানমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে তোমাকে এই প্রতিশ্রুতির গ্যারাণ্টার হতে হবে। মনে রেখো, এ দুটি শর্তের একটিরও যদি কোন রকম বিচ্যুতি ঘটে, আমাকে পালন করতে হবে আমরণ অনশন ব্রত—। এবাব কৌতুকভরা দৃষ্টিতে সুরাবর্দির মুখের দিকে তাকান, বাপুজী।

কোনরূপ দ্বিধা না করে জবাব দেন সুরাবর্দি—রাজী।

—বেশ, ১৩ই আগস্ট দ্বিপ্রহরের পব নির্দিষ্ট স্থানে যাব। তুমি এসে গাইড হিসাবে আমাকে নিয়ে যাবে—।

অধীর আগ্রহে দু'টি দিন কেটে যায়। ১৩ই আগস্ট বেলা তিনটে নাগাদ ১৫১ নং 'হায়াদারী হাউস'এর সামনে গিয়ে দাঁড়ান ডাঃ চৌধুরী। বহুকাল পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ এক কুঠিবাড়ী। এক-কালে খুব জৌলুস ছিল দেখলেই বোঝা যায়। গথিক কলামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে প্রশস্ত তার বারান্দা। ভেঙে চুরে এখন সব এবড়ো খেবড়ো। বৃহদাকাব ভেনেসিয়ান জানালাগুলির চিহ্নমাত্র নেই, আগেই কারা সব ভেঙে চুরি করে নিয়েছে। ঘবগুলো বৃহদাকার—চামচিকে, বাদুর আর চড়ুই পাখীব আস্তানা। চারদিক্ ঝোপঝাপ আর আগাছার জঙ্গল। তারই পাশে ঘনবসতিব বিস্তীর্ণ এক বস্তি। আশেপাশে বলতে একমাত্র এই বাড়িটা তার পুরনো ঠাট বজায় রাখবার ব্যর্থ প্রয়াসে ন্যুব্জদেহে দাঁড়িয়ে আছে। যথা-সম্ভব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে গান্ধীজি ও তাঁর সহকর্মীদের বাসের জন্য এ বাড়িটাই নির্ধারিত করে রেখেছেন সহীদ সুরাবর্দি।

সেখানে হাজির হয়ে ডাঃ চৌধুরী দেখেন সামনের রাস্তাটা বিরাট এক জনতার দখলে। ওরা স্লোগান তুলছে—'পাকিস্থান

মুরদাবাদ—গান্ধীজি ফিরে যাও', 'নোয়াখালি যাও', 'হিন্দু বাচাও'। প্রবল উত্তেজনা, জনতা মারমুখী।

অদূরে দেখা যায় কংগ্রেস পতাকা তুলে একটা গাড়ি মন্থর-গতিতে এগিয়ে আসছে। জনতার সামনে এসে গাড়িটা দাঁড়ায়। ভেতরে রয়েছেন, গান্ধীজি, তাঁর পাশে সুরাবর্দি। জনতা দ্বিগুণ উৎসাহে স্লোগান তুলে। দু' একটা ঢিলও এসে লাগে গাড়িটার গায়ে। সব কিছু উপেক্ষা করে গান্ধীজি পাশের দরজাটা খুলে বেরু-বার চেষ্টা করেন। উর্দিপরা ড্রাইভার নেমে এসে দরজাটা ধরে দাঁড়ায়। বাধা দিয়ে সুরাবর্দি কী যেন বলবার চেষ্টা করেন গান্ধীজিকে। ভ্রুক্ষেপ না করে বয়সের ভারে দীর্ণ শীর্ণ ম্লান দেহটি নিয়ে যষ্টিহাতে নেমে আসেন বাপুজি। নির্ভয় ভঙ্গীতে কোলাহলরত জনতার দিকে চিরসঙ্গী তাঁর অপূর্ব সেই নির্মল হাসিটি তুলে ধরেন। জাদুবলে যেন ক্ষণিকের তরে জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। স্বর্গীয় সেই হাসির দেয়াল ভাঙ্গার ক্ষমতা কারো নেই। শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বাপুজি বলেন, তোমরা এসেছ আমাকে ধিক্কার জানাতে। হ্যাঁ, সে ধিক্কার আমি মাথা নত করে গ্রহণ করছি, কারণ এ ধিক্কার আমার প্রাপ্য। বড়াই করে বলেছিলাম, আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে ভারত ভাগ করতে হবে। কথা রাখতে পারি নি। ভারত ভাগ হতে চলেছে। আমি এখনও বেঁচে আছি। মারো, তোমরা আমায় মারো। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্ আমার তোমাদেরই হাতে—বলেই বাপুজি মাথা নত করে দাঁড়ান।

থম্‌কে দাঁড়ায় জনতা, একী বলছেন গান্ধীজি? বলে চলেন বাপুজি কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি তোমাদের মাঝে এসেছি তোমাদের সাহায্য নিয়ে নোয়াখালির হিন্দুদের বাঁচাব বলে। এই ছাখো, সুরাবর্দিও রয়েছেন আমার সঙ্গে—

সুরাবর্দি এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ান। উত্তেজনায় এতক্ষণ কেউ লক্ষ্য করে নি সুরাবর্দি গান্ধীজির পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁকে

দেখেই জনতা আবার ক্রুদ্ধ আক্রোশে গর্জে ওঠে—খুনী সুরাবর্দি মুরদাবাদ—

হাত তুলে গান্ধীজি বলেন, শোন তোমরা, আমার কথা এখনো শেষ হয় নি। তারপর বলে যান কী কী শর্তে তিনি এখানে এসেছেন। সুবাবর্দি সব শর্ত মেনে নিয়েছেন—

জনতা দাবী করে গত বছর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কলকাতায় হত্যালীলার জন্য তিনি সম্পূর্ণ দায়ী একথা কবুল করুন। তবেই তিনি রেহাই পাবেন।

সুরাবর্দি বলেন—গতবছরের দাঙ্গার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। আমি অকপটে একথা স্বীকার করছি এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে এবার যদি নোয়াখালিতে একটি হিন্দুরও প্রাণহানি ঘটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তা'হলে আপনারা যে শাস্তি দেবেন তাই আমি মাথা পেতে নেব।

গান্ধীজি বলেন, আমি বিশ্বাস করি সুরাবর্দি তাঁর কথা রাখবেন। তা'সত্ত্বেও যদি কলকাতায় একটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়, আমি আমরণ অনশন ব্রত নিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করব।

সুরাবর্দি তাঁর কথা রেখেছেন, কথা রাখে নি কলকাতা। মনে পড়ে ডাঃ চৌধুরীর—কী ভাবে আঠারো দিন পরেই চাঁদপাল ঘাটে গুটি কয়েক হিন্দু যুবকের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে ভ্রমণরত দু'জন মুসলমান নিহত হয়। বিদ্যুৎগতিতে খবর ছড়িয়ে পড়ে সারা শহরে। হায়দারি হাউসেও সে খবর পৌঁছুতে বিলম্ব হয় নি। মনে পড়ে সেদিনই রাত ন'টা থেকে শুরু হয় বাপুজীর আমরণ অনশন ব্রত।

আরও মনে পড়ে, কী ভাবে কলকাতার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব নেতৃবৃন্দের নিরলস আপ্রাণ চেষ্টায় তিন দিন পর শহরে আবার শান্তি ফিরে আসে। মনে পড়ে, তাঁদের আবেদনে সারা দিয়ে অন্ধকারের অধিবাসী কয়েক শ' মানুষ শতশত মরণাস্ত্র জমা দেয় বাপুজীর পদতলে, মাগে তাঁর ক্ষমা। চতুর্থ দিনে অবসান

ঘটে বাপুজির অনশনব্রত। সব কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে অসীম গর্ব অনুভব করেছিলেন ডাঃ চৌধুরী। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে নি কলকাতার বুকে।

মন ফিরে যায় আবার পেছন দিকে, ১৪ই আগস্ট মধ্যরাতে স্বাধীনতার সেই শুভলগ্নে। বারোটা বাজতে না বাজতেই হাজার হাজার মানুষ নেমে পড়ে রাস্তায় রাস্তায়। শুরু হয় বাজি পুড়িয়ে পট্‌কা ফাটিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির জয়োল্লাস। মোড়ে মোড়ে পানের দোকানে ভিড় জমে যায় রেডিওতে নেতৃবৃন্দের ভাষণ শুনবার আগ্রহে।

হোটেলের সবাই বসে আছেন অফিসঘরে রেডিও সেট্‌টির সামনে। দেয়াল ঘড়িটায় ঢং ঢং করে বারোটা বাজতে শুরু হয়। শেষ ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত নেহেরুর ভাবগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—যাব ভাবার্থ—"অনেক বছর গড়িয়ে গেল আমাদের একটা চুক্তি হয়েছিল ভারতের ভাগ্যবিধাতার সঙ্গে—ভারতকে আমরা অধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করব। আজ সেই মুহূর্ত সমাগত গভীর নিশিতে সারা বিশ্ব যখন নিদ্রামগ্ন, ভারত তখন জেগে উঠছে নতুন এক জীবনে—স্বাধীন জীবনে। বক্তব্য শেষে আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছিল নেহেরুজির কণ্ঠস্বর। কলকাতার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে যুগপৎ শাঁখ আর মেয়েদের উলুধ্বনিতে। রাস্তায় রাস্তায় জনতা যাকে সামনে পায় তাকেই জড়িয়ে ধরে গভীর আলিঙ্গনে।

ঘরে যখন ফিরে আসেন ডাঃ চৌধুরী রাত যখন প্রায় একটা। বাইরের কোলাহল তখনও অব্যাহত। ভাবেন, সারাভারত আজ স্বাধীনতার গর্বে উল্লসিত। কিন্তু স্বাধীনতা যজ্ঞের আপসহীন সেই চিরসংগ্রামী পুরুষ আজ কোথায়—কোথায় আজ নেতাজি সুভাষচন্দ্র —যিনি বর্মা রণাঙ্গনে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন 'ভারত

অচিরে স্বাধীন হবেই'। বেদনার্ত হৃদয়ে অবসন্ন দেহটা বিছানায় এলিয়ে দেন ডাঃ চৌধুরী।

পরমতম বিস্ময় অপেক্ষা করছিল পরদিন সকালবেলার জন্যে। ভোর হতে না হতেই রাস্তা ঘাট লোকে লোকারণ্য। তিনিও রাস্তায় নেবে এগিয়ে যান রাজাবাজারের দিকে, মুসলমান ভাইদের প্রতিক্রিয়া দেখবার কৌতুহল নিয়ে। চোখ দু'টি তাঁর বিস্ফারিত হয়ে যায় অকল্পনীয় এক দৃশ্যে। কিছুদিন পূর্বেও যারা ধ্বনি তুলেছিল—লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান—তারাই আজ দলে দলে যোগ দিয়েছে এই আনন্দোৎসবে। সবার গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে সুবাসিত আতর আর গোলাপজল। জড়িয়ে ধরছে গভীর আলিঙ্গনে। নিশ্ছিদ্র সেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে যান শিয়ালদার দিকে। গলা শুকিয়ে যায় ভিড় ঠেলতে ঠেলতে। একটা চায়ের দোকানে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে মৌলালির দিকে চলতে থাকেন আপনমনে। ক্যাম্পবেল হাসপাতাল ছেড়ে সরকারী সেনট্রাল মেডিকেল স্টোর্সটার সামনে এসেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে যান পরম বিস্ময়ে। সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন কর্নেল চ্যাটার্জি। যিনি বর্মা রণাঙ্গনে নেতাজির শুধু অতি কাছের মানুষই ছিলেন না, ছিলেন নেতাজির নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দ্‌ সরকারের অর্থমন্ত্রী। পতাকা উত্তোলন শেষ হতেই সামনে এগিয়ে যান ডাঃ চৌধুরী। তাঁকে দেখেই কর্ণেল চ্যাটার্জি স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করেন—তুমি এখানে, চৌধুরী।

—আমিও তো আপনাকে একই প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম স্যর—সহাস্যে বলেন ডাঃ চৌধুরী।

—কাল থেকে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডিরেকটর অব হেল্‌থ্‌ সার্ভিসেস্‌ পদে জয়েন করেছি। তুমি কী করছ?

—বৌবাজারে একটা ঔষধের দোকানে বসে প্রাইভেট্‌ প্রাক্‌টিস্‌ করছি—।

—বেশ, কাল তুমি রাইটার্স-এ আমার সঙ্গে দেখা করো, কথা বলা যাবে। আজ একটু ব্যস্ত আছি।

ডাক্তার চৌধুরীর সঙ্গে হ্যাণ্ড সেক্ করে অপেক্ষমান জীপটায় উঠে বসেন কর্ণেল চ্যাটার্জি।

হোটেলে ফিরে যাবার জন্য উত্তরদিকে মুখ ফেরাতেই কে একজন পেছন থেকে বলেন, যাবেন না প্লিজ, একটু ভেতরে আসুন।

জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাতেই ভদ্রলোক বলেন—আমি মুখার্জি—মানে—প্রশান্ত মুখার্জি। এই স্টোর-এর নবনিযুক্ত এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ্ অফিসার। আপনি?

—আমি ডাঃ গৌতম চৌধুরী—লেট্ অব্ আই. এন. এ।

মুখার্জি উল্লাসিত হয়ে বলেন—বটে? আসুন, একটু চা খেয়ে যেতেই হবে আপনাকে।

চায়ের বৈঠকে আলাপটা জমে উঠে। আরও জমে যখন প্রকাশ পায় ডাঃ চৌধুরী চাট্‌গাঁর ছেলে, আর মুখার্জিও যুদ্ধের সময় চাটগাঁ এবং কক্সবাজারে পোস্টেড্ ছিলেন সরকারী স্পেশ্যাল অফিসার হিসাবে।

গল্প-গুজবে কখন যে এগারোটা বেজে গেছে কারও খেয়াল নেই। হাত ঘড়িটার দিকে এক নজর দেখে নিয়ে ডাঃ চৌধুরী বলেন—ওঃ, এগারোটা বেজে গেল, এবাব আমি চলি—

মুখার্জি বলেন—বেশ, পাশের এই দোতলা বাড়িটাই আমার কোয়ার্টার্স। যে কোন দিন সন্ধ্যার দিকে চলে আসবেন। আড্ডা জমানো যাবে।

—বেশ, তাই আসব—হাসিমুখে বলেন ডাঃ চৌধুরী।

মুখার্জির জীপটাই হোটেলে পৌঁছে দেয় তাঁকে।

॥ চব্বিশ ॥

গান্ধীজির জাদুস্পর্শে চারদিনের বিচ্যুতি ঘটিয়ে কলকাতা তার সদামুখর প্রাণচঞ্চল আপন সত্তায় ফিরে আসে। পূর্ব সীমান্ত শান্ত, ঝড় ওঠে পশ্চিম সীমান্তে। পূর্ববাংলা—সন্থ নামাঙ্কিত পূর্ব পাকিস্তান থেকে কিছু কিছু উদ্বাস্তু আসতে শুরু করেছে বটে, কিন্তু তা আয়ত্বের বাইরে নয়। খবরের কাগজে পাঞ্জাব পরিস্থিতির যে সব খবর আসছে তা গৃহযুদ্ধেরই সমতুল। জ্বলে উঠছে সেখানে আধুনিক কালের প্রচণ্ডতম হিংসার দাবানল। শহরে-শহরে, গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে নৃশংসতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রলয়-নৃত্য। হতাহতের সংখ্যা এক বছর আগেকার 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'-কেও লজ্জা দেয়। অত্যাচারিত নিগৃহীত লক্ষ লক্ষ মানুষের দ্বিমুখী স্রোত—একদল পূর্ব থেকে পশ্চিমে, অপরদল পশ্চিম থেকে পূর্বে। পথিমধ্যে দেখা হলে একে অপরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত। হিমগিরির শিখর থেকে প্রকাণ্ড এক হিমবাহ যেন পঞ্চান্ন হাজার সীমান্ত বাহিনীর সুদৃঢ় দেয়াল ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। রাস্তা ঘাটে বয়ে চলেছে নিহত মানুষের রক্তস্রোত। নেহেরু, তথা লিয়াকৎ খাঁ, উভয়ের একই উক্তি, আমরা সব উন্মাদ। হতচকিত মাউণ্টব্যাটেন কলকাতায় গান্ধীজিকে লিখে পাঠান—একজন মাত্র নিরস্ত্র সান্ত্রী পূর্বসীমান্তে বজায় রেখেছে যে শান্তি, পঞ্চাশ সহস্র সশস্ত্র পারেনি তা পশ্চিম সীমান্তে। আপনাকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। গান্ধীজি জানান, এবার পাঞ্জাব আমায় ডাকছে, দিল্লী যাচ্ছি।

খবরটা পড়ে ডাঃ চৌধুরী ভাবেন গান্ধীজির যাদুস্পর্শে পাঞ্জাব হয় তো কলকাতার মতই স্থৈর্য ফিরে পাবে, ফিরে আসবে শান্তির স্নিগ্ধশীতল পরিমণ্ডল। কলকাতায় গান্ধীজির সেই আকর্ণ বিস্তৃত হাসির প্রভাব স্বচক্ষে তিনি দেখেছেন, দিল্লীতেও তা প্রত্যক্ষ দেখবার অদম্য একটা কৌতূহল জাগে। কমলকে টেলিফোনে জানান দুদিন পর দিল্লী যাচ্ছেন।

দিল্লীতে গিয়ে জানতে পারেন গান্ধীজি তাঁর পূর্বেকার বাসস্থান ভাঙি কলোনীতে নেই। নিরাপত্তার অজুহাতে নেহেরু-প্যাটেল নিয়ে গেছেন তাঁকে ধনাঢ্য শিল্পপতি জি. ডি. বিড়লার প্রসাদে। বহু নিন্দিত সুরাবর্দ্দি বাপুজীকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেবার যে ঝুঁকি নিয়েছিলেন, সর্বজনপূজিত নেহেরু ও প্যাটেল সে সাহসটুকুও হারিয়ে ফেলেছেন স্বাধীনতাপ্রাপ্তির তিন সপ্তাহ অতীত হতে না হতেই।

বিকেল পাঁচটায় বিড়লা হাউস-এ গান্ধীজির প্রার্থনা সভায় হাজির হয়ে দেখেন মাত্র শতখানেক মানুষ এবং মেজাজ তাদের উগ্র। কলকাতার পরিবেশে আকাশ-জমিন ফারাক। শ্রোতাদের বিক্ষোভের তোড়ে বাপুজীকে শেষ পর্যন্ত প্রার্থনা সভা বন্ধ করে ফিরে যেতে হয়। আকর্ণবিস্তৃত মধুর সেই হাসি, যে হাসি বেলেঘাটার হায়দারী হাউসের সামনে বিক্ষুব্ধ বাঙ্গালী জনতার মন কেড়ে নিয়েছিল, সেই হাসি আজ পাষাণ দেয়ালে আঘাত করে করে ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। ক্লিষ্টমনে ফিরে গেলেন ডাঃ চৌধুরী তাঁর হোটেলে।

উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে চলে। পাঞ্জাব দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে দিল্লীতেও। কালবৈশাখির প্রবল ঝঞ্ঝা যা পায় তাই যেমন উপড়ে ফেলে, এ যেন তাই। দিল্লী, তথা পাঞ্জাবের প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, অশুভ বুদ্ধির সংগ্রাম। নেহেরু-প্যাটেল-এর অনুরোধে মাউন্টব্যাটেন গঠন করলেন, ইমার্জেন্সি

কমিটি—সভাপতি তিনি নিজে, সদস্য নেহেরু, প্যাটেল আর অন্যান্য সামরিক উপদেষ্টারা। শুরু হয় সর্বাত্মক আক্রমন দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সর্বাধিনায়ক লুই মাউণ্টব্যাটেন আবির্ভূত হলেন দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সারথি রূপে। 'হিস্ট্রি রিপীটস্ ইট্সেলফ্', সকৌতুকে ভাবেন ডাঃ চৌধুরী—শুধু শ্রীকৃষ্ণ নেই, আছেন মাউণ্টব্যাটেন।

আঠারো দিনে না হোক প্রায় চার সপ্তাহ সংগ্রামের পর পাঞ্জাব তথা দিল্লী, ফিরে আসে তার স্বাভাবিক জীবনে। সরকার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবার সুযোগ পান উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি কলকাতা ফিরে এলেন ডাঃ চৌধুরী।

আবার চাঞ্চল্যকর সংবাদ। পশ্চিম বাংলায় সবেমাত্র দুর্গোৎসবের ঢাক বেজে উঠেছে। সে বাজনা ডুবিয়ে দিয়ে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমানায় বেজে ওঠে রণ-দামামা—মঞ্চ কাশ্মীর। দেশ বিভাগের চুক্তি অনুযায়ী প্রায় পাঁচশতাধিক রাজন্যবর্গের সবাই যার যার সুবিধানুযায়ী যুক্ত হয় ভারতের, নয় পাকিস্তানের সঙ্গে। ব্যতিক্রম শুধু হায়দরাবাদের নিজাম, কাশ্মীরের মহারাজ হরি সিং আর জুনাগরের নবাব। তাঁরা দাবি করেন স্বাধীন অস্তিত্ব। অবস্থা তাদের ত্রি-শঙ্কুর মত। অকস্মাৎ খবর আসে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করেছে। ওরা প্রায় রাজধানী শ্রীনগরের দ্বারপ্রান্তে—বারমুলায়। ভীত সন্ত্রস্ত হরি সিং সরে আসেন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান জম্মুতে; অবস্থার চাপে ২৬শে অক্টোবর ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবার স্বীকৃতিনামা স্বাক্ষর করেন।

শুরু হয় স্বাধীনতা দিবস থেকে দুমাসের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রক্তক্ষয়ী প্রথম সংগ্রাম। ভারতীয় সেনার আক্রমনে পিছু হট্তে থাকে পাকিস্তানী সেনা। মাউণ্টব্যাটেনের পরামর্শে প্রধানমন্ত্রী নেহরু আবেদন জানান আন্তর্জাতিক সংস্থা

"ইউনাইটেড্ নেশন্স্"-এর দরবারে। তাদের মধ্যস্থতায় একটা "সীজ্ ফায়ার" লাইন টেনে দেওয়া হয় পুন্চ্ এলাকা বরাবর। দুই রাষ্ট্রের সীমান্ত বরাবর চিরকালের জন্যে ঢুকে থাকে একটি কাঁটা—যা আজও ঝুলে আছে, মীমাংসার লক্ষণ নেই।

বিকেলের দিকে ডিস্পেন্সারিতে বসে সংবাদপত্রে খবর পড়ছিলেন ডাঃ চৌধুরী। কমল এসে হাজির। বলে খুব তো হিল্লি-দিল্লী ঘুরে এলি, এবার আমাদের বাড়ি চল্।

—তোর বাড়ি, মানে?

—তুই যখন দিল্লীতে চাটগাঁ থেকে দাদা-বৌদিকে নিয়ে এসেছি কলকাতা। বাসা ভাড়া করেছি কালীঘাটে। আমিও এখন পার্টি অফিস ছেড়ে ওখানেই থাকি। খোকা তো আগস্ট মাসেই চলে এসেছিল চাকরিতে 'ইণ্ডিয়া অপশন' দিয়ে, সে কথা তুই আগেই শুনেছিস্। এখন সে আলিপুর অফিসে কাজ করছে। বৌদি বার বার বলছেন তোকে একদিন নিয়ে যেতে!

—বেশ, ডিস্পেন্সারি বন্ধ হবার আগে তো যেতে পারছি নে। আমি বরং সাড়ে আটটা নাগাদ পার্টি অফিসে তোর ওখানে যাব, সেখান থেকে যাওয়া যাবে, কি বলিস্?

—তাই ভালো, এবার তবে চলি।

মন্দ নয়। নিজের তো হোটেলে বাস ছাড়া কোন গতি নেই। মুফংসে মুখ বদলানোর জায়গা হয়ে গেল দু'টো, এক, মুখার্জি কোয়ার্টার্স, দুই কমলদের বাসা। সেন্ট্রাল স্টোর্স-এর মুখার্জির ওখানে প্রায়ই ডিস্পেন্সারি থেকে ফেরবার মুখে আড্ডা জমে রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত। দোতলার উন্মুক্ত বেলকনিটা কী মনোরম। গ্রীষ্মের ফুরফুরে হাওয়া প্রাণ শীতল করে দেয়। তার ওপর মিসেস্ মুখার্জির অনবদ্য আতিথেয়তা। জীবনের যা কিছু অভাব যেন পূরণ করে দেয়। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে যায় দীপালির স্মৃতি। তাও যেন কেমন আবছা হয়ে আসছে।

একজন রুগী এসে ডাকে—ডাক্তারবাবু। চমকে উঠেন প্রথমটা। তারপর রুগীকে কাছে ডাকেন।

এমনি করে দিন গড়িয়ে চলে। পশ্চিম সীমান্তে মোটামুটি স্থিতিশীলতা ফিরেছে। এবার পূর্ব সীমান্তে দেখা দেয় একটা অস্থিরতা। ওপার বাংলার উদ্বাস্তুস্রোত এপার বাংলার দরজায় এসে আঘাত হানতে শুরু করেছে। সীমান্তের সব শহর এবং শিয়ালদা স্টেশন উদ্বাস্তু ভিড়ে ছয়লাপ। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ 'এস. ও. এস'-এর পর 'এস. ও এস' পাঠাচ্ছেন দিল্লীর দরবারে সাহায্যের জন্যে, কোন সাড়া নেই। ওরা ব্যস্ত পাঞ্জাব আর দিল্লী নিয়ে। পশ্চিম বাংলা বা কলকাতার জন্যে কোন মাথা ব্যথা নেই। তদুপরি খবর এল মাহাত্মা গান্ধী আমরণ অনশন ব্রত শুরু করেছেন।

কেন? কারণ দু'টি—এক দেশ বিভাগের চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তানকে দেয় পঞ্চান্ন কোটি টাকা দিতে ভারতসরকার অস্বীকার করেছেন, সাম্প্রতিক কাশ্মীর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে। বাপুজী বলেন, এই অস্বীকৃতি আন্তর্জাতিক আইনবিরোধী তো বটেই, মানবিকতাবিরোধীও। দুই, প্রতিদিন মুসলিম জনতা এসে তাঁর ওপর চাপ দিচ্ছে ভারত সরকার কর্তৃক তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেবার দাবিতে। ভারত সরকারকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সেই আশ্বাস দিতে হবে।

সবাই তখন বাপুজীর জীবনাশংকায় আতংকিত। বহু আলোচনারপর অনশনের তৃতীয় দিনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা পাকিস্তানের টাকা দেবার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পঞ্চম দিনে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের উদ্যোগে সব সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বাপুজীর শয্যা-পার্শ্বে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্যে তাঁরা সবাই দায়ী থাকবেন।

বাপুজী অনশন ভঙ্গ করেন। সারা ভারত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

কিন্তু পনেরো দিনও হয়নি, অকস্মাৎ ভারতের ভাগ্যাকাশে নেমে

আসে দুর্ভাগ্যের কালোছায়া। ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮। ডিস্-পেনসারি ছিল বন্ধ। ডাঃ চৌধুরী বিকেল পাঁচটায় চলে এলেন মুখার্জির কোয়ার্টার্স-এ। ড্রইংরুমে বসে সবাই বসে গল্প করছেন। রেডিওটা খোলাই ছিল। কে একজন শ্যামাসঙ্গীত গাইছিলেন। অকস্মাৎ গান বন্ধ হয়ে যায়। দেয়াল ঘড়িতে ছ'টার ঘণ্টা বাজে। ভেসে আসে বেহালা আর এস্রাজে মিলিত একটা করুণ সুর। শোনা যায় অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে ঘোষকের কণ্ঠস্বর—

"মহাত্মা গান্ধী ইহজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন। আজ বিকেল পাঁচটা বিশ মিনিটে বিড়লা হাউসে প্রার্থনা সভায় যাবার পথে আততায়ীর গুলিতে তিনি নিহত। সমবেত জনতা পিস্তলসহ আততায়ীকে ধরে ফেলে। ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এখনও জানা যায় নি। শুধু জানা গেছে আততায়ী একজন মারাঠি হিন্দু যুবক।"

ঘোষণা শেষে যন্ত্রসঙ্গীতের করুণসুরের তালে তালে কারা যেন গেয়ে যায় বাপুজীর প্রিয় গানটির দুটি কলি—

"রঘুপতি রাঘব রাজারাম,
পতিত পাবন সীয়ারাম।"

ধীরে ধীরে তাও মিলিয়ে যায়। একটা কবরের নিস্তব্ধতা। দূর থেকে প্রচণ্ড একটা কোলাহলের আওয়াজ কানে আসে। চমকে উঠে বাইরের দিকে তাকান ডাঃ চৌধুরী। কোথায় মুখার্জি, কোথায় তাঁর ড্রইংরুম? চেয়ে দেখেন বম্বে মেলটা মন্থরগতিতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঢুকছে খড়্গপুর স্টেশনের সুবৃহৎ দু' নম্বর প্ল্যাটফরমটায়। বহুদূর থেকে আগত পথশ্রান্ত ক্লান্ত পথিকের মত।

। পঁচিশ ।

প্ল্যাটফরমে তখন হুলুস্থুল কাণ্ড। অপেক্ষারত যাত্রীদের ঠেলাঠেলি। হাঁকাহাঁকি ডুবিয়ে দিয়ে চীৎকার করছে সংবাদপত্রের হকাররা। "জবর খবর, জবর খবর। চীনা সৈন্য বমডিলায় ঢুকে পড়েছে। জবর খবর—জবর খবর।

দরজাটা খুলে একটা ইংরেজী কাগজ কিনে নেন সুশীলবাবু। সে সুযোগে চার পাঁচজন যাত্রী ঢুকে পড়ে কামরাটায়। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে আসেন নিজের সিটে। কাগজটা তুলে দেন ডাঃ চৌধুরীর হাতে। তিন কলাম ব্যাপী বিরাট হেড-লাইনটায় নজর আটকে যায়।

CHINESE TROOPS ENTER BOMDILA
INDIAN TROOPS IN DISARRAY

তারপরই আবার ডানদিকে দু' কলাম ব্যাপী হেডলাইন—

UPROAR IN PARLIAMENT
M. P's DEMAND RESIGNATON OF MENON

নবাগত একজন যাত্রী বলেন—মশাই, একটু বসতে দেবেন ?

বার্থ-এ ছড়ানো বিছানাটা সুশীলবাবুর সাহায্যে জানালার দিকে গুটিয়ে নেন ডাঃ চৌধুরী। জড়ানো বিছানাটায় হেলান দিয়ে বসতেই কাগজটা তাঁর দিকে এগিয়ে দেন সুশীলবাবু।

খবরটা পড়ে নিয়ে সুশীলবাবুর হাতে আবার ফেরৎ দেন। তারপর উদাসনয়নে দূরের আকাশটার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ভাবতে থাকেন মাত্র ছ'বছর হ'ল, এরই মধ্যে চৌ এন-লাই ভুলে গেলেম বান্দুং-এ জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে এক ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তিনি—যে চুক্তি আজ "পঞ্চশীল" চুক্তি নামে বিশ্ববিখ্যাত। যার মূল আদর্শ বিভিন্ন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, ধনবাদী রাষ্ট্রই হোক বা সমাজবাদী রাষ্ট্রই হোক, যে কোন বিরোধ মিটিয়ে নিতে হবে আলোচনার মাধ্যমে, যুদ্ধের মাধ্যমে নয়। ভণ্ড-এরা সবই ভণ্ড! রাজনীতিকরা সবাই ভণ্ড, আদর্শের কোন বালাই নেই। মুখে আওড়ান শান্তির বুলি, পেছনে শানান মারণাস্ত্র।

কোনদিকেই আলোর আভাসমাত্র নেই। এমন কী বাপুজীর স্মৃতিও আজ বাষ্পের মত আকাশে মিলিয়ে গেছে। কংগ্রেস দলে দেখা দিয়েছে অন্তর্দলীয় ভেদাভেদ, ব্যক্তিত্বের সংঘাত। তিনি বলে-ছিলেন, স্বাধীনতার পর কংগ্রেসকে যেন গড়ে তোলা হয় সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানরূপে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে থাকবে শুধু অর্থ নৈতিক মতাদর্শ-ভিত্তিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। বাপুজীর শেষদিকের অন্যান্য পরামর্শের মতই এই পরামর্শটিও উপেক্ষা করে কংগ্রেসকেই দাঁড় করান হয় রাজনৈতিক দলরূপে। বিষবৃক্ষ রোপনের বিষময় ফল কিছুদিন পরই আত্মপ্রকাশ করে দুই নেতার মতভেদে। জওহরলাল বিশ্বাস করেন সমাজতন্ত্রে, সর্দার প্যাটেল বিশ্বাস করেন ধনবাদে। প্রশাসন চলতে থাকে সাময়িক একটা জোড়াতালির ভেতর দিয়ে।

কেন্দ্রে যদিও বা স্থিতিশীলতা বজায় থাকে, পশ্চিমবঙ্গে তা পরিণত হয় প্রকাশ্য কোন্দলে। বিদায় নিতে হয় গান্ধীবাদী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষকে। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন যুক্তিবাদী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

সেদিন মৌলালিতে মুখার্জির কোয়ার্টার্স এ সন্ধ্যেবেলার আসরে এসব কথাই হচ্ছিল। ডাঃ চৌধুরীর মারফৎ কমলও আজকাল প্রায়ই এ আসরে আসে। আজ সেও হাজির। সে গৌতমকে লক্ষ্য করে বলে—১৯৪৬ সালে মোগলসরাই থেকে কলকাতা

আসবার পথে তোকে বলেছিলাম স্বাধীনতা যদি আসে, তা হবে শুধুমাত্র হোয়াইট বুর্জোয়ার হাত থেকে ব্রাউন বুর্জোয়ার হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর। তারই ফলাফল কী দাঁড়াবে তাও বলেছিলাম। আমার কথাগুলো এবার অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে নিস্-যা বলেছিলাম তাই ঘটছে কী না। সে সম্ভাবনা ঠেকাবার জন্যেই এখন থেকেই আমবা নতুন স্লোগান তুলছি—ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়—

এমনি নানা কথায় আসরটা জমে ওঠে। তারই মধ্যে হঠাৎ ডাঃ চৌধুরীকে প্রশ্ন করে মুখার্জি—বাই দ্য বাই, পুনা যাবে ?

'পুনা ? কেন ?'—অবাক হয়ে বলেন ডাঃ চৌধুরী।

—ওখানকার মিলিটারি হাসপাতালে কিছু সাবপ্লাস যন্ত্রপাতি বিক্রয় হবে। তার মধ্যে একটা আধুনিক এক্সরে যন্ত্র পি জি হাসপাতালের জন্যে আনতে চান কর্ণেল চ্যাটার্জি। আমাকে বললেন পুনা গিয়ে ওটা পরীক্ষা করে দেখতে। আমি বললাম আমার সঙ্গে এক্স্পার্ট হিসাবে তোমাকে নিতে চাই। এক কথায় রাজী। এমন কি তোমাব যাতায়াত খরচ সরকার থেকেই দেওয়া হবে। এখন শুধু তোমার সম্মতি নিয়ে টিকিট কাটার পর্বটি বাকি।

—গৌরী সেনের পয়সায় পুনা বেড়ানো যাবে—এতে আপত্তি করব কেন ? কবে যাওয়া ঠিক করছো।

—ভাবছি, যদি রিজার্ভেশন পাওয়া যায় তা হলে পরশুদিন বম্বে মেল-এ যাব। তোমার বৌদিও যাবেন সঙ্গে, অবশ্যি তাঁর খরচটা আমার, গৌরী সেনের নয়।

কলকাতা-বম্বে। মেল ট্রেনেও প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টার জার্নি। কেমন করে কোথা দিয়ে কেটে গেল সময়টা কেউ টের পান নি। মনের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন সবাই। মুখার্জি বলেছিলেন যুদ্ধের সময় চাটগাঁয়ে স্পেশ্যাল অফিসার হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। কী করে দুবার জাপানি বোমার হানা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন— ১৯৪২-এ ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে দুপুর রাতে চাটগাঁ শহরে।

আরও বলেছিলেন, কেমন করে যেতে হয়েছিল ১৯৪৩-এর জুন মাসে কক্সবাজার থেকে সমুদ্রতীর বেয়ে পদব্রজে চাটগাঁ জেলার দক্ষিণ সীমান্ত টেক্‌নাফ-এ ; এমনি সব টুকিটাকি এ্যাডভেঞ্চার। মিসেস্ মুখার্জি বলেছিলেন সেই দুর্যোগের দিনে দুটি শিশু-সন্তান নিয়ে অসহায়ের মত ভেসে বেড়িয়েছিলেন আশ্রয় হতে আশ্রয়ান্তরে, কুমিল্লা, চাঁদপুর এবং সর্বশেষ কলকাতা। ডাঃ চৌধুরীও বলেছিলেন তাঁর শৈশবের কথা, কেমন করে শৈশবেই তাঁর মনে জেগেছিল ডাক্তার হবার উদগ্র বাসনা। কেমন করে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়েছিলেন তাঁর মা। কমল, দিলীপ, মণিকা মাস্টারদা সবার কথাই বলেছিলেন, পারেন নি কিছুতেই দীপালির কথা বলতে।

মিসেস্ মুখার্জি প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি আজও একা কেন, ঠাকুরপো ? বিয়ে করো নি ?

প্রশ্নটা শুনে মুখ ঘুরিয়ে চলন্ত ট্রেন-এর জানালাটা দিয়ে অপস্রিয়মান দূরের পর্বতশ্রেণীর দিকে শুধু তাকিয়েছিলেন অনেকক্ষণ। তারপর অশ্রুসজল চোখে বলেছিলেন, করেছিলাম বৌদি, কিন্তু ঘরাতে টেকে নি—

—সে কী ? মারা গিয়েছেন ?

—না, মারা যান নি, আমিই তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম অন্ধ একটা রাগের মাথায়।

শুনে সবাই চুপ করে যান। জানালায় মাথাটা এলিয়ে দেন ডাঃ চৌধুরী।

অনেকক্ষণ পর মিসেস্ চৌধুরী তাঁর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন—আমায় বলবে, কেন তুমি অমন রাগ করেছিলে ?

—বলব বৌদি ; তোমার কাছে কিছুই গোপন করব না। আজ নয়, সময়মত আর একদিন বলব।

পুণা' গিয়ে মিলিটারি হাসপাতালে টেলিফোন করে পরিদর্শনের

সময় স্থির হয় পরদিন সকাল আটটায়। যথাসময় মুখার্জি ও ডাঃ চৌধুরী চলে যান হাসপাতালে।

শহর আর দেখা হয় নি। মেশিনটা পরিদর্শন আর পরীক্ষার পর হাসপাতাল সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট মেজর মালহোত্রা চা পানের জন্যে অতিথিদের নিয়ে এলেন তাঁর আপিস ঘরে। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে দেয়ালে টাঙানো কয়েকটা ফটোগ্রাফের দিকে তাকাচ্ছিলেন ডাঃ চৌধুরী। একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি তাঁর হঠাৎ স্থির হয়ে যায়। উঠে গিয়ে ভালো করে তাকান ছবিটার দিকে। প্রথম সারিতে চেয়ারে বসে আছেন কয়েকজন সামরিক অফিসার। পেছনে দাঁড়িয়ে কয়েকজন মহিলা, স্পষ্টতই নার্স। মাঝখানে যিনি তাঁর পোশাক মেট্রনের। মেজর মালহোত্রাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন এঁকে আপনি চেনেন? অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে দেন মধ্যস্থলে দাঁড়ানো মেট্রনটিকে।

মুখার্জিও এসে দাঁড়ান দুজনার পাশে। মেজর মালহোত্রা জানান মহিলাটিকে চেনবার তাঁর সুযোগ হয়নি। তার আগেই তিনি এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন।

—কোথায়? বিচলিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন ডাঃ চৌধুরী।

—যতটা জানি টি. বি-তে আক্রান্ত হয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন নোনাভিলে টি. বি, স্যানাটোরিয়ামে। এখনও সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

—এঁর নাম?

—দীপালি বাগ।

একটা ক্লান্তি নেমে আসে সর্বাঙ্গে। বুকটাও কেমন ধড়ফড় করতে থাকে। মুখার্জিকে বলেন, চল এবার। কেমন একটা অস্বস্তি লাগছে।

হোটেলে ফিরে সটান শুয়ে পড়েন বিছানায়। মিসেস মুখার্জি একগ্লাস ফলের সরবত নিয়ে আসেন। নিঃশব্দে সরবতটা পান করে

চোখ বুজেন। বেলা বারোটা নাগাদ মুখার্জি ও তাঁর মিসেস এসে নিয়ে যান লান্‌চ্‌ টেবিলে।

খাওয়া শেষে বসবার ঘরে সোফায় বসে মিসেস মুখার্জি চেপে ধরেন, কোথায় তোমার ব্যথা আজ আমাদের বলতেই হবে, ঠাকুরপো। যদি না বল, তবে বুঝব এখনও তুমি আমাদের পর পর ভাবো। শেষ কথাটা অভিমান জড়িত।

সব কথা খুলেই বলতে হয়। সেদিন বিকেলের ট্রেনেই চলে যায় সবাই নোনাভিলের পথে। পুণা শহরটা পেছনেই রয়ে যায়, দেখা আর হয় না।

স্যানাটোরিয়ামে যখন পৌছুলেন তখন পশ্চিম আকাশে অস্তাচলগামী সূর্যের রক্তিম রশ্মি দূর পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আচম্বিতে ডাঃ চৌধুরীর চোখের সামনে ফুটে উঠে বহুদিন আগে পেছনে ফেলে আসা ঢাকায় বুড়িগঙ্গার পাড়ে পাশাপাশি দুটো চিতার আগুন। অজানা একটা অমঙ্গলের ছায়া নেমে আসে।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট-এর ঘরের সামনে গিয়ে একটা কার্ড পাঠাতেই তিনি ডেকে পাঠান; তিনজনই একসঙ্গে ঘরে ঢুকেন। সুপারিন্‌-টেন্‌ডেণ্ট ডাঃ খোসলে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানান। বেশ হাসিখুশি অমায়িক ভদ্রলোক। বিনম্র আচরণ।

নিজের পরিচয় দিয়ে মুখার্জি ও মিসেস্‌ মুখার্জিকে দেখিয়ে বলেন—দে আর মাই ফ্রেণ্ড্‌স্‌। অল্‌ ফ্রম ক্যালকাটা।

সবাইকে চমকে দিয়ে ডাঃ খোস্‌লে বলেন—হাউ স্ট্রেইন্‌জ্‌, জাস্ট্‌ দ্য ম্যান হুাই হ্যাভ বীন্‌ লুকিং ফর্‌ দ্য লাস্ট্‌ টু মান্‌থ্‌স্‌।

এবার অবাক হবার পালা ডাঃ চৌধুরীর। প্রশ্ন করেন—হোয়াট্‌ ডু ইউ মীন্‌ ডাঃ খোসলে?

সোজা বাংলায় জবাব দেন ডাঃ খোসলে। বলেন—আরে মশাই, আপনারা কলকাতার লোক। আমি সেখানে পুরো ছটা বছর কাটিয়েছি। ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ ইজ্‌ মাই 'আল্‌ম মাটের'।

সুতরাং আলাপ আলোচনা এবার বাংলাতেই চলে। ডাঃ চৌধুরী বলেন, আমায় খুঁজছিলেন কেন ?

—একজন রুগিণীর অনুরোধে, নাম দীপালি বাগ।

ব্যগ্রভাবে ডাঃ চৌধুরী বলেন—আমরা ওঁরই খোঁজে এসেছি। উনি কেমন আছেন ?

—ভাল আছেন বলতে পারলে খুশি হতাম। একটা লাংস্ অপারেশন হয়ে গেল মাস ছয় আগে। ওটা সেরে উঠতে না উঠতেই অপরটাও আক্রান্ত হয়েছে। আমাদের যথাসাধ্য করে যাচ্ছি ভাল করে তুলবার জন্যে। তবু এক একসময় মনে হয় ক্রমশঃ জীবনী-শক্তি যেন 'স্রিংক্' করে যাচ্ছে—বেঁচে আছেন 'বাই সীয়ার উইল-ফোর্স'।

চার জনে এসে বেড-এর পাশে দাঁড়াতেই দীপালি চোখ মেলে তাকায়। ডাঃ চৌধুরীর দিকে চোখ পড়তেই চঞ্চল হয়ে উঠে। চোখের কোণে হু'ফোঁটা অশ্রুকণা চিক্ চিক্ করতে থাকে। পকেট থেকে রুমালটা বের করে নিজের চোখটা ঢাকা দেন ডাঃ চৌধুরী। ডাঃ খোসলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দুজনকে লক্ষ্য করছিলেন। বললেন—পাশের চেয়ারটায় আপনি বসুন ডঃ চৌধুরী। মিঃ ও মিসেস মুখার্জিকে নিয়ে আমি চেম্বারে অপেক্ষা করছি। জবাবের অপেক্ষা না করে তিনজনই নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

চেয়ারটায় বসে দীপালির এলোমেলো চুলে হাত বুলোতে থাকেন। চাদরের আড়াল থেকে জীর্ণ হাতটি বের করে হাতটা চেপে ধরে দীপালি। চোখ বেয়ে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা নেমে আসে তার। রুমাল দিয়ে পরম স্নেহে তা মুছে দিতে থাকেন ডাঃ চৌধুরী। নিস্তব্ধতা ভেঙে দীপালিই প্রথম কথা বলে। কণ্ঠ এত ক্ষীণ যে প্রায় মুখের কাছে কান নিয়ে শুনতে হয়। বলে—এসেছো, কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেল, গৌতম।

দীপালির কপালে গালে হাত বুলতে বুলতে বলেন—মানুষের আট-ন' বছর এমন আর দেরি কী দীপা। তোমাকে সুস্থ করে তুলে আবার আমরা নতুন করে ঘর বাঁধব।

করুণ একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে দীপালির চোখে মুখে। বলে—এ রোগের মমতাহীন আক্রমণ থেকে অব্যাহতি নেই আমার, গৌতম। আমার মা-ও এ পথেই সংসারযাত্রা শেষ করেছিলেন। প্রায় প্রতি রাতেই স্বপ্ন দেখি, তিনি যেন হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছেন।

—ছিঃ, ওসব কথা মনেও আনতে নেই। এ অসুখ আজকাল আর আগেকার মত দুরারোগ্য নয়। বিশেষতঃ খোসলের মত এমন সংবেদনশীল ডাক্তার যেখানে রয়েছেন।

বুঝি সবই, কিন্তু আমাব এই ক্ষয়রোগগ্রস্ত বিধ্বস্ত দেহ আর ভাঙা মনটা নিতে তোমাকে দেবার মত কিছুই আর বাকী নেই গৌতম! আমার শেষ বাসনা পূর্ণ হয়েছে, তোমাকে দেখে গেলাম শেষবারের মত এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যাবাব পূর্বমুহূর্তে। শুধু একটা অনুরোধ, মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়বার পর আমাকে সমাধিস্থ করো এই মুক্ত আকাশের কোলে—বলে খোলা জানালা দিয়ে চেয়ে থাকে দূরের আকাশটার দিকে।

হঠাৎ দীপা গৌতমের মাথাটা বুকের কাছে টেনে নেয়। ফিস্ ফিস্ করে বলে—আর যদি সম্ভব হয় প্রতি বছর আমার সমাধিতে এই দিনটিতে একগুচ্ছ রক্তগোলাপ—বলেই গৌতমের বামগালে অসীম আগ্রহে একটি চুম্বন এঁকে দেয়।

চোখে নামে অশ্রুর বন্যা। আস্তে আস্তে তাঁর মুখটা ঘসতে থাকেন ডাঃ চৌধুরী। একটু সামলে নিয়ে বলেন—লালকেল্লার বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে সারা কলকাতা চষেছি আমি তোমার সন্ধানে। এবার তোমায় না নিয়ে কিছুতেই আমি ফিরব না।

হাঁপাতে হাঁপাতে দীপা বলে—তোমাকেও কী কম খুঁজেছি

আমি ? দুর্ভাগ্য আমার, আমাদের ইউনিট্ যেদিন রেঙ্গুনে পৌঁছুলো, তার আগের দিনই আই-এন-এ বন্দীদের নিয়ে শেষ জাহাজ রেঙ্গুন ছেড়ে চলে গেছে।

—তোমাদের ইউনিট ? রেঙ্গুন ? কী বলছ তুমি ?

—সে অনেক কথা। যদি বেঁচে থাকি মুখে বলব। আর যদি চলেই যাই, সব কিছু লিখে ডাঃ খোসলের নিকট জমা রেখেছি। তিনি তোমায় দেবেন, পড়ে নিও।

নার্স এসে মৃদু কণ্ঠে বলে—রুগীকে খাবার দেবার সময় হয়ে এল।

—স্যরি, সিস্টার। আমি এবার যাচ্ছি। দীপাকে বলেন—কাল সকালে আবার আসব। দীপা শুধু করুণ নয়নে মাথা নাড়ে।

পরদিন সকালে দীপালিকে কিছু বলবার সুযোগ আর মেলেনি। সকাল ৮টায় মুখার্জি দম্পতিসহ হাসপাতালে পৌঁছে দেখেন সব শেষ! দীপালির প্রাণহীন দেহটা একটা সাদা চাদরে ঢাকা। নার্স মুখ থেকে চাদরটা সরাতেই দেহটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন ডাঃ চৌধুরী।

ডাঃ খোসলের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় ক্রিশ্চান গোরস্থানে দীপালিকে সমাধিস্থ করে সবাই যখন ফিরে এলেন সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। একটা শীল-করা খাম ডাঃ চৌধুরীর হাতে দিয়ে বলেন—মিস্ বাগ এটা আপনাকে দেবার জন্যে আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। আজ আসি। কাল সকালে গাড়িটা পাঠিয়ে দেব, আপনাদের স্টেশনে পৌঁছে দেবে। গুড বাই।

॥ ছাব্বিশ ॥

ডাঃ খোসলে চলে যেতেই খামটা হাতে নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দেন ডাঃ চৌধুরী।

সীল ভেঙে খামটা খুলতে মোটা একটা চিঠির বাণ্ডিল হাতে পড়ে। তারই সঙ্গে অপর একটা সীলমোহরাঙ্কিত ছোট্ট খাম। সেটা সরিয়ে রেখে চিঠিটাই তুলে নেন পড়বার জন্যে। দীপা লিখছে—

নোনাভিলে টি ভি স্যানেটোরিয়াম

৩রা মার্চ ১৯৪৮।

প্রিয়তমেষু

গৌতম, আমি আজ কঠিন রোগশয্যায় শায়িত। আমার চিরদুঃখিনী মা এই রোগেই একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। আমিও সেই দিনটির অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছি। দুটি ফুস্‌ফুস্‌ই আমার ক্ষতবিক্ষত। বা' দিক্‌টার অপারেশন হয়ে গেছে মাস চার আগে। ঘা শুকোতে না শুকোতেই ডান দিকটা দ্রুত এগিয়ে চলেছে খারাপ হতে খারাপের দিকে।

ডাঃ খোসলে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ আছেন কী না যাদের খবর দেওয়া দরকার। আমি শুধু তোমার কথাই বলেছি, কিন্তু তোমার ঠিকানা জানি না বলে, এটুকু শুধু বলেছি হয় তো আই. এন্. এ বন্দী হয়ে লালকেল্লায় ছিলে। তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছে তোমাকে খুঁজে বের করবার জন্যে। একটা চিঠি লিখে তাঁর কাছে রেখে যাব, সন্ধান পেলে তোমাকে দেবার জন্যে।

গৌতম, মনে পড়ে ঢাকায় সেই রাতের কথা? যে রাতে তুমি বেরিয়ে গিয়েছিলে আমার সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করা ব্যভিচারের সামিল মনে করে? তুমি চলে যাবার কিছুক্ষণ পরই বাইরের দরজাটার কড়া সজোরে নড়ে ওঠে। তুমি ফিরে এলে ভেবে দরজাটা খুলতেই দেখি মূর্তিমান অভিলাষ দাঁড়িয়ে। আমি কাঠ হয়ে থমকে দাঁড়াই। আমাকে টানতে টানতে সে ঘরে এসে ঢোকে। বলে, ভেবেছিলে আমাকে জেলে পুরে দিয়ে তুমি নিষ্কণ্টক হবে? তা' হবে না। যদি গুছোবার থাকে গুছিয়ে নাও। কলকাতায় ফিরে যেতে হবে আমারই সঙ্গে।

চীৎকার চেঁচামেচি করে পাড়ার লোকজন হয়তো জড়ো করে ফেলতে পারতাম। কিন্তু তাতে কেলেঙ্কারী বাড়তো বই কমতো না। বলি, বেশ, তৈরী হচ্ছি, কিন্তু এক সর্তে—সাবা পথ যেতে হবে থার্ডক্লাসে, আর আমি যাব মেয়েদের কামরায়।

কী একটু ভেবে নিয়ে অভিলাষ রাজী হয় আমার প্রস্তাবে। সারাপথ শুধু একই ভাবনা—কলকাতা পর্যন্ত হয় তো নিরুপদ্রবেই যাওয়া যাবে। তারপর?

এই প্রশ্নের জবাব দিলেন স্বয়ং ভগবান্। ঢাকা মেল দুর্ঘটনার খবরটা তোমরা নিশ্চয়ই পরদিন সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠাতেই পড়েছিলে। অভিলাষ মারা গেল, আমি বেঁচে গেলাম।

দুর্ঘটনার পরদিন রিলিফ ট্রেন আমাদের নিয়ে কলকাতা রওনা হয়। ব্যারাকপুর এসে ট্রেনটা থামতেই আমার খেয়াল হল এখানেই তো সেনা বিভাগের একটা রিক্রুটিং সেণ্টার রয়েছে। চেষ্টা করলে মিলিটারী হাসপাতালে একটা নার্সের চাকুরী মিলবে না কী? পরিচপত্র এবং কোয়ালিফিকেশন সংক্রান্ত কাগজপত্র সঙ্গেই ছিল। দ্বিধা না করে নেমে পড়লাম। জিজ্ঞাসাবাদ করে রিক্রুটিং সেণ্টার খুঁজে পেতেও অসুবিধা হল না। চাকরিটাও পেয়ে গেলাম।

নতুন চাকরীর নিরাপদ আশ্রয়ে শুধু তোমার চিন্তায়ই আমার

সারা মনটাকে দখল করে থাকে। ভাবি, বিয়ের আগে তুমি যদি আমার ক্রীত জীবনের কাহিনী একটু ধৈর্য্য ধরে শুনতে তা হলে আজকের এই জটিলতার বন্ধন থেকে আমরা মুক্ত থাকতাম। জোর করে শুধু এটুকু জানিয়েছিলাম, আমি যখন মাতৃগর্ভে তখন বাবা-মা নিচুজাতের হিন্দু, আমি যখন ভূমিষ্ঠ হই, তখন ওঁরা ক্রিশ্চান। তখনও যেটা বলতে পারি নি তা' হল ওরা ছিলেন বাগদী। দিন-মজুরী আর বর্গাচাষ ছিল তাদের একমাত্র জীবিকা। সে বাধাও তোমার প্রেমের বন্যায় ভেসে গেল। কিন্তু সব কথা না বলে গেলে আমার আত্মা মৃত্যুর পরও শান্তি পাবে না। সেই কাহিনীই এবার লিখে যাব—এ আশা বুকে নিয়ে—এ চিঠি একদিন না একদিন তোমার হাতে পৌঁছুবেই।

তখন আমার বয়স সাত কি আটের বেশি নয়। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের সদর হাসপাতালটার পিছনদিকে ক্রিশ্চান পাড়ায় থাকি। 'আমরা' মানে—বাবা, মা আর আমি, এই নিয়ে ছোট্ট আমাদের সংসার। বাবার ডান পা খোঁড়া—টেনে টেনে হাটতে হয়। মার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। মেয়ে বলে বলছি না—মা আমার চলতি ধারণায় খুব একটা ফর্সা না হলেও রঙটা এমন মাজা তামাটে এবং মুখমণ্ডল ঘিরে এমন এটা অপরূপ লাবণ্য ছিল যার মায়া যে কোন পুরুষের মনে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পারে। শরীরের গঠনও ছিল রূপ লাবণ্যের সঙ্গে সমান্তরাল সুঠাম। কৃষ্ণনগরের মিশনারী হাসপাতালে দাই-এর কাজ করতেন মা। বাবা বাড়িতে বসেই বাঁশ বেত নিয়ে ঝুড়ি তৈরী করেন। পাইকাররা এসে কিনে নিয়ে যায়। বাঁশ বেতের জোগান ওরাই দেয়।

সামনের বড় রাস্তাটার ওপর একটা বাংলো প্যাটার্নের একতলা বাড়ি ছিল। সেখানে থাকতেন আলেকজাণ্ডার কালীমোহন বিশ্বাস নামে জনৈক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্। আমি তাঁর তিন চার বছরের একটি মেয়েকে দেখাশুনা করি। তিনজনে মিলে যা রোজগার

তাতেই গরীবের ছোট্ট সংসার ভালভাবেই চলে যায়। তা' ছাড়া বিশ্বাস সাহেবের সাহায্যে স্থানীয় মিশনারী স্কুলেও পড়বার সুযোগ মিলে যায় আমার।

বলতে পার ভালই কাটছিল দিন আমাদের। হ্যাঁ, বাহ্যতঃ তাই। কিন্তু তারই মধ্যে গোলাপের কাঁটা আমার বুকে বিধত। ছোটবেলায় তেমন কিছু বুঝতে পারিনি। এখন কিন্তু খানিকটা বুঝবার মত বয়স হয়েছে। একদিন কাঁটার খোঁচাটা আর সইতে না পেরে মাকে শুধোই বাবা কেন মাঝে মাঝে 'যা তা' বলে তাকে গালিগালাজ করেন। মা শুধু চোখ মুছেন আর বলেন, সে এখন তুই বুঝবিনে, আরও বড় হ', তখন বলব।

বছর চারেক পর বিশ্বাস সাহেবের অন্যত্র বদলির আদেশ এসে গেল। আমি তখন ফিফ্থ্ স্ট্যান্ডার্ড-এর ছাত্রী। বিশ্বাস সাহেবকে বলি—কাকাবাবু, আপনি চলে যাবেন আমার হয় তো আর পড়া হবে না। আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, ভেবো না, ভাল পাশ করেছো, দরখাস্ত দিলেই বেতন ফ্রী হয়ে যাবে। হেড্ মিস্ট্রেসকে আমি বলে রেখেছি। তা' ছাড়া আমার ঠিকানাও রেখে যাচ্ছি, প্রয়োজন হলেই লিখে জানিও। চোখের জলে ছোট্ট মিনিকে সেদিন বিদায় দিয়েছিলাম।

সন্ধ্যার পর বাবা মানুষ থাকেন না। তাড়ি খেয়ে বদ্ধ মাতাল। মাকে গালাগাল, উপরন্তু কোন কোন দিন মারধরও। এ অত্যাচার বেশিদিন মা সইতে পারলেন না। ঘুসঘুসে জ্বরে আক্রান্ত হলেন, সঙ্গে খুকখুক কাশি। কোন ওষুধেই কাজ হয় না। সুন্দর সেই ডাগর দুটি চোখ কোটরাগত, মাজাঘসা রঙে কালির কালিমা। গাল দুটো চুপসে গেছে। হাসপাতালের ডাক্তার অবশেষে জানান—ক্ষয়রোগে ধরেছে। ভাল খাওয়া দাওয়া, তদুপরি বিশ্রাম! শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া ছাড়া আর উপায় রইলো না। কৃপাবশে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মায়ের কাজটি আমায় দিলেন। স্কুল

যাওয়া আমার বন্ধ হয়ে গেল। এইট্থ্ স্ট্যান্ডার্ড থেকেই স্কুলের দরজা আমার সামনে বন্ধ হয়ে গেল। তবু চোখে জল নিয়ে হাসি মুখেই কাজ করে যাই মায়ের সান্নিধ্য পাব বলে।

একদিন সন্ধ্যায় রোগশয্যাশায়িনী মা আমায় যে কাহিনী শোনালেন তাতে আমার বুকে নেমে আসে বিরাট এক গ্লানির পাহাড়। মনে হল সংসারে বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই আমার। বাবা-মায়ের আমি জারজ সন্তান। শুনে মায়ের বুকে মাথা রেখে হাঁপুস নয়নে কেঁদেছিলাম, কতক্ষণ জানিনে। আমার হাত মাথায় বুলোতে বুলোতে মা বলেছিলেন, কাঁদিস নে রুপা, আশীর্বাদ করি, তোর জীবনে যেন এমন বিপর্যয় না ঘটে। অন্তরীক্ষে বসে মানুষের ভাগ্যবিধাতা হয় তো একটু মুচকি হেসেছিলেন। যাক, সে আর এক কাহিনী।

আমাকে সব জানাবার পর মায়ের বুক থেকে একটা বোঝা যেন নেমে গেল। সেদিন শেষ রাতেই সংজ্ঞা হারান, ভোর না হতেই সব শেষ।

আজ আর লিখতে পারছি না। হাতটা যেন অবশ হয়ে আসছে। রাতটা যদি বেঁচে থাকি কাল সকালে আবার লিখব।

৪ঠা মার্চ, ১৯৪৮

বাবার কোন হুঁস নেই। সময়মত খাবার পেলেই হল, নয় তো যা-না তাই বলে গালাগাল। সবই মাথা পেতে নিই। আর ধিক্কার দিই নিজের জীবনটাকে। যখন সব দিক অন্ধকার দেখি, দেয়ালে টাঙানো পরমপিতা যীশুখ্রীস্টের ছবিটাকে জানাই শতকোটি প্রণাম। মনে মনে বলি, পিতা, তুমি তো জানো কোথায় আমার জীবনের চরম লজ্জা, তুমি আমার বুকে বল দাও, বলে দাও কোন পথে আমার মুক্তি।

যাক আমার কথা, মায়ের কথাটাই বলি—যতটা সম্ভব সাদামাটা ভাষায়। প্রথম জানলাম আমাদের ভিটেবাড়ি ছিল নদে

জেলায় চাপরা থানার নিকটবর্তী কোন এক গণ্ডগ্রামে। আমাদের পাড়াটার পাশেই ছিল ক্রিশ্চান পাড়া। জীবিকা অর্জনের সম্বল ছিল বেত বাঁশের ঝুড়ি বোনা আর তিন বিঘে জমির বর্গা চাষ। যখন দুই-এরই বাজার থাকে মন্দা তখন দিন মজুরি। গরীবের সংসার মোটের ওপর সুখে-দুঃখে কেটে যায়।

কিন্তু তাও সইল না পোড়া অদৃষ্টের। শত্রু হয়ে দাঁড়ালো মায়ের লাবণ্যময়ী সুঠাম দেহটা। চোখ পড়ল জোতদার চক্রবর্তী মশায়ের। প্রথমে ঠারে-ঠোরে, পরে প্রকাশ্যে। মা লুকিয়ে থাকেন হেঁসেলে। গর্জে ওঠেন বর্গা কেড়ে নেবেন বলে। বাবা সবই দেখেন। একদিন আর সইতে না পেরে বলেন, তা বর্গা কেড়ে নেবেন তো কেড়ে নিন, দয়া করে এ গরীবের অচ্ছুৎ মাটিতে আর পা দেবেন না, জাত যাবে।

—বটে? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! দেখে নেবো'খন তোর ধড়ে কটা মাথা—গর্জাতে গর্জাতে চলে যান চক্কোত্তি মশাই।

—বাঁচা গেল, বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন বাবা। কিন্তু দিন সাতেক না যেতেই ঝড় এল অন্যদিক থেকে,একেবারে অপ্রত্যাশিত-ভাবে। তখন নদে' জেলার পুলিশ সুপার ফ্রেজার সাহেব। দোর্দণ্ড তার প্রতাপ। থানা পরিদর্শনে এলে রোজ রাতে তার একটা করে মেয়েমানুষ চাই। গেরস্ত বাড়ির মেয়েরা দরজায় খিল আটকে দেয়। গরীবের বাড়িতে খিলই থাকে না, তা' আটকাবে কোন ছাই। সাহেবের শিকার হতে হয় তাদেরই।

এ হেন ফ্রেজার সাহেব এলেন চাপরা থানা পরিদর্শনে। তখন চাষের মরশুম। সেদিন সকালে বাবা মাঠে গেছেন, মাও গেছেন বাবাকে এটা ওটা দিয়ে সাহায্য করতে। হঠাৎ সাহেবের ঘোড়া এসে তাদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে দারোগাবাবু আর একটি ঘোড়ার পিঠে। সাহেব বড়বাবুকে কী যেন বলে দুজনেই ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন।

সেদিনই সন্ধ্যায় যমদূতের মত দুই লাঠিধারী সেপাই এসে বললে—থানায় যেতে হবে। অপরাধ? সকালে পুলিশ সাহেবকে না কি বাবা অপমান করেছে। 'মিছে কথা, যাবনা আমি' বলেন বাবা।

—তুই না গেলে তোর বহুকে নিয়ে যাবার হুকুম আছে—বলেই একটা জোয়ান এগিয়ে আসে।

বাবা পথরোধ করে দাঁড়ান। মা পেছনের দরজা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেন। অপর সেপাইটা ছুটে গিয়ে ধরে ফেলে মাকে। বাবা পাগলের মত মায়ের সাহায্যে এগুবার চেষ্টা করতেই লাঠিটা দিয়ে এমন ঘা মারল সেপাইটা বাবার ডান পায়ে, সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। হাজার চেষ্টা করেও উঠে দাঁড়াবার শক্তি তার হারিয়ে গেল। মাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল সেপাই দুটো।

অনেক চেঁচামেচি, অনেক চীৎকাব করল প্রতিবেশিরা, কিন্তু সাহস করে কেউ এগুলো না। অবাক হবার কিছু নেই। সে যুগে ইংরেজ পুলিশ সাহেবের বিরুদ্ধে মুখ খুলবাব সাহস আর যারই থাক্, গবীব গ্রামবাসীদের ছিল না। ওরা চলে যাবার পর সবাই এলেন, বাবার ভূলুণ্ঠিত রক্তাক্ত দেহটা বয়ে নিয়ে গেলেন সরকারী হাসপাতালে। ডান পায়ের ভাঙা হাড় স্পিলিন্টার দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে মাঝরাতে বাবাকে নিয়ে তারা যখন ফিরে এল তখন দেখা গেল বিবস্ত্রবসনা অর্ধমৃতা মা বারান্দায় পড়ে আছেন।

পরদিন সকালে গ্রামবাসীরা অনেকেই এলেন, সমবেদনা জানালেন। ব্যাপারটা হিন্দুসমাজ কী চোখে নেবে তা নিয়েও অনেক কথা হল। সবাই বলেন একটা কঠিন সমস্যা বাবার সামনে, কিন্তু উপায় কেউ বাৎলাতে পারলেন না। শুধু একটা হতাশার ছবি এঁকেই চলে গেলেন।

এগিয়ে এলেন ক্রিশ্চান পাড়ার মোড়ল। বললেন—তুই

ভাল হয়ে উঠলেই চ' আমার সঙ্গে একদিন আমাদের পাদ্রী সাহেবের কাছে। তাঁর কাছে নালিশ জানালে একটা কিছু বিহিত হবে।

বাবা যেন অন্ধকারে আলোর পথ দেখতে পান। বলেন, তাই হবে, মোড়লদা।

মাস দুয়েক কেটে যায়। ভাঙা হাড় জোড়া লাগে বটে, কিন্তু একটা লাঠি হাতে নিয়ে ডান পাটা খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। মাঠে কাজ করবার শক্তিও হারিয়ে ফেলেন বাবা।

সুযোগ বুঝে চক্কোত্তি মশাইও বর্গাটা কেড়ে নেন, উপরন্তু হেসে হেসে বলেন—বামুনকে বাড়ি থেকে তাড়ালে এমনি শাস্তি হয়। এবার যাও, ঘর করোগে ম্লেচ্ছের উচ্ছিষ্ট বউকে নিয়ে। পঞ্চায়েৎ ডেকে তোকে একঘরে করে ছাড়বো আমি, অনন্ত। আমার নাম হারাণ চক্কোত্তি, যার ভয়ে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়।

একদিন সকালে ক্রিশ্চান পাড়ার মোড়ল এসে বলেন—চ' অনন্ত, পাদ্রী সাহেব রাজি হয়েছেন তোর সঙ্গে কথা বলতে। বলেছেন ক্রিশ্চান হলে আর কোনদিন তোদের গায়ে হাত দিতে সাহস পাবে না কেউ। এমন কী, ঐ ফ্রেজার সাহেবটা নিজে এসে তোকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে যাবে।

—ক্ষতিপূরণ? কী দেবে সেই শয়তানটা? টাকা? টাকায় কী আর নষ্ট ইজ্জৎ ফিরে আসবে, মোড়ল? কিসের লোভে জাতধম্ম খোয়াব আমি?

—কেন রাগ করছিস্? ভেবে দেখ দিকিনি, হিঁদুরা তোকে কোন সুখে রেখেছে আজ পর্যন্ত? এই সেদিন যে চক্কোত্তি মশাই এত সব অকথা কুকথা বলে শাসিয়ে গেলেন তাতেও কী তোর জ্ঞানগম্যি হবে না?

বাবা মুখ গুঁজে বসে থাকেন। খানিকক্ষণ কোন কথা বলেন না। তারপর তড়াক্ করে খোঁড়া পা নিয়েই উঠে দাঁড়ান।

তীব্রস্বরে বলেন, ঠিক বলেছো মোড়ল, সারা হিঁদু সমাজটার গায়ে পচন ধরেছে, জাহান্নমে যাক্ ওরা। চল, আর দেরি নয়।

সন্ধ্যাবেলা যখন উভয়ে ফিরে এলেন তখন 'অনন্ত বাগদী' হয়ে গেছে 'এ্যানটনি বাগ।'

বেলা হয়ে গেছে। এবার কলমটা রাখি। সন্ধ্যেবেলা আবার শুরু করা যাবে।

ক্রিশ্চান হবার পর মা-বাবাকে ক্রিশ্চানপাড়াতেই সরে যেতে হল। মোড়লই তার ব্যবস্থা করে দিলেন। আটমাস পর চাপরা ডিস্‌পেনসারির ডাক্তারের পরামর্শে মাকে ভর্তি করা হল কৃষ্ণনগর মিশনারি হাসপাতালে। সেখানেও ক্রিশ্চানপাড়ায় থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন মোড়ল।

যথাসময় মিশনারি হাসপাতালেই আমার জন্ম হয়। আমার রূপ দেখে ছোটবেলা থেকেই পাড়ার সবাই রূপা বলে ডাকতে শুরু করে। সেই থেকে পোষাকি নাম হয়ে গেল রূপালি।

মায়ের কথা শেষ হতেই প্রশ্ন করি—কিন্তু বাবা তো সব ব্যাপারটাই মেনে নিয়েছিলেন। তবু অযথা তোমাকে গালাগাল করেন কেন?

—ওঁর বাইরেটা দেখে ভুল করিস্ নে, মা। ভেতরে ভেতরে মনটা তার খুবই নরম। শয়তানদের কবল থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারেন নি বলে মনে তাঁর গভীর একটা ক্ষোভ জমা হয়েছিল। তারই মর্মান্তিক বেদনাকে ডুবিয়ে রাখতে চাইতেন আকণ্ঠ তাড়ি সেবনে। সন্ধ্যায় সেই নেশাতেই গালাগালের স্রোতে আমাকে ভাসিয়ে দিতে চাইতেন। রাত্রি শেষে নেশার ঘোর কেটে যেতেই আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্নার স্রোতে ভাসিয়ে দিতেন শিয়রের বালিশ। আমি চলে গেলে এই দুঃখী মানুষটিকে তোরই তো সামলাতে হবে, রূপা।

বলতে বলতে মায়ের কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। অশ্রুসিক্ত চোখে

ধরা গলায় আমি বলি, তোমায় কথা দিচ্ছি মা বেঁচে থাকতে বাবার গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগতে দেবো না আমি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সেই যে চোখ বুজলেন, আর খোলেন নি।

মা চলে যাবার পর বাবা যেন কেমন হয়ে গেলেন। কাজেকর্মে মন নেই; মুখ বুজে বসে থাকেন। খাবার সময় জোর করে টেনে এনে বসাতে হয়। চোখ দুটো ফুলে গেছে। সামনে না হলেও আড়ালে বসে কাঁদেন, বুঝতে আমার অসুবিধে হয় না। একদিনও আব মদ খেতে দেখিনি। অন্য জগতে যেন চলে গেছেন। আমি কিছু বলতে গেলেই চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়াতে থাকে।

দুপুর রাতে হঠাৎ একদিন আমার ঘুম ভেঙে যায়। মনে হল পাশের ঘরে বাবা কাঁদছেন। মাঝের দরজায় অর্গল ছিল না। নিঃশব্দে বাবাব বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। বালিশে মুখ চাপা দিয়ে কাঁদছেন বাবা। পাশে বসে মাথায় তার হাত বুলোতে থাকি। কান্না আরও বেড়ে যায়। আমার চোখেও ধাবা নেমে আসে।

একটু সামলে নিয়ে বেদনাভরা কণ্ঠে বাবা ডাকেন—রূপা!

—কী বাবা?

—গালাগাল আর মারধোর করতাম বলে অভিমানভরে তোব মা আমায় ফেলে চলে গেল। ভাবছি এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। তাই কলকাতা চলে যাব—

—কলকাতা? সেখানে তো আমাদের জানাশোনা কেউ নেই, বাবা। আর খরচও অনেক, চলবে কী করে?

—ও বাড়ির গোমেশের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। বেলেঘাটায় ম্যাচ্ ফ্যাক্টরিটাতে ও কাজ করে; সেখানেই আমাকে কাজ দেবে। মালিকের সঙ্গে কথা হয়ে গিয়েছে, বসে বসে কাজ, ম্যাচ বাক্সে কাঠি ভরা, দৈনিক মজুরি দু' টাকা। ওতে আমাদের দুজনার চলে যাবে।

—তা' না হয় হল, থাকব কোথায়?

—নিকটেই না কী খেটে খাওয়া মানুষদের বস্তি আছে, সস্তায় ঘর পাওয়া যায়। এও বলেছে গোমেস তোর যখন হাসপাতালের কাজ একটু-আধটু জানা আছে, কলকাতার কোন ভদ্র পরিবারে রোগীকে সেবা করবার একটা কাজও বা হয়তো জুটে যেতে পারে। তুই রাজী হলে, গোমেস সকালের লোক্যাল ধরবার আগেই তাকে পাকা কথা দিয়ে আসব।

পরদিন রাতে গোমেশ এসে জানায় সব ঠিক হয়ে গেছে। পাশের বস্তিতে একটা ঘরও মিলেছে, মাসিক ভাড়া তিন টাকা। তিনদিন পরই শুরু হল কলকাতার নতুন জীবন। কলকাতা সম্পর্কে মনে একটা ভয় ভয় ভাব যা ছিল তাও কেটে গেল মাস-খানেকের মধ্যে। বস্তিবাসীরা সবাই খুব কাছের মানুষ হয়ে গেল, কেউ বা দাদা, কেউ বা মাসী, কেউ বা দিদি, কেউ বা পিসি।

দিন আনন্দেই কাটছে। আর মন খুশি হয় যখন বস্তিবাসী জনৈক পিক্লুর সুপারিশে নিকটবর্তী অভিলাষ সরকার নামীয় এক ধনাঢ্যের গৃহে তার পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী মায়ের সেবার জন্য একটা কাজ জুটে গেল। দিনের বেলাতেই কাজ, রাত্রির জন্য অপর একজন পাশ করা নার্স আসে। মাইনে ভাল, মাসিক পঞ্চাশ টাকা।

সব আনন্দ ছাপিয়ে আর একটি সুখবর বয়ে নিয়ে এল গোমেস। আমাদের কৃষ্ণনগরের ঠিকানায় লিখিত কাকাবাবু মিঃ বিশ্বাসের একখানা চিঠি এনে আমার হাতে দেয় সে। চিঠিটাতে এণ্টালি বেনিয়াপুকুর রোড-এর একটা ঠিকানা। লিখেছেন, আজ সাতদিন হল তিনি শিয়ালদহ কোর্টে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট-এর কার্যভার গ্রহণ করেছেন। কোন একটা ছুটি উপলক্ষে কৃষ্ণনগর গিয়ে আমাদের দেখে আসবেন। বেনেপুকুর রোড-এর ঠিকানাতেই যেন চিঠির জবাব দিই।

কাকাবাবু কলকাতা এসেছেন। আনন্দে বুকটা লাফিয়ে উঠল। গোমেসকে জিজ্ঞাসা করি—বেনেপুকুরটা কত দূর, গোমেসদা?

—খুবই কাছে। আসছে শনিবার বেলা দু'টোয় ফ্যাক্টরি বন্ধ হবে। সেদিনই তোমার বাবা আর তোমাকে নিয়ে যেতে পারি মিঃ বিশ্বাসের ওখানে।

বাঁশের দেয়ালে টাঙানো যীশুর ছবিটাকে প্রণাম জানিয়ে মনে মনে বলি—দেবতা তোমার অসীম করুণা! নইলে মিঃ বিশ্বাসই বা কেন এত কাছে এসে যাবেন এই বিদেশে বিভুঁয়ে?

শনিবার বিকেলে মিঃ বিশ্বাসের কুঠিতে যখন পেঁছুলাম তখন বেলা চারটে বেজে গেছে। কোর্ট থেকে ফিরে বিশ্রামের পর বিশ্বাস-দম্পতি চায়ের টেবিলে বসে গল্প করছিলেন। আমাদের দেখেই দুজনেই লাফিয়ে উঠে হাত ধরে পাশের তিনটি চেয়ারে তিনজনকে বসিয়ে দেন। মিনি নিকটেই আর একটা চেয়ারে বসে কী যেন বুনছিল। আমাকে দেখেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বলে—কেমন আছ রূপাদি'? মিনি আর আগের মিনি নেই। সে এখন টগবগে কিশোরী, ফার্স্ট স্ট্যাণ্ডার্ডের ছাত্রী।

—খুব ভাল, তুই কেমন আছিস বল?—স্মিতহাস্যে জবাব দিই আমি।

অনেক গল্পগুজব হল। মা' মারা গিয়েছেন শুনে খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। সান্ত্বনা দিয়ে মিঃ বিশ্বাস বলেন—এক মা' হারিয়েছ, আর এক মা তো সামনেই বসে আছেন, দুঃখ কী। মিসেস বিশ্বাস আমাকে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরেন। আমার অবাধ্য চোখে জল এসে যায়। আবার প্রণত হয়ে দুজনের পদধূলি নিই।

বিদায় যখন নিলাম তখন সন্ধ্যা ৬টা বেজে গেছে।

ওঃ, অনেক রাত হয়ে গেল! একটা ক্লান্তিও নেমে এসেছে। আবার ওবেলা বসব। জানি না, কবে এ চিঠি শেষ করতে পারব। আদৌ পারব কী না' কে জানে?

৫ই মার্চ ১৯৪৮

অভিলাষবাবুর নাইট নার্স শিবানীর সঙ্গে ইতিমধ্যে বেশ ভাব-প্রণয় জমে উঠেছে। সন্ধ্যায় ডিউটি বদলের সময় দুজনে মিলে গল্প-গুজব চলে অনেকক্ষণ। হাঁড়ির খবরাখবরও জানা হয়ে গেছে। চিররুগ্ন বিধবা মা, তিনটি নাবালক ভাই-বোন নিয়ে তার ছোট্ট সংসার। যাবতীয় খরচ তার রোজগারেই চলে। সকালবেলাটা ঘণ্টা তিনেক, দুপুরের পর ঘণ্টা দুই ঘুমোতে হয় নিজের শারীরিক সুস্থতার তাগিদে। বাকি সময়টা এখানকার ডিউটি আর বাড়ির কাজকর্মেই কেটে যায়। শুধু অভিলাষবাবু সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলেই কেমন যেন গুটিয়ে নেয় নিজেকে। বলে, যার দৌলতে খাওয়া-পরা তার সম্পর্কে কোন কৌতূহল না রাখাই ভাল। কেমন একটা অস্বস্তি লাগে। তবু আর কোন কৌতূহল প্রকাশ করি না।

মাস দুই পর শিবানী একদিন বলে, অভিলাষবাবু তোমাকে ডেকেছেন।

বুকটা আমার কেঁপে ওঠে। জিজ্ঞাসা করি, কেন?

—সে আমি কী জানি? মালিক ডেকেছেন। দেখা করা-না-করা তোমার ইচ্ছে—চোখ দুটো কুঞ্চিত করে একটু কঠিনভাবেই কথাগুলো বলে শিবানী।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মনটাকে শক্ত করবার চেষ্টা করি। ভাবি, চাকরী করতে এসেছি, এত ভয় করলে চলবে কেন? যদি কোন বিপদ হয়ই কাকাবাবু তো রয়েছেন। শিবানীকে বলি—চলো।

ঘরে ঢুকে দেখি অভিলাষবাবু একটা বড় ইজিচেয়ারে বসে আছেন। ডানদিকে একটা টিপয়ে মদের বোতল ও গ্লাস। সামনে শুধু একটা চেয়ার। ওপাশের দেয়াল ঘেসে একটা সিংগল্‌বেড খাট। বেড কভার দিয়ে ঢাকা। আর কোন আসবাব নেই।

সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বলেন, বসো। এতদিন হয়ে গেল

দেখা দিলে না কেন? কোন জবাব না দিয়ে কম্পিত বক্ষে বসে পড়লাম।

শিবানীকে বলেন—গোপীকে বল আর এক বোতল সোডা দিয়ে যেতে।

শিবানী বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে আমিও উঠে দাঁড়াই। ডেকে বলি—শিবানী দি'। শিবানী শুনল কী শুনল না, বেরিয়ে গেল। আমিও দরজার দিকে পা বাড়াই। অভিলাষবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজা রোধ করে দাঁড়ান। অসহায়ভাবে আবার ডাকি—শিবানী দি'—

হায়েনার মত হেসে ওঠেন অভিলাষবাবু। বলেন, এ বাড়িতে আমার কথাই একমাত্র কথা। শিবানী কেন, আর কেউ এদিকে পা বাড়াবে না যতক্ষণ তুমি আছ। বসো, যাবে যখন আমি যেতে বলব। বলে আমার দিকে এগুতে থাকেন।

হাতের কাছেই মদের বোতলটা ছিল। তুলে নিয়ে দুর্জয় শক্তি ছুঁড়ে মারলাম পিশাচটার দিকে। মাথাটা মিস্ করে পেছনের দেওয়ালে লেগে টুকরো টুকরো হয়ে গেল বোতলটা। ভেতরে তরল পদার্থটা ছিট্‌কে বেরিয়ে অভিলাষবাবুর জামাটা ভিজিয়ে দিল। এক টুকরো কাঁচ তার ঘাড়ের বাঁ দিকটায় বিঁধে গেল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরুলো ক্ষতস্থানটা দিয়ে।

গুলি-খাওয়া বাঘের মত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জানোয়ারটা। ধাক্কা খেয়ে খাটটায় পড়ে গেলাম। আমাকে প্রবল-ভাবে চেপে ধরে অভিলাষ। নিঃশ্বাস আমার বন্ধ হয়ে আসে। চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়।

চোখ মেলে দেখি আমি এক অচেনা ঘরে নরম বিছানায় শুয়ে আছি। হাসপাতাল হাসপাতাল গন্ধ। তলপেটে অসহ্য বেদনা। সঙ্গে সঙ্গে অভিলাষের কামনার সেই হিংস্র দৃষ্টিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকি। কানের কাছে মুখ

এসে কে যেন বলে—কেমন আছিস্ মা, আমি তোর কাকাবাবু বলছি। চোখ মেলে ফিরে তাকাই। কাকাবাবু বলে চীৎকার করে তাঁর কোলে মুখ লুকোই। আলতোভাবে মুখটা আমার তুলে নিয়ে রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে দেন। বলেন, চেয়ে দেখ, তোর বাবাও এসেছেন। বাবাকে দেখে আমার চোখে আবার বন্যা নামে। নরম বালিশটায় মুখ ঢাকি। মায়ের কথা আবার মনে পড়ে। স্পষ্ট যেন দেখতে পাই, মায়ের ছায়ামূর্তি আকাশে ভেসে ভেসে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, আর বলছে, এ অত্যাচারের শোধ নে তুই, রূপা। তবেই তৃপ্ত হবে আমার আত্মা, মুক্তি পাবে নরক যন্ত্রণা থেকে। মুক্তি পাবে তোর বাবার মনের জ্বালা।

হতচকিত হয়ে মুখ তুলে তাকাই ওপরের সিলিংটার দিকে। মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করি—এ আমি কোথায়, কাকাবাবু?

—ক্যাম্প্‌বেল হাসপাতালে।

এখানে কেমন করে এলাম?

—সে অনেক কথা। তুই এখন ঘুমো। কাল সকালে আবার আসব। তখনই সব বলবো তোকে—বলে আমার মাথায় হাত বুলোতে থাকেন।

সকালে ঘুম ভাঙতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। নার্স এসে অতি যত্নের সহিত আমার প্রাতঃকৃত্যে সাহায্য করে। প্রাতঃরাশ সেরে শুয়ে পড়ি। একটু পরেই কোর্টের পথে কাকাবাবুও আসেন বাবাকে সঙ্গে নিয়ে। একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে আসেন। কাকাবাবু বলেন—মা, কাল সন্ধ্যায় যা' যা' ঘটেছে সব খোলাখুলিভাবে বল। লজ্জা করে কোন কথা গোপন করো না। আমি কোর্টে যাচ্ছি। ফেরৎ পথে ওবেলা আবার আসব।

পুলিশ ফিসার চেয়ারে বসে কাগজ আর পেন্সিল হাতে জিজ্ঞাসু-নেত্রে আমার দিকে তাকালেন। চোখ বুজে সব ঘটনা বলে চলি।

মায়ের সেই ছায়ামূর্তি আমার সামনে ভাসতে থাকে। বলা শেষে চোখ মেলে তাকাতেই পুলিশ অফিসার থ্যাঙ্কস্ বলে কাগজটা সই করবার জন্য আমার সামনে তুলে ধরেন। তার হাত থেকে পেন্সিলটা নিয়ে কম্পিত হস্তে সই করে দিই।

অফিসার চলে যেতেই সহানুভূতিসূচক কণ্ঠে নার্স বলে—এ নারীজীবনের মস্ত বড় এক অভিশাপ। আবেগভরে তার হাতটা চেপে ধরি। পাশে বসে ও আমার হাত-পা-গুলো মৃদু চাপে টিপতে থাকে। ধীরে ধীরে চোখ আমার বুজে আসে।

ওঃ, বড় ক্লান্ত। বেলা দশটা বেজে গেল। বিকেলে আবার বসা যাবে।

আমাদের জীবন পথে কাকাবাবুর ঘুরে ফিরে আগমন-নির্গমন যেন বিধির বিধান। ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে ফিরে তাকালেই দেখি তিনি তাঁর অভয়বাণী নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে। কথামত বিকেল পাঁচটায় আবার এলেন। ইতিমধ্যে কাকীমা আর মিনি ও এসেছে।

প্রথম কথা তুললেন কাকাবাবুই। বললেন, তোমার বাবা আর তুমি এখন থেকে আমাদের ওখানেই থাকবে। বেলেঘাটার নরককুণ্ডে তোমাদের আর থাকা চলবে না। অভিলাষ সেখানে তোমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না। তোমার বাবাকে আমাদেরই পাড়ায় একটা দোকানে কাজে লাগিয়ে দেব।

আনন্দে আমার বুকটা নেচে ওঠে। মিনি আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, কী মজা রূপাদি, তোমাকে আবার কাছে কাছে পাব।

মিনিকে একটা চুমু খেয়ে বলি—খুব মজা, ছুটির দিনে দুপুরবেলা গল্প করে কাটানো যাবে—বলেই খেয়াল হল চাকরীটা গেল, কাকা-বাবুর গলগ্রহ হয়েই কী বাকি জীবনটা কাটাতে হবে?

বিমর্ষমুখে কাকীমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলি—কিন্তু আমার চাকরীটা তো ছাড়তেই হবে, কাকীমা—

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে আমার মাথায় হাত রেখে কাকীমা বলে —শোন মেয়ের কথা। তা চাকরী না-ই বা রইল। তোর কী ইচ্ছে তাই বল দিকিনি—

একটু ভেবে নিয়ে পাশে দাঁড়ানো নার্সকে দেখিয়ে বলি—এঁদের মত ট্রেনড্ নার্স—

মুখেব কথা কেড়ে নিয়ে বলেন—বেশ, সেই ব্যবস্থাই হবে, এবাব তৈরী হয়ে নে তো। বাইরে গাড়ি রয়েছে, বাড়ি যাবি চ'।

নতুন আশ্রয়ে নতুন জীবন পেলাম। এখন আমরা অভিলাষের মত দুরাত্মাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু ওদের মত শয়তানেরা যে কতদূর যেতে পারে তা বুঝতে পারলাম যেদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর নতুন কাজ থেকে ফিরে এসে বাবা বললেন পিক্লু এসে তাঁকে শাসিয়ে গেছে, এব্যাপার নিয়ে ঝুট্-ঝামেলা করলে বাবার দেহে মুণ্ডু থাকবে না।

মনে আবার ভয় জাগে। রাত্তিরে খাবার টেবিলে বসে কাকা-বাবুকে একথা জানাতেই তিনি বলেন, কিছু ভয় করিস্ নি। আমি বেলেঘাটা পুলিশকে বলে দিয়েছি। ওঁরা দু' চারদিনের মধ্যেই অভিলাষ ও পিক্লুকে রেইপের দায়ে গ্রেপ্তার করে চার্জশীট্ দাখিল করবে।

শুনে একদিকে মনটা যেমন খুশি হয়, একটা সংকোচও জাগে। কোর্টে গিয়ে সাক্ষী দিতে হবে। ছিঃ। কিন্তু তখুনি আবার মায়ের ছায়া চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যে ছায়া দুরাত্মাদের শাস্তির জন্যে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথা গুঁজে খাবারের দিকে ঝুঁকে পড়ি।

কাকাবাবু বলেন—একটা কথা তোর কাছে জেনে নিই, কারণ

আমাকেও এ মামলায় সাক্ষী হতে হবে। তুই আমার কথা আর কাউকে বলেছিলি ?

মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করি, কেন ?

—ঘটনার দিন সন্ধ্যার পর একটি মেয়ে টেলিফোনে আমাকে বলে—রূপালি খুব অসুস্থ। অভিলাষ তাকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। আমি কিছু বলবার আগেই টেলিফোনটা সে ছেড়ে দেয়, তখুনি আমি গাড়ি নিয়ে ক্যাম্বেলে ছুটে যাই এবং তোর পরীক্ষা ও চিকিৎসার দ্রুত ব্যবস্থা করে বেলেঘাটা থেকে তোর বাবাকে আনিয়ে নিই। সে কে হতে পারে, তুই কোন ধারণা করতে পারিস্ ?

একটু ভেবে নিয়ে বলি, হ্যাঁ, পারি। মনে হয় অভিলাষের মায়ের নাইট নার্স শিবানী। কেন না, একমাত্র ওকেই একদিন কথাচ্ছলে তোমার কথা বলেছিলাম। কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না, কাকাবাবু, শিবানী কেন বলতে যাবে ? সেই তো আমাকে অভিলাষের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল এবং জেনে-শুনেই নিয়ে গিয়েছিল বলে আমার বিশ্বাস।

—কার মনে কী থাকে তা কী সব সময় বুঝতে পারা যায় রূপা ? ব্যাপারটা বোঝা যাবে পুলিশ তদন্ত শেষ হলে। আশা করি, সাত আট দিনের মধ্যেই পুলিশ রিপোর্ট এসে যাবে। বেলেঘাটার ও. সি. আমাকে জানিয়েছেন অনেক নতুন সূত্র পাওয়া গেছে চার্জশীট দাখিলের অনুকূলে।

দিন দশেক পরই অভিলাষ ও পিকলুকে গ্রেপ্তার করে হাজির করা হয় চার্জশীটসহ শিয়ালদা কোর্টে। কেস-এ কাকাবাবু অন্যতম সরকারী সাক্ষী বলে কাগজপত্র পাঠিয়ে দেন সেকেণ্ড কোর্টে। শিয়ালদহ কোর্টে নিরপেক্ষ বিচার পাবে না বলে হাইকোর্টে অভিলাষ-এর আবেদনক্রমে কেস ট্রান্সফার হয় ব্যাঙ্কশাল কোর্টে। সরকারী উকিলের জেরায় শিবানী একেবারে ভেঙে পড়ে, স্বীকার করে সেদিন

সন্ধ্যায় সে কাকাবাবুর নিকট টেলিফোন করেছিল; কারণ মেয়ের প'র মেয়ের ওপর অভিলাষের এই পৈশাচিক আক্রমণের খেলা সে আর কিছুতেই সইতে পারছিল না। সে নিজেও অভিলাষের অন্যতম শিকার এবং তারই ঔরসে জন্ম তার একটি মেয়ের। অভিলাষ আইন-আদালতের ঝামেলা এড়াবার জন্য শিবানীকে বিয়ে করবার প্রস্তাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তারপরও রূপালির ওপর অত্যাচার তার সকল সংকোচ ভেঙে দেয়। সেই কাকাবাবুকে টেলিফোন করে ব্যাপারটা জানিয়ে দেয়।

বিচারে অভিলাষের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হাইকোর্টে আপীল করেও রেহাই পায়নি সে। পিকলু খালাস পেয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ ছিল অভিলাষকে সে সাহায্য করেছে, কিন্তু এই অপরাধের উপযুক্ত সাক্ষ্য মেলে নি।

দেখতে না দেখতে দু'-তিন মাস কেটে গেল। শরীরটা কেমন যেন অসুস্থবোধ করি। ভাল করে খেতে পারি না। যা খাই তাই বমি হয়ে যায়। সকালবেলার দিকে মাথা ঘুরোয়। বিছানা ছেড়ে উঠতে আলস্যবোধ করি।

কয়েকদিন আমার অবস্থা লক্ষ্য করে কাকীমা একদিন বলেন—লজ্জা করিস্ নি মা, আমার মনে হয়, তুই মা হতে চলেছিস। চমকে উঠি কথাটা শুনে। তারপরই তাঁর কোলে মাথা রেখে হাঁপুস নয়নে কান্নায় ভেঙে পড়ি। তিনি শুধু আমার মাথায় হাত বুলোতে থাকেন।

কান্না যখন কমে এলো, ধরাগলায় বলি—এ লজ্জা আমি কোথায় লুকোব কাকীমা?

—কিছুই লুকোতে হবে না মা, উনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। এতে তোর নিজের তো কোন দোষ নেই। তোর মা-ও যখন সব লজ্জা সইতে পেরেছিল, তুইও পারবি। তাছাড়া, আমরা তো রয়েছি, ভয় কিসের?

মায়ের কথা তুলতেই আবার আমার চোখ জলে ভরে আসে। ইতিহাসের আবার সেই পুনরাবৃত্তি। মা-বাবার পাপ-পুণ্য সন্তানে বর্তায় বলে একটা প্রবাদ আছে। সুতরাং বেজন্মা কন্যার গর্ভে বেজন্মা সন্তান জন্মাবে এতে আর অবাক্ হবার কী আছে। শুধু পরিবেশের একটু হেরফের এই যা। সংসারটা আমার চোখে নিরর্থক হয়ে যায়। দৃষ্টিহীন চোখে খোলা জানালাটা দিয়ে একফালি আকাশটার দিকে তাকিয়ে থাকি, আর ভাবি—ভগবান, আর কত দুঃখ দেবে তুমি এই অভাগিনীকে ?

যথাসময় আমাকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে নিয়ে যান কাকাবাবু ও কাকীমা। তিনদিন জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দিন কাটে আমার। অবশেষে ডাক্তার বলেন সিজারিয়ান করতে হবে। বাবার সম্মতি নিয়ে তাই হলো। আমি বেঁচে উঠলাম। সন্তানটি রইল না। একটু সুস্থ হবার পর ডাক্তার বলেন, 'টিউবেক্' করে নেওয়া ভাল, নইলে ভবিষ্যতে বাচ্চা হলে জীবনসংশয় হতে পারে। সবার সম্মতি নিয়ে তাই হল।

মনে পড়ে গৌতম, যে রাতে প্রথম তুমি আমার তলপেটে হাত লাগালে সেই মুহূর্তে তোমার একটা তীব্র রি-এ্যাক্শন হয়। তোমার মনে লাগে সন্দেহের দোলা। আমি সব কিছু বলবার জন্যে মন শক্ত করে উঠে বসি। কিন্তু বাধা দিলে তুমি নিজে। বললে—যাক্, আগে যখন নিজেই আমি জানতে চাইনি কিছু, ও নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাব না। একদিকে ভয়, অপরদিকে লজ্জা, এ দুয়ের চাপে বলি বলি করেও আমি আর মুখ খুলতে পারিনি। কিন্তু ভবিষ্যতের অশনি সংকেত প্রতিমুহূর্তে আমাকে অনুসরণ করতে থাকে। স্বাভাবিক ঘরসংসার কিছুতেই আর বাঁধা সম্ভব হল না আমাদের।

যাক্, এখানেই আমার জীবনের এক পর্ব শেষ, শুরু আর এক পর্ব। বাবা তাঁর জীবনের দ্বিতীয় এ ধাক্কা সইতে না পেরে প্রবল

জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মাসখানেক পর পরলোকে গমন করেন। কাকা ও কাকীমা পিতৃ-মাতৃহীন আমার জীবনের শূন্যস্থান পূর্ণ করে দিলেন তাঁদের অগাধ ভালবাসা ও প্রীতির জোয়ারে। তাঁদেরই কৃপায় ক্যাম্বেল স্কুলের নার্সিং ট্রেনিং কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করি।

আমার মনোজগতেও ঘটে যায় বিরাট এক বিবর্তন। শিশু আর বৃদ্ধ ছাড়া সমগ্র পুরুষ জাতটার ওপরই জমে উঠে এক সীমাহীন ঘৃণা। প্রত্যেকটি পুরুষকে মনে হয় যেন এক একটা নারী খেকো জন্তু। তাদের সান্নিধ্য আমি সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলি। নার্সিং কোর্সে হাসপাতাল ডিউটিতে বা নার্স হয়ে কাজে যোগ দেবার পর যতটা সম্ভব 'মেইল ওয়ার্ড' ডিউটি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি। কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে সেদিন আকস্মিকভাবে তোমার সঙ্গে যখন ধাক্কা লাগে, তখন কেমন করে যে এগিয়ে গেলাম তোমার নাকের রক্তটা বন্ধ করতে তা আজও আমার সামনে একটা বিরাট বিস্ময়বোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

থামতে হল। নার্স রাগ করছে।

৬ই মার্চ, ১৯৪৮।

জেল থেকে অভিলাষ খালাস পাবার বছরখানেক আগেই আমার নার্সিং কোর্স শেষ হয়ে যায়। কাকাবাবু কাকীমা ছাড়া আমার পাশে দাঁড়াবার কেউ নেই। তাঁরও বদলীর সময় হয়ে এসেছে। একদিন আমায় ডেকে বলেন—মা, আমরা এখান থেকে চলে গেলে তোমার কী হবে তাই ভাবছি।

আমি শুধু অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকি। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না।

কাকাবাবু বলেন—ভয় করো না, আমি সব ভেবে রেখেছি। প্রথমতঃ, তোমার নামটা পাল্টাতে হবে আমার কোর্টে একটা এফিডেবিট দিয়ে। তারপর সামনের পুজোর ছুটিতে আমার সঙ্গে

যাবে ঢাকা। সেখানে মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে তোমার একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই নিশ্চিন্ত। অভিলাষটা জেল থেকে ছাড়া পাবার পর যাতে তোমার কোন পাত্তা না পায়, তারই ব্যবস্থা করতে চাই।

একটু হাসবার চেষ্টা করে বলি—দেখলাম তো, যত চেষ্টাই করি না কেন, বিপদ যেন আমার পিছু ছাড়ে না। আপনি যা বলবেন, তাই করে যাব। বাকিটা আমার ভাগ্যবিধাতাব হাতে।

কাকাবাবু তাঁর মস্ত থাবাটা দিয়ে আমার কাঁধটায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন—দ্যাট্‌স্ লাইক্ এ গুড্ এ্যাণ্ড ওয়াইজ গার্ল। বেশ, আজই চলো কোর্টে আমার সঙ্গে। এফিডেফিট্-এর কাজটা সেরে ফেলা যাক্।

কোর্ট থেকে যখন ফিরে এলাম, আমার নাম তখন—'দীপালি বাগ।'

মিট্‌ফোর্ডে কাজ পেতে কোন অসুবিধাই হয়নি। সেখানকার চীফ্ ডাঃ ঘোষ কাকাবাবুব নিকটতম বন্ধুদের অন্যতম। আমার সব অবস্থা বুঝিয়ে দিয়ে কাকাবাবু তাঁকে বললেন—আমার হয়ে ওর সব ভার আজ থেকে তোমাকে নিতে হবে।

ডাঃ ঘোষ বলেন—ডোন্‌ট্ ওয়ারি, আই স্যাল লুক আফ্‌টার হার।

ঢাকা স্টেশনে কাকাবাবুকে যখন বিদায় দিতে হল তখন মনে হল অপসৃয়মান গাড়িটার মতই যেন সারা পৃথিবীটা আমার সামনে থেকে সরে যাচ্ছে। একটা অনাগত আশঙ্কা আমার মনকে চেপে ধরে। কখন যে ট্রেনটা দৃষ্টিব বাইরে চলে গেছে তাও হুঁস নেই। সান্‌টিং এঞ্জিনের কর্কশ একটা হুইসিল কানে বাজতেই সম্বিৎ পেয়ে গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাইরে একটা হ্যাকনি ক্যারেজে উঠে গাড়োয়ানকে বলি, 'মিট্‌ফোর্ড হাসপাতাল।'

আজ আমি সত্যি একা, বড়ই একা।

সেই একাকীত্ব ভরিয়ে দিলে তুমি। জীবনে এল নতুন জোয়ার।

কাকাবাবুরা আমাদের বিয়েতে আসতে পরেননি, মিনির কাইন্যাল পরীক্ষা চলছে বলে। অনেক দুঃখ করে চিঠি দিয়েছিলেন আমাদের আশীর্বাদ জানিয়ে। সঙ্গে একছড়া হার। তারপর ঘটনার আবর্তে আমাদের জীবনে নেমে এল ট্রাজেডি। লজ্জায় সে কাহিনী তাঁদের জানাতে পারি নি। তুমি চলে গেলে সেনাবাহিনীতে, আমিও তাই। যুদ্ধ শেষে পুঁনায় এসে তোমার খবর নেবার চেষ্টা করেও কোন সন্ধান পাইনি। ধারণা হল নিশ্চই লালকেল্লায় বন্দী অবস্থায় রয়েছ তুমি। ছুটি নিয়ে সরেজমিনে খুঁজে দেখবার জন্যে দিল্লী যাব ভাবছি, কিন্তু তাব আগেই এই রাজরোগ আমাকে শয্যাশায়ী করে দেয়। এমনি করে আর সবারই মত ওঁরাও আমার জীবনের কক্ষপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। নিঃসঙ্গ আমি রোগশয্যায় শুয়ে কান পেতে কালের পদধ্বনি শুনি, কবে আমার শেষ পাড়ির ডাক আসবে তারই অপেক্ষায়।

এবার শুধু বর্মার কাহিনী বলেই আমার সব বলার ওপর যবনিকা টানব। ১৯৪৪ সালে জেনারেল স্লিম-এর চতুর্দশ আর্মির যে ইউনিট্‌টি ইম্ফল থেকে টিড্ডিমের পথে অগ্রসর হয় তারই মেডিকেল কোরে নিযুক্ত ছিলাম আমি। তুমিও সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে বর্মা-যুদ্ধে গিয়েছ ১৯৪২ সালে, আর্মি সোর্স থেকে ভারতে থাকা-কালীনই আমি জেনেছিলাম। ইম্ফলে থাকাকালীন আই. এন এর খবরটাও আমাদের কাছে গোপন ছিল না—যদিও কর্তৃপক্ষের চেষ্টার অভাব ছিল না সেনাবাহিনীব ভারতীয় অংশকে এ বিষয়ে অন্ধকারে রাখবার। যুদ্ধে যতই এগুতে লাগলাম ততই আমাদের কাছে পরিষ্কাব হতে থাকে কাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি। আই. এন এর ডেঞ্জারটার আর ধৃত ও আহত জোয়ানদের কাছে পুরোপুরি খবরটাই পেয়ে যাই শেষ পর্যন্ত। এমন কি, এও জানতে পারি আই. এন. এর ফিল্ড হাসপাতালের চার্জেই রয়েছ তুমি। আশা জাগে তোমার সঙ্গে হয় তো বা দেখা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু, হায়রে

কুহকিনী আশা। রেঙ্গুন পর্যন্ত ধাওয়া করেও তোমাকে ধরা গেল না। যেদিন আমরা রেঙ্গুনে পেঁাছুই তার আগের দিনই তোমাদের নিয়ে শেষ জাহাজ ভারতের পথে যাত্রা করে। আমাদের ফিরতে আরও ছ'মাস কেটে গেল। তারপরেই নোনাভিলের স্যানিটরিয়ামে শেষ যাত্রাব যাত্রী আমি বন্দিনী। তাই আমার দীর্ঘ কাহিনী ডাঃ খোসলার জিম্মায় বেখেই বিদায় নিতে হলো। এই চিঠির সঙ্গে রেখে গেলাম একটি পাঁচ হাজাব টাকার ওয়ার বণ্ড তোমার নামে এন্‌ডোর্স করে। আর রইল আমার শেষ অনুরোধ, আমার মৃত্যুদিনটিতে পারো তো আমার সমাধিতে দেবার ব্যবস্থা করো একগুচ্ছ লাল গোলাপ। আমাব দৃঢ় বিশ্বাস ডাঃ খোসলা যে-ভাবেই হোক্ তোমার হাতে এচিঠি পৌঁছে দেবেন।

এবার আমি সত্যিই মুক্ত। খুবই হালকা লাগছে মনটা—হালকা সুবে গাইতে ইচ্ছে জাগে—আমার কথাটি ফুরলো, নটে গাছটি মুড়লো। তা' না করে বরং অনুপস্থিত তোমার উদ্দেশ্যে জানাই অকৃত্রিম ভালবাসা আর শেষ চুম্বন। অমি দ্বিচারিণী বা বিশ্বাসঘাতিণী কী না সে বিচার তোমার হাতেই ছেড়ে দিতে আমার এতটুকু লজ্জা নেই। কারণ, তুমিই একমাত্র পুরুষ যার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল আমার অন্তবের অন্তঃস্তলে নিদ্রিত নারী সত্বাকে সোনার কাঠির স্পর্শে জাগিয়ে তুলতে। তাই আমার শেষ কামনা, যে নরপশুর আক্রমণ চিরজীবনের জন্য বঞ্চিত কবেছে আমাকে নারীজীবনের পরম সাধনা মাতৃত্বের পরম গৌরব লাভে, তেমন কোন শয়তানের সাক্ষাৎ যদি পাও, তাকে কিছুতেই তুমি ক্ষমা করবে না। আর তাই হবে আমার অবিনশ্বর আত্মার পরম তৃপ্তি।

সবারে আমার প্রণাম জানিয়ে এবার আমি বিদায় নিচ্ছি গৌতম। ইতি—

ভাগ্যহীনা
তোমারই দীপা।

পড়া শেষে একমনে তাকিয়ে থাকেন ডাঃ চৌধুরী চিঠিটার দিকে যেন এখনও পড়া শেষ হয় নি। ধীরে ধীরে মাথাটা তাঁর টেবিলের ওপর নুয়ে পড়ে। মিসেস চৌধুরী মাথায় হাত রেখে ডাকেন—রাত দশটা বেজে গেল, ঠাকুরপো, খাবে এসো।

কিছু না বলে চিঠিটা এগিয়ে দেন মিসেস মুখার্জির দিকে। উঠে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়ান উন্মুক্ত জানলাটার সামনে। আকাশে তখন তারকাদের মহামেলা। ওরা যেন মিটমিট করে' উপহাস করছে পৃথিবীর দিকভ্রান্ত মনুষ্যলোকে। দূর থেকে একটা গুম্‌গুম্‌ আওয়াজ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। বোধ হয় কোন মালগাড়ি। আরও কাছে আসে আওয়াজটা। মুখটা ঘুরিয়ে তাকান। কোথায় মিসেস মুখার্জি, পাশে বসে আছেন সুশীলবাবু। জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাতেই সুশীলবাবু বলেন পাঁশকুড়া স্টেশনে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকবার পর কোলাঘাট পেরিয়ে রূপনারায়ণ ব্রীজটা পার হচ্ছে ট্রেনটা।

মাথাটা আবার নুয়ে পড়ে জানলাটার উপর।

॥ সাতাশ ॥

পববর্তী দীর্ঘ বাবোবছব কেমন কবে কোথা দিয়ে যে চলে যায় আজ তা ভাল করে মনেও পড়ে না ডাঃ চৌধুবীর। চলন্ত ট্রেনের জানালাটায় মাথা বেখে শুধু ভাবেন জীবনের শেষ অঙ্ক এবার বোধ হয় শুরু হল তার। যে দীপালিকে খুঁজে বেবিয়েছেন এতদিন তাঁকে নিজেব হাতে কবব দিয়েছেন। যে আদর্শেব পেছনে ধাওয়া কবেছেন সেই শিশুকাল থেকে, আজ তাও সবে যাচ্ছে দিক্‌বলয়ের মত। দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধেব পবও শান্তি বইল ভবিষ্যতের গর্ভে। সব কিছুই যেন আজ অর্থহীন। সবই ছাযা, সবই মায়া।

নোনাভিলে থেকে যেদিন কলকাতা ফিরে এলেন মুখার্জি দম্পতিব সঙ্গে, মুখার্জি তাকে আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন এখন থেকে তাঁদেব কোযার্টাবে থাকবাব জন্যে। চৌধুবী বলেছিলেন আপাতত তাঁকে হোটেলেই নামিযে দেবাব জন্যে। ভেবেচিন্তে পরে তাঁদের জানাবেন।

তবু কিছুই আব জানানো হয় নি। একটা সর্বগ্রাসী অস্থিরতা তাঁকে পেয়ে বসে। হঠাৎ একদিন মুখার্জি জানতে পারলেন কম্পাউণ্ডারেব ওপব ডিস্‌পেন্‌সাবিব সব ভার দিয়ে ডাঃ চৌধুবী উধাও। সঙ্গে শুধু একটা বাক্সভর্তি নানাবোগেব ওষুধপত্র আর নিত্যপ্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসে ভরা একটা হ্যাভারস্যাক্।

তখন পূর্ব পাকিস্থান থেকে উদ্বাস্তুস্রোত পশ্চিমবাংলার সীমান্তে সাগরের ঢেউ এব মত অবিরাম আছড়ে পড়ছে। "রাজ্য সরকার

নাজেহাল। পশ্চিম পাকিস্থানের উদ্বাস্তু সাহায্যে ভারত সরকার যেমন ছিলেন দান সাগর, পূর্বপাকিস্থান উদ্বাস্তুদের বেলা দেখা গেল তার ঠিক তার উলটো। রাজ্য সরকারের সব আবেদন খুঁটিয়ে না দেখে ভারত সরকার কোনরূপ এ্যাড হক্ বরাদ্দ করতেও দ্বিধাগ্রস্থ। ডাঃ চৌধুরীর মনে পড়ে তাঁর সার্জারির গুরু ডাঃ ঘোষ তাঁকে বলেছিলেন—পীড়িত মানুষের এতটুকু কষ্টও যদি আমরা লাঘব করতে পারি, চৌধুরী তাই হবে আমাদের পরম সান্ত্বনা। অস্থায়ী শিবিরগুলোতে চিকিৎসার অভাবে মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে কলেরা, আমাশয় আর বসন্ত। এটাই তো পীড়িত মানুষকে সেবা করবার শুভলগ্ন। এ সুযোগ তো দুবার আসে না। বেরিয়ে পড়েন আর দ্বিধা না করে। দক্ষিণে বসিরহাট থেকে উত্তরে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার সীমান্তে শুরু হয় ক্লান্তিহীন পরিক্রমা। কখনো ট্রেন, কখনও নৌকো, কখনও গরুর গাড়ি, যখন যেটা মেলে। কিছু না মেলে তো পদযাত্রা। তাঁতের মাকুর মত একবার এদিক্ আর একবার ওদিক্।

আট ন' বছর এমনি করেই কেটে যায়। মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে রসদ নিয়ে যান—কারও সঙ্গে দেখা করেন না। আন্তর্জাতিক জগতে অনেক ঘটনা ঘটে যায়, জার্মানী, ভারতের মত কোরিয়া বিভাগ, বান্দুং সম্মেলন আর পঞ্চশীল নীতি ঘোষণা, মিসর আক্রমণে বৃটিশ অবিমৃষ্যকারিতায় বিশ্বব্যাপী ধিক্কার, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাণ্টনি ইডেনের পদত্যাগ—আরও কত চমকপ্রদ ঘটনা। কাগজে তা পড়েন আর ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে ডাঃ চৌধুরীর ওষ্ঠে। এই তো মানুষ, এই তো তার আদর্শবাদ! কত ঢক্কা নিনাদেই না বিশ্বের দরবারে হাজির হয়েছিল 'ইউনাইটেড ন্যাশনস্।" ছ' বছর যেতে না যেতেই ১৯৪৭ সালের ব্যর্থতার ধস নেমে এল তার স্কন্ধে, কাশ্মীর পর্বতে। সে সমস্যা আজও ঝুলছে বৃহৎ একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন নিয়ে। তার পূর্বসূরী "লীগ অফ নেশনস্'-এর মতই 'এ গ্র্যাণ্ড এ্যাণ্ড গ্ল্যামারাস্

ডিবেটিং ক্লাব'। যাক্‌গে, এ সব গালভরা বড় বড় কথা। তার চেয়ে অনেক কার্যকর উদ্বাস্তু শিবির থেকে উদ্বাস্তু শিবিরে চিকিৎসা করে বেড়ানো। ফুটিয়ে তোলা হতভাগ্যদের চোখেমুখে একটু হাসির রেখা।

এমনি করে বাংলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ছুটছেন তো ছুটছেনই। অবশেষে দেহটা প্রতিবাদ জানায়। চীৎকার করে যেন বলে—বিশ্রাম চাই, আমার বিশ্রাম চাই। তার দাবী না মেটালে একদিন হয় তো সব অন্ধকার হয়ে যাবে। মাস ছয়েকের জন্য কলকাতায় থাকতেই হয়। ট্রপিক্যাল-এ ভর্তি হয়ে দেহের যন্ত্রপাতিগুলোকে সতেজ করে বেরুবার মুখে চোখে পড়ে খবরের কাগজে একটি সংবাদ। বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবির থেকে বাসিন্দাদেব পাঠানো হবে দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের জন্যে। দণ্ডকারণ্য. হতভাগ্য বাঙালী উদ্বাস্তুর জন্য গভীর অবণ্য ছাড়া আব কোথাও জমি পাওয়া গেল না? পাঞ্জাবীরা তো পূর্ব পাঞ্জাব ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বিস্তৃত অঞ্চলে পুনর্বাসন পেয়ে বহাল তবিয়তে ঘরসংসার করছে, আজ তাদের জন্যে দরাজ হাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে তো কেন্দ্রীয় অর্থভাণ্ডারে এতটুকু টান পড়েনি অদ্যাবধি? আব বাঙালীব জন্য বারো বছর ধরে চলছে শুধু ভিক্ষুকের প্রাপ্য ডোল, নয় তো খুদকুড়োর মত খুব বেশি হলেও মাত্র পাঁচ শত টাকা ঋণ। যেন বড়লোকের মহোৎসবে ভিখিরি বিদায়। শেষ পর্যন্ত তাও জুটল না, যেতে হবে তাদের দণ্ডকারণ্যের বনবাসে। একবার এই নির্বাসনে রাজাব দুলাল রামচন্দ্র নয়, ছিন্নমূল, সহায়সম্বলহীন দেশবিভাগের শিকার কয়েক সহস্র বাঙালী পরিবার। আর বনবাসে পাঠাচ্ছেন তাঁরাই যাঁরা দিল্লীর মহাকারণে হিম শীতল ঘরে বসে কলমের এক আঁচড়ে এই ভাগ্যহীন নতুন ইহুদীদের মাতৃভূমিকে দু' ভাগ করে দিয়ে বললেন—আজ থেকে তুমি আর ভারতীয় নও, পাকিস্থানী। তারপর যখন শুরু হল গৃহযুদ্ধ, বন্যাস্রোতের মত নেমে এল

উদ্বাস্তস্রোত, তখন দিশেহারা হয়ে হাতে মোয়া নিয়ে এগিয়ে এলেন পুনর্বাসনের নামে।

আর তাতেও কী না দেখা দিল পূর্ব-পশ্চিমে দুমুখো নীতি? পশ্চিমের জন্য খোলা দরজা, পূবের জন্যে আধ-খোলা গবাক্ষ। অথচ কর্তাদের কোন লজ্জা নেই তার জন্যে। ত্রেতাযুগে তবু রামচন্দ্রের বনবাসে তাবৎ অযোধ্যাবাসী শোকে মূহ্যমান হয়েছিল। কলিযুগের এই নির্বাসিতদের আমরা বিদায় দিতে চলেছি অশ্রুজলে নয়, কুলোর বাতাসে। 'আপদ-বালাই গেল'—এমনি একটা ভাব। শিরদাঁড়া সোজা করে কেউ বললো না, বাংলা ভাগ করেছো তোমরা, যার ফলশ্রুতি আজ বাংলার বিরাট এক অংশ আজ গৃহচ্যুত। তাদের উপযুক্ত পরিবেশে পুনর্বাসন দেওয়া তোমাদের দায়িত্ব। সে পরিবেশ যতটা সম্ভব নদীমাতৃক দেশে, দণ্ডকারণ্যের মত পাথুরে জঙ্গলাকীর্ণ দেশে নয়। না, সে প্রশ্ন আন্তরিকতার সহিত সাহসে ভর করে যারা তুললো, একমাত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ কম্যুনিস্ট পার্টি। তা' ওদের কথা শুনবে কে? সবাই যে তখন স্বাধীনতার মোয়া খেয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন। হায় বাঙালি। শিখেছিলে শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মাহুতি দিতে. শেখো নি তুমি স্বাধীনোত্তর যুগে নিজের ন্যায্য পাওনা কড়ার গণ্ডায় আদায় করে নিতে—ক্ষোভের সঙ্গে নিজেকেই যেন বলেন, ডাঃ চৌধুরী।

বারো বছরের অস্থিরচিত্ততা আবার তাঁকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। এবার তাঁকে দণ্ডকারণ্যেই যেতে হবে। বেরিয়ে পড়েন 'ভায়া নাগপুর' বম্বে মেল ধরে দণ্ডকারণ্যের পথে। সঙ্গে সেই পথের সাথী যুদ্ধকালীন হ্যাভারস্যাকটা আর নানা ধরণের ওষুধ ভর্তি বাক্সটা।

পথঘাট কিছু জানা নেই। রায়পুর স্টেশন থেকে একটা উদ্বাস্তু দলের পিছু পিছু দুর্গম অরণ্য পথ ধরে দিন দুয়েক পর প্রথম উদ্বাস্তু শিবিরে পৌঁছেই তাঁর চক্ষুস্থির। 'যা কল্পনা করেছিলেন'

বাস্তব তাকেও হার মানায়। চারিদিক গভীর অরণ্যে ঘেরা। দিনের বেলায়ও ক্বচিৎ খানিকটা সূর্যালোক ঝিলিক্ মেরে যায় মাত্র। সন্ধ্যার পর নেমে আসে সূচীভেদ্য অন্ধকার। শোনা যায় বাঘের হুংকার বা শেয়ালের হুক্কা-হুয়া। আরও কত অজানা জন্তুর হাঁকডাক। রাতভর একটানা ঝিল্লির ঝংকার, জোনাকির ঝিক্‌মিক্। কৃষিকাজের জন্য কাটতে হবে জঙ্গল, ভাঙতে হবে পাথর। বেশির ভাগ দুই-ই।

যা ভেবেছিলেন তাই। নদীমাতৃক দেশ পূর্ববাংলার নরম মাটিতে চাষ যাদের চিরকালের অভ্যাস, তাদের পক্ষে জঙ্গল কেটে পাথব ভেঙে জমিকে চাষযোগ্য করে তোলা কত যে শ্রমসাধ্য তা মহাকরণে বসে পুনর্বাসন প্ল্যান করা বাবুরা বুঝবেন কী করে? বদলে পাবে কী ওরা? কৃষির জন্যে দেওয়া হবে কিছুটা 'ডোল' নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটাতে, কিছুটা ঋণ হাল বলদ কিনতে। এই নিয়ে তিন বছরের মধ্যে হতে হবে তাদের স্বনির্ভর! দোকান বা শিল্পকাজের জন্যে দেওয়া হবে শুধু ঋণ। স্বনির্ভর হতে হবে তিন মাসের মাথায়! অপূর্ব! যেন আলাদীনের প্রদীপ! জ্বালালেই জঙ্গল-পাথরের জমিটা ধনধান্যে পুষ্পভরা সুজলা সুফলা হয়ে যাবে! ধন্য কর্তাদের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত উদ্ভট্ সব পরিকল্পনা!

আরও মারাত্মক, বিশ মাইল পরিধির মধ্যে কোন ডাক্তার বদ্যি নেই। বাইরের কোন ডাক্তারই বনবাসে থাকতে নারাজ। এলেও দু'এক মাস পরই পালিয়ে যায়। শেষ ডাক্তার চলে গেছেন আজ তিন মাস হল। নতুন লোকের ব্যবস্থা এখনও হয়নি। তাতে একটা সুবিধা হল এই যে ক্যাম্প কমাণ্ডারের সঙ্গে দেখা করে 'ক্রিডানসিয়্যাল' দেখাতেই এক কথায় 'অন্-দ্য-স্পট' চাকরী মিলে গেল ডাঃ চৌধুরীর।

ক্যাম্প কমাণ্ডেন্ট মিঃ পরাশর পাঞ্জাবী হলেও পরিষ্কার বাংলায় কথা বলতে পারেন। বেশ সজ্জন আর হৃদয়বান ব্যক্তি বলেই

মনে হয় ডাঃ চৌধুরীর। দিন সাতেকের মধ্যে দুজনের মধ্যে সৌহার্দ বেশ জমে উঠে। একদিন তিনি অকপটে বলেন—সত্যি বলতে কী ডাঃ চৌধুরী, বাঙালী উদ্বাস্তুর জন্য স্থান নির্বাচন মোটেই ঠিক হয় নি—জাস্ট্ লাইক্ পুটিং এ স্কোয়ার পেগ ইন্ এ রাউণ্ড হোল। টু মেক দ্য বেস্ট্ আউট অব এ ব্যাড জব্—এছাড়া আমাদের কিছু করবার নেই।

—নয়াদিল্লীকে জানান না কেন?

জানিয়েছি বহুবার, ফল হয় নি। তাই চুপ করে যা করবার তাই করে যাচ্ছি।

সমমর্মী দুজনার মধ্যে অচিরেই গভীর বন্ধুত্ব জমে ওঠে, 'আপনি'র জায়গা দখল করে নেয় 'তুমি'। এই দুর্গম বনবাসে কে-ই বা আর আছে যার সঙ্গে দু'দণ্ড বসে মনের কথা বলা যায়?

একদিন সন্ধ্যায় পরাশরের কুঠিতে চা খেতে খেতে প্রশ্ন করেন ডাঃ চৌধুরী—আচ্ছা পরাশর, তুমি তো পাঞ্জাবের লোক, বাঙালী উদ্বাস্তুর জন্যে এত দরদ কেন তোমার?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধরা গলায় জবাব দেয় পরাশর—আমি ওদেরই মত একজন রিফিউজি, চৌধুরী। আমারও সবই ছিল—মা ছিল, বাবা ছিল, ভাই-বোন-স্ত্রী-পুত্র সব ছিল। আজ আর কেউ—বলতে কেউ নেই। শুনবে সে কাহিনী?

—বল, দরদভরা সুরে বলেন ডাঃ চৌধুরী, দুজনের অন্তরবেদনা একই কেন্দ্রে এসে ঘনীভূত হয়। তাঁরও যে আজ সংসারে কেউ—বলতে কেউ নেই।

—লাহোরের উপকণ্ঠে কোন এক গ্রামে সাধারণ মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্ম আমার—বলে চলে পরাশর—বড় ভাই সেনাবিভাগে লেফ্টানেণ্ট। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে ক্যান্টন্মেন্ট-এ একাউণ্টস্ সেক্সনে কাজ করি। বাবা মা সবাই

বেঁচে। দাদা আম্বালায় ভাবীকে নিয়ে থাকেন। একমাত্র বোনের বিয়ে হয়ে গেছে শিয়ালকোটের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। সুখে দুঃখে দিন কেটে যায়। এলো ১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগ। সব সুখ, সব শান্তির সমাপ্তি টেনে। এলো এক ভয়াবহ রাত—১৮ই আগস্ট।

লাহোরের মহল্লায় মহল্লায় আগুন জ্বলে উঠে। ক্ষিপ্ত মানুষ খুনের উন্মাদনায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য। তার নৃশংসতা, তার বীভৎসতা কাগজে নিশ্চয়ই তোমরা পড়েছ। কিন্তু কাগজ তার সঠিক বর্ণনা কতটা আর দিতে পেরেছে। আমাদের ভাগ্যে যা ঘটল তাই শুধু বলি তোমাকে।

'রাত তখন আটটা বাজে। দেশ ছেড়ে ভারতে যাবার জন্যে আমরা প্রস্তুত। দশটায় ক্যান্টন্‌মেন্টের ট্রাক এসে আমাদের তুলে নিয়ে যাবে। কম্পিত বক্ষে সবাই অপেক্ষা করছি। খানিকক্ষণ যাবৎ উত্তরদিক্ থেকে একটা হট্টগোল ও চেঁচামেচির আওয়াজ হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসছিল। ওদিককার আকাশটা রক্তবর্ণ, ক্ষণে ক্ষণে আগুনের ফুল্‌কি আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। বাবা ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেন—ওপাড়ায় আগুন লাগিয়েছে, এবার আমাদের পালা। চল আমরা পালাই, পরাশর।

বল্‌তে না বলতেই আমাদের পাড়ার প্রথম বাড়িটায় হামলাকারীরা আগুন ধরিয়ে দেয়। চীৎকার শোনা যায়—পাকিস্তান জিন্দাবাদ। খতম করো কাফেরকো—

আমি দ্রুত ঘর থেকে বন্দুকটা এনে উঠোনে দাঁড়াই। 'ওটা আমায় দে' বলেই বাবা বন্দুকটা টেনে ধরেন।

—সে হয় না, বাবা। আমি ওদের মোকাবিলা করছি, তুমি আর সবাইকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও।

উত্তেজনায় বাপ-বেটা দুজনেই বন্দুকটা নিয়ে টানাটানি করছি হঠাৎ গ্রাম করে একটা আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে বাবার দেহটা

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। একটা কথা বলবারও ফুরসৎ পেলেন না তিনি। আমিও তাঁর বুকের উপর লুটিয়ে পড়ি। আমাদের দুজনকে জড়িয়ে ধরে 'এ কী হল গো' বলে মা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

পরাশরের মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। টেবিলটায় মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। ডাঃ চৌধুরীর চোখও ঝাপসা হয়ে আসে।

একটু পর নিজেকে শক্ত করে নিয়ে পরাশর সোজা হয়ে বসে অস্বাভাবিক একটা ধীর শান্ত গলায় বলে—নিজের হাতেই বাবাকে খুন করে দিলাম। বুকের ক্ষত থেকে বাবার খুন ফিনকি দিয়ে আমায় রক্ত স্নান করিয়ে দেয়। আমি পিতৃহন্তা চৌধুরী, আমি পিতৃহন্তা। বাবার ছায়ামূর্তি আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তাই আশ্রয় নিয়েছি এই অরণ্যে। আজ আমি কী ভাবি, চৌধুরী জানো? ভাবি, বন্দুকটা কেন আমার হাতে আটকে রইলো না, পরশুরামের কুঠারের মত, যা দিয়ে আসমুদ্র ভারতের মনুষ্যরূপী ধর্মান্ধ জানোয়ারগুলোকে ধরণীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতাম। পরাশরের চোখে তখন অশ্রু নয়, আগুনের শিখা।

বলে চলে পরাশর—কাছেই একটা বন্দুকের আওয়াজ আর সঙ্গে সঙ্গে একটা পৈশাচিক হুংকার—আগ লাগাও, খতম করো কাফেরকো—

তড়াক্ করে উঠে দাঁড়াই পাসে পড়ে থাকা বন্দুকটা নিয়ে। তাক করে গুলি চালাই। মা উঠে আমাকে জাপটে ধরেন। উল্টোদিক থেকে একটা গুলি এসে মায়ের পিঠটা ভেদ করে লাগল আমার ডানহাতটায়। এই দেখো তার ক্ষতদাগ—জামার হাতাটা গুটিয়ে ডাঃ চৌধুরীর সামনে তুলে ধরেন।

গুলির আঘাতে সেই যে পড়ে গেলেন মা, আর উঠলেন না। আমিও পড়ে গেলাম্। আবছায়ত শুধু দেখতে পাই বাচাটাকে

কোলে নিয়ে বউ আমাদের ওপর আছড়ে পড়ছে। তারপর সব অন্ধকার।

পরাশর দম নেবার জন্য খানিকক্ষণ চুপ করে যায়। তারপর আবার শুরু করে—যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন আমি অমৃতসর মিলিটারী হাসপাতালে। পরে জেনেছিলাম দুর্ঘটনার কিছু পর ক্যান্টনমেণ্ট-এর ট্রাকটা আসে এবং আততায়ীদের ওপর গুলি চালায়। শুধু আমিই বেঁচে আছি দেখে আমাকে তুলে নিয়ে আসে। আমার বৌ বা বাচ্চার কোন খবর দিতে পারে নি ওরা। শুধু বলে, কোন জীবিত বা মৃত জেনেনা বা বাচ্চা ছিল না ওখানে। শিয়ালকোটেরবোনটিরও কোন খবর মেলে নি। হয় ওরা সব মরেছে, নয় ধর্মান্তরিত হয়েছে। এ ছাড়া কোন বিকল্প ছিল না রাষ্ট্রবিপ্লবের সেই রক্তস্নাত দিনগুলিতে।

'একমাস পর সুস্থ হয়ে গেলাম আম্বালায় দাদা-ভাবীর ওখানে। দাদার সুপারিশে দিল্লীর পুনর্বাসন দপ্তরে একটা চাকরীও জুটে যায়। কিন্তু সে মুখেও বিধি বাম। নবেম্বর মাসে দাদা মারা গেলেন কাশ্মীর যুদ্ধে। মাস ছয় পর ভাবীও চলে গেলেন এক মিলিটারী অফিসারকে বিয়ে করে। জীবনের যোগসূত্রও গেল ছিড়ে। আজ আমি একা—সম্পূর্ণ একা।'

দরদ-ভরা মন নিয়ে ডাঃ চৌধুরী বলেন, তোমার মত আমিও উদ্বাস্তু। তোমারই মত আমারও একদিন সব ছিল। আজ আর কেউ—বলতে কেউ নেই। পরিবেশটা যদিও ছিল অন্যরূপ, কিন্তু ফল এক—নিঃসঙ্গতা। দুটি নিঃসঙ্গ পথিক যেন দুই প্রান্ত থেকে ঘুরতে ঘুরতে একই জায়গায় এসে মিলিত হয়েছে। নিয়তি যখন এক, এ মিলনও বেশিদিন টিকবে না বলেই আমার আশংকা।

—সেই আশংকার ছায়া ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছি। সরাসরি উদ্বাস্তুদের সেবা করবার সুযোগ পেয়ে খুব উৎসাহ নিয়েই এসেছিলাম এখানে। কিন্তু কিছুদিন পরই টের পেলাম এটা যেন সরকারের

একটা দায়-সারা কাজ। পাঞ্জাবে দেখেছি কী দরাজ হাতে খরচ করছেন সরকার। কিন্তু এদের বেলায় সীমাহীন কার্পণ্য। তোমার চাকরীর স্যাংশন নিতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমাকে। এমন কী, মৃদু ভর্ৎসনাও করা হয়েছে আমাকে। অতিরিক্ত অর্থ-বরাদ্দের জন্যে লিখলেই জবাব আসে—ইউ মাস্ট কন্‌ফাইন্ ইউর-সেল্ফ্ টু দ্য রিসোর্সেস্ অলরেডি প্রভাইডেড্। এতদিন বলিনি তোমাকে। আজ সব কথাই খুলে বললাম। এই যেখানে পরিস্থিতি সেখানে ট্রান্সফার-এর জন্যে সব সময়ই প্রস্তুত।

আবার পরাশরই মুখ খোলে। বলে—দু প্রান্তের একই সমস্যার প্রতি ভারত সরকারের কেন এই দুমুখো নীতি কিছুতেই আমি বুঝে উঠতে পারি নে চৌধুরী—।

—আমিও যে বুঝি তা নয়। তবে খানিকটা অনুমান করি—

—কী তোমার অনুমান।

সে অনুমানের ভিত্তি একমাত্র অতীত ইতিহাস। বলতে অনেকটা সময় লাগবে। রাত হয়ে গেল, আজ যাই। আর একদিন বলা যাবে। বলে উঠে দাঁড়ান ডাঃ চৌধুরী।

পরাশর নিজেই জীপটা চালিয়ে ডাঃ চৌধুরীকে তাঁর তাঁবুতে পৌঁছে দিয়ে আসে।

দিন দশেক পর একদিন অপরাহ্ণে পরাশরের পিয়ন এসে ডাঃ চৌধুরীর হাতে একটা চিরকুট দিয়ে যায়—কাম্ এ্যাণ্ড হ্যাভ্ এ ফেয়ারওয়েল ড্রিংক্ দিস্ ইভ্‌নিং।

এ ফেয়ারওয়েল ড্রিংক্? তবে কী পরাশরের ট্রান্‌সফার অর্ডার এসে গেল? চিন্তিতমনে সন্ধ্যা সাতটায় পরাশরের কুঠিতে পৌঁছে দেখেন ছোট্ট টেবিলটার সামনে বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসে আছে পরাশর। ইঙ্গিতে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে একটা কাগজ তুলে দেন ডাঃ চৌধুরীর হাতে।

জিজ্ঞাসুনেত্রে পরাশরের দিকে তাকাতেই সে বলে, ট্রান্‌স্‌ফার

অর্ডার যেটা আমি আশংকা করছিলাম কিছুদিন থেকেই। এবার বাংলাদেশের প্রতি দিল্লী দরবারের ডিস্ক্রিমিনেটরী ট্রিট্মেন্ট-এর পেছনে যে ইতিহাসটা আমাকে বলবে বলেছিলে সেটা শুনে যেতে চাই। আমার সাকসেসর্ ক্যাপ্টেন বিজয়প্রসাদ যে কোনদিন এসে যেতে পারে। তখন আর সময় হবে না।

সামনে রাখা আর একটা গ্লাসে চুমুক দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে পরাশরের দিকে তাকিয়ে বলেন ডাঃ চৌধুরী—এই বনবাসের একমাত্র সাথীকেও শেষ পর্যন্ত হারাতে হল। মাইন্ ইজ্ এ কার্সট্ লাইফ, পরাশর। আমি না এলে হয়তো তোমায় যেতে হত না।

—মাইন্ ইজ্ নো লেচ্ কার্সট্ দ্যান্ ইওর্স্—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে পরাশর। যাই হোক, ভবিতব্য না মেনে উপায় নেই। তুমি শুরু কর এবার।

একটু ভেবে নিয়ে বলে চলেন ডাঃ চৌধুরী কেমন করে দূর অতীত ১৬৯০ সালে, যেদিন জব চার্নক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হয়ে গঙ্গার পূর্বতীরে সুতানুটীতে প্রথম খুঁটি গেড়েছিলেন, সেদিন থেকে তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল কলকাতা নগরী ইংরেজদের যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য আর প্রশাসনকেন্দ্ররূপে। এখান থেকেই শুরু হয় ভারত সাম্রাজ্য পত্তনের অভিযান। ক্রমে ক্রমে কলকাতার সঙ্গে গড়ে ওঠে তাদের একটা আত্মিক সম্পর্ক—ভালবাসা মিশ্রিত একটা আন্তরিক দরদ। দীর্ঘ একশ' বিশ বছর ধরে ভারতের রাজধানী হবার গৌরব জুটল কলকাতার। সারা ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের মেরুদণ্ডরূপে দেখা দেয় নগর কলকাতা আর তার পার্শ্ববর্তী গঙ্গার দুধারের সমগ্র অঞ্চল। বাংলার জমিদার এবং ইংরেজি শিক্ষায় আলোকিত মধ্যবিত্ত সমাজ হয়ে ওঠে ইংরেজ শাসনযন্ত্রের প্রধানতম খুঁটি। বাংলাদেশ ভারতের আর সব অঞ্চলকে পেছনে ফেলে শিক্ষা ও সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। বাঙ্গালীর মনে জেগে

ওঠে একটা আত্মপ্রসাদ ও উন্নাসিকতার মনোভাব। অন্যান্য অঞ্চলবাসীদের অবচেতন মনে জমা হতে থাকে একটা চাপা বিদ্বেষ।

ইংরেজ ভেবেছিল বাংলাদেশ তাদের কাছে থাকবে চিরকৃতজ্ঞ। নিয়তির পরিহাস, সেই বাংলাই বিদ্রোহের ধ্বজা নিয়ে দাঁড়াল ১৯০৫ সালে। প্রবল আন্দোলন শুরু হয় বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে। অগ্নিগর্ভ সেই আন্দোলন জন্ম দেয় সন্ত্রাসবাদ। শত শত বাঙ্গালী তরুণ বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার আর বোমা হাতে। বৃটিশ সরকার প্রাথমিক কূটনীতিক চাল চালেন ১৯১১ সালে। এক ফরমানে রদ হয় বঙ্গ ভঙ্গ, অপর ফরমানে রাজধানী অপসারিত হয় দিল্লীতে।

কলকাতা তবু রয়ে গেল কলকাতাতেই, শিল্প-বাণিজ্য, সংস্কৃতি, সব কিছুরই প্রধানতম কেন্দ্র রূপে। বাংলার সমৃদ্ধিও রইল অটুট। ইংরেজ বণিকরাও রয়ে গেলেন যে যেখানে ছিলেন সেখানেই! ভারসাম্যহীন ভারত-তরণী চলতে থাকে আগেরই মত পুবদিকে কাত হয়ে, ১৯৪৭ সালের অবিস্মরণীয় সেই মধ্যরাত্রি পর্যন্ত, যখন ঘুমন্ত পৃথিবীর বুকে জেগে উঠেছিল তথাকথিত স্বাধীন ভারত।

সে রাতেই বাংলার বুকে নেমে এল প্রথম আঘাত। বাংলার অগ্রগতির মূল সম্পদ চা ও পাট শিল্প। স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভাতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এই দুই শিল্প থেকে আহৃত রাজস্ব আর বাংলার নিজস্ব রাজস্ব বলে গণ্য হবে না, জমা পড়বে কেন্দ্রীয় তহবিলে—যার নাম দেওয়া হল "কনসোলিডেটেড্ ফাণ্ড"। এই এই নীতিটাই ক্রমে ক্রমে রূপ নিতে থাকে অন্যান্য রাজ্যের প্রতি সূক্ষ্ম একটা পক্ষপাতিত্বে। বাংলার দিকে এবাউট্ টার্নের একটা মনোবৃত্তি দানা বাধতে থাকে দিল্লীর দরবারে। আমার ধারণা বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের প্রতি ঔদাসীন্য বা কার্পণ্যের জন্য প্রধানতঃ দায়ী এই মনোবৃত্তি। তা ছাড়া, আর একটা কারণও অনস্বীকার্য। পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা টর্নেডোর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল

দিল্লীর কর্তাদের ঘাড়ের ওপর। বাঙালী উদ্বাস্তুদের বেলা তা' হয় নি। পূর্ব পাকিস্থানে বা পশ্চিম বাংলায় পাঞ্জাবের মত বিস্ফোরণ ঘটেনি। এখানে উদ্বাস্তুস্রোত দ্বিমুখী ছিল না। যাও বা ছিল তাও ছিল—স্পরেডিক—মাঝে মধ্যে পূর্ব পাকিস্থানে হাঙ্গামা একটা কিছু হলেই ওদিক হতে উদ্বাস্তুস্রোত শুরু হত। কিন্তু তাই বলে, পশ্চিমবাংলার ওপর মোট চাপ পাঞ্জাবের চেয়ে কম নয়। পশ্চিম-বাংলাতেও উদ্বাস্তুর সংখ্যা এক কোটির মত। আর চাপটা পড়েছে বেশিরভাগ কলকাতা আর পশ্চিমবাংলার সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর ওপর। মোদ্দা কথা, ভারত বিভাগের দিন থেকেই বাংলাব অগ্রগতি স্তব্ধ এবং তা মোড় নিয়েছে পশ্চিমদিকে।

কিন্তু ভেবে দেখ পরাশর, যারা জন্ম থেকে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত নিজেদের জানতেন তারা ভারতবাসী, হঠাৎ ১৫ই আগস্ট সকালবেলা জেগে উঠে জানালেন তারা হয়ে গেছেন পাকিস্থানী! এই পরিবর্তনের জন্যে তাদের একবার মতামত নিয়েছিলেন কী কর্তারা?

আর কথা এগোয় না।—উই আর অল ভিক্টিম্স্ অব্ পাওয়ার লাভিং পলিটিসিয়ান্স—শেষ কথা বলে সে রাতে পরাশরকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন ডাঃ চৌধুরী।

তিনদিন পর ক্যাপটেন বিজয়প্রসাদকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন পরাশর।

পক্ষকাল পরই কয়েকটি উদ্বাস্তু পরিবারের ওপর পুনর্বাসন এলাকায় যাবার আদেশ জারি হল। পঙ্গু, শিশু আর মেয়েদের জন্যে শুধু যথা সম্ভব যানবাহনের ব্যবস্থা থাকবে তিন দিনের মাথায়, আর সবাইকে যেতে হবে পদব্রজে ক্রোশ দশেক পথ। চিহ্নিত ব্যক্তিরা যেন প্রস্তুত থাকে। ডাঃ চৌধুরী যাবেন, পথিমধ্যে কারও

অসুখ বিসুখ হলে তারই তত্ত্বাবধানের জন্যে। শিবিরে প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দেয়। কেউ যাবে না। লিখিতভাবে ক্যাপ্টেন বিজয়প্রসাদকে জানানো হয়। পাঁচজনের একটি উদ্বাস্তু প্রতিনিধি দল সরেজমিন পরিদর্শন করে যদি রিপোর্ট দেয় গন্তব্যস্থান কৃষিকার্যের উপযুক্ত তবেই তারা যাবেন, অন্যথা নয়।

এই বক্তব্যে ডাঃ চৌধুরী তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানান। ক্ষিপ্ত হয়ে বিজয়প্রসাদ বলেন—ডোণ্ট ইন্‌স্‌টিগেট দিজ্‌ লেজি ফেলোজ। মাই অর্ডার স্ট্যাণ্ডস্‌। ইউ মাস্‌ট্‌ ক্যারি ছাট্‌ অর্ডার।

ডাঃ চৌধুরী যতই বোঝাতে চান এতগুলো লোককে এখনই ওখানে ঠেলে পাঠানো মানে মৃত্যুর কোলে তাদের ঠেলে দেওয়া, ততই ক্ষেপে যান ক্যাপ্টেন বিজয়প্রসাদ। শেষ পর্যন্ত ভারসাম্য হারিয়ে চীৎকার করে বলেন—ইউ আর ইম্‌পারটিনেণ্ট, ডক্টর। আই এম হিয়ার টু গিভ অর্ডারস, ইউ আর হিয়ার টু ক্যারি দেম্‌ আউট্‌।

এবার ডাঃ চৌধুরীও মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন না। দৃঢ়স্বরে বলেন—ইউ ফরগেট্‌ ক্যাপ্টেন, আই এ্যাম্‌ এন্‌ আর্মি মেজর—ওয়ান স্টেপ্‌ এহেড্‌ অব্‌ ইউ ইন্‌ র‍্যাঙ্ক। ইউ কান্‌ট্‌ গিভ্‌ অর্ডারস্‌ টু মী, মাইনড ছাট্‌। বিসাইড্‌স্‌ আই এ্যাম্‌ হিয়ার টু লুক্‌ আফ্‌টার ছ সিক্‌, এ্যাণ্ড এ্যাম গোয়িং টু ইস্যু এ্যা সার্টিফিকেট্‌ ছাট্‌ দে আর টু সিক্‌ টু মুভ্‌। ইউ সেণ্ড দেম্‌ এ্যাট্‌ ইওর অউন রিস্‌ক্‌।—বলেই যাবার জন্যে ডাঃ চৌধুরী দরজার দিকে পা বাড়ান।

ক্রোধে ফেটে পড়েন ক্যাপ্টেন প্রসাদ। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে চীৎকার করে ওঠেন—ইউ ইউল্‌ পে ফর্‌ দিস্‌, সোয়াইন—

একলাফে ঘুষি বাগিয়ে এগিয়ে আসেন ডাঃ চৌধুরী। বলেন—স্যাট্‌ আপ্‌ ইউ রাস্‌কেল, অর্‌ আই উইল্‌ স্ম্যাস্‌ ইওর ফাউল মাউথ্‌—এক্‌ পা পিছিয়ে যান বিজয়প্রসাদ। হাত নামিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বলেন ডাঃ চৌধুরী—আই সী, ইউ আর আফ্‌টার অল্‌ এ কাওয়ার্ড। কাপ্টেন অর্‌ নো ক্যাপ্টেন। এনি-ওয়ে দিস্‌ ইজ্‌ আওয়ার পার্টিং

অব্ দ্য ওয়েজ—বলেই গট্ গট্ করে বেরিয়ে যান। নিজের অফিসে ফিরে এসেই বেয়ারা মারফৎ রেজিগ্‌নেশন লেটার পাঠিয়ে দেন।

তিনি না হয় রেজিগ্‌নেশন দিয়েই মুক্ত। কিন্তু অসহায় উদ্বাস্তুদের কী হবে? অশান্তভাবে ঘরের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত পায়চারি করতে থাকেন ডাঃ চৌধুরী। চোখে পড়ে দেয়ালে টাঙানো প্রসারিত হস্ত নেতাজির ছবিটার দিকে। এই ছবিটা তাঁর চিরসঙ্গী। থম্‌কে দাঁড়ান ছবিটার সামনে। বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—দিল্লী চলো, চলো দিল্লী—

তাই তো, ঐ তো নির্দেশ মিলেছে। যেতে হবে দিল্লী। কিন্তু এই নিঃসম্বল উদ্বাস্তুদের নিয়ে দিল্লী যাবার তো উপায় নেই, রসদ যোগাবে কে? একমাত্র খোলা আছে কলকাতার উদার হস্ত। যেতে হবে প্রথম সেখানে, শুরু করতে হবে প্রবল আন্দোলন, আর দলবল নিয়ে সেখান থেকেই আঘাত হানতে হবে দিল্লীর দরবারে।

উদ্বাস্তুদের সামনে সমস্ত প্ল্যানটা খুলে বলেন। তাদের শুভেচ্ছা নিয়ে সেদিনই রওনা হয়ে যান রায়পুর স্টেশনের পথে।

চলন্ত ট্রেনটার দোলায় দুলতে দুলতে পুরনো সব স্মৃতিই সারা মনটাকে তাঁর দখল করে নেয়। তারই এক একটা ধাক্কা যেন তাঁর জীবনের এক একটি অবিস্মরনীয় পর্ব। শৈশব থেকেই বহু আশা জমেছিল তাঁর মনে। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে সবই আজ মিলিয়ে গেছে নৈরাশ্যের ধূসর মরুতে। সব চেয়ে বড় আশা ছিল ডাক্তার হয়ে পীড়িত মানুষের সেবা। কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত ধূলিসাৎ হয়ে গেল রণ-দানবদের বিশ্বব্যাপী রণ-হুংকারে।

হায়রে মানুষ! হায়রে তোদের জীবন নিয়ে রাজনীতি-বিদ্‌দের পুতুল পুতুল খেলা। মুখে তোদের জন্যে কত না দরদ, কত না শান্তির প্রলাপ। যুদ্ধ বাধিয়ে ঠেলে দেন তোদের কামানের মুখে—গবাদি পশুর মুখের সামনে যেন খড়-কুটো। মায়েরা

তোদেব হল পুত্রহীন, ছেলেমেয়েরা হল পিতৃহীন বা তুই নিজে হলি সারা জীবনের জন্যে পঙ্গু—আর ওঁরা অক্ষত দেহে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে জনতার সামনে কুড়িয়ে বেড়ালেন করতালি-ধ্বনি, বক্ষে দোলালেন জয়মালা, সংগ্রহ করলেন বীরের সম্মান, তোদের দিকে করুণামিশ্রিত একটু ঘাড় বেঁকিয়ে জানালেন কৃত্রিম কৃতজ্ঞতা।

পৃথিবীটা সত্যি একটা অবাক পৃথিবী। এখানে সত্যের নামে মিথ্যা কায়েম হয়। বন্ধুত্বের নামে শত্রুতা বাসা বাধে, শান্তির নামে অশান্তির বীজ ছড়ানো হয়। নইলে কে ভেবেছিল সমাজতন্ত্রী চীন আজ ভাবত সীমান্তে হামলা চালাবে? কবর দেবে দু'দিন আগেকার হিন্দি-চীনি ভাই-ভাই স্লোগানকে? আবর্জনার মত ছুঁড়ে ফেলে দেবে "পঞ্চশীল" চুক্তিব পাতা? সাম্রাজ্যবাদ আর সাম্যবাদেব সীমারেখা কী আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল—রইল শুধু জঙ্গীবাদ? "জোব যার মুল্লুক তাব"—এই প্রবাদটাই কী অবিনশ্বব হয়ে বিশ্বমানবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে আবহমানকাল? বড় বড় হরফে চৈনিক আক্রমনের শিরোনামটা যেন খিল্ খিল্ কবে হাসতে থাকে তাঁর চোখের সামনে। দেখতে পান ঢেউ-এর পর ঢেউ তুলে চৈনিক বিমান-বাহিনী গিরি কন্দর, চড়াই উৎরাই ডিঙিয়ে বমডিলার দিকে ছুটে আসছে। সে তোড়ে দম তার বন্ধ হয়ে আসে।. চোখ-মুখ রক্ত-রাঙা হয়ে উঠে। গল্‌গল্ করে ঘাম ঝরতে থাকে সর্বদেহে। অসহ্য চাপে হৃৎপিণ্ডটা যেন বুক চিরে বেরিয়ে আসতে চায়। ব্যথা—অসহ্য ব্যথা। যন্ত্রনার চাপে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে মাথাটা প্রচণ্ড ধাক্কা খায় ওপরের বাংকটায়। মুখ থুবড়ে পড়ে যায় কামরাটায়।

ট্রেনটা তার ক্লান্ত দেহকে নিয়ে একটা ঝাঁকি মেরে দাঁড়িয়ে যায় হাওড়া স্টেশনের ১৩ নং প্ল্যাটফরমটায়।

॥ সব শেষ হয়ে যাবার পরেও তার রেশ থেকে যায় ॥

২০শে নভেম্বর ১৯৮৫।

মুখার্জি দম্পতির বিবাহিত জীবনের হীরক জয়ন্তী আজ।

ইদানিং প্রতিদিনই সন্ধ্যায় অন্ততঃ দু'তিন ঘণ্টা ধরে চলছে লোড শেডিং-এর প্রচণ্ড দাপট। তাই দিনের বেলাতেই উৎসবের আয়োজন। নইলে লোড-শেডিং-এর অন্ধকারে বহুতল বাড়ির দশতলার এই এ্যাপার্টমেণ্টটির সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসতে অতিথিদের অনেকের পক্ষে হবে একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। চাকরি থেকে রিটায়ার করবার কয়েক বছর পর চৌরঙ্গীর ওপর এই এ্যাপার্টমেণ্টটি কিনেছিল প্রশান্ত। দিলীপও বালীগঞ্জ এলাকায় অনুরূপ একটা এ্যাপার্টমেণ্ট কিনেছে। একমাত্র কমলই এখনও অবিবাহিত এবং জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে কালীঘাটে ভাইপোর বাসাবাড়িতে। দাদা-বৌদি বেশ কয়েক বছর আগেই লোকান্তরিত হয়েছেন। ভাইপোর সংসারই এখন তার সংসার। বয়সের ভারে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেছে বছরখানেক হল।

অগ্রাণের শেষ বেলা। পশ্চিম আকাশের সূর্য তখন ঢলে পড়ছে। বাতাসে হেমন্তের হিমেল আবেশ। পশ্চিম দিককার বসবার ঘরটার মেঝেতে নরম রোদটা গা এলিয়ে দিয়েছে। অতিথিরা সবাই অনেকক্ষণ হল চলে গেছেন। মিসেস মুখার্জী ও মিসেস্ গুপ্ত ক্লান্ত দেহে বিশ্রামের জন্য বেড্ রুমে আশ্রয় নিয়েছেন। গৃহভৃত্য বংশীকে চা দিতে বলে তিন বন্ধু বসবার ঘরে এসে আরাম করে সোফাতে বসে।

প্রশান্ত একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা দিলীপের দিকে এগিয়ে দেয়। কমল পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে। বংশী এসে চা দিয়ে যায়।

মিনিট পাঁচেক কেটে যায়। কারো মুখে কথা নেই। দেয়াল ঘড়িটার টিক্ টিক্ আওয়াজটা শুধু কানে আসে। চায়ের কাপটায় শেষ একটা চুমুক দিয়ে প্রশান্ত যেন আপন মনেই বলে—আজকের দিনটা দু'দিক থেকে আমার কাছে ভীষণ অর্থবহ। ষাট বছর আগে কুন্তলার সঙ্গে আমার গাঁটছড়া, তেইশ বছর পর এদিনেই আবার বন্ধু গৌতমের লোকান্তর। ১৯৫০-এ রজত জয়ন্তী, ১৯৭৫-এ সুবর্ণ জয়ন্তী, আজকের হীরক জয়ন্তী, সবকটাতেই তার অনুপস্থিতির বেদনা আজীবন আমার সঙ্গী হয়ে থাকবে।

চাপা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে প্রশান্তর বুক থেকে।

দিলীপ বলে, তোমার বেদনার সমব্যথী আমরাও প্রশান্ত। অবশ্যি তোমার বিবাহবার্ষিকীর দিনটার সঙ্গে তার মৃত্যুর দিনটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে বলে তার স্মৃতিটা তোমার নিকট আরও বেদনাময়। যখনই তার কথা মনে পড়ে আমি কি করি জানো। মৃত্যুর দিন যে ডায়েরিটা হাওড়া স্টেশনে তার স্যুটকেশে পেয়েছিলাম সেটা বের করে পড়তে থাকি। তার অন্তরের অন্তঃস্থলে ঢুকে গিয়ে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই। বেদনার আর তখন কোন পৃথক সত্ত্বা থাকে না। তোমরাও বহুবার পড়েছ সেই ডায়েরীটা। বলতে গেলে এটা আমাদের প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। তবু বারবার পড়বার আগ্রহ জাগে। একটা মানুষের জীবন যে এতটা ঘটনাবহুল হতে পারে তা' বিশ্বাসই হত না, যদি না গৌতমকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে জানতাম। তোমাকে ওটা দিয়ে যাব বলেই হ্যাণ্ডব্যাগে করে নিয়ে এসেছি। বসো, এনে দিচ্ছি। আজকের দিনে ওটা পড়লে মনে অনেক শান্তি পাবে।

দিলীপ ভেতর থেকে ডায়েরীটা এনে প্রশান্তর হাতে দেয়।

পেছন পেছন বংশী আরও তিন কাপ চা নিয়ে আসে, সেন্টার টেবিল থেকে আগেকার তিনটি কাপ তুলে নিয়ে নিঃশব্দে চলে যায়।

কমল এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে বলে—ডায়েরীর কোন্ অংশটা তোমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয় তোমাদের?

প্রশান্ত বলে, তাৎপর্যপূর্ণ বলে তুমি কি বোঝাতে চাইছ।

—আমি বোঝাতে চাইছি ইংরেজীতে যাকে বলে জীবনের গাইডিং কোর্স।

একটু ভেবে নিয়ে প্রশান্ত বলে—দীপালি বৌদি'র সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ এবং তাঁকে খুঁজে বেড়াবার অবিশ্রান্ত মানসিক তাগিদই তার সারাজীবনের গাইডিং কোর্স বলে আমার ধারণা।

—দিলীপ?

দিলীপ বলে—প্রশান্তর মতেই আমার মত। আর একটু এগিয়ে আমি বলব—শেষ পর্যন্ত আকস্মিকভাবে দীপালি বৌদির সঙ্গে তার যখন দেখা হল তখন তিনি মৃত্যুশয্যায়, আর গৌতমের চোখের সামনেই বৌদি লোকান্তরিত হলেন। তারপরই দিক্‌ভ্রান্তের মত চারিদিক ঘোরাঘুরি করে পরম হতাশা নিয়ে নিজেও মৃত্যুবরণ করে নিল গৌতম।

মাথা নেড়ে আর একটা বিড়ি ধরায় কমল। তারপর বলে—আমার মনে হয়, 'কৌর্ অব্ দ্য প্রবলেম্' তোমরা মিস্ করছ। অমন মুখচোরা গৌতম যে এমন একটা রিভীলিং ডায়েরি রেখে যাবে কখনো ভাবতে পারিনি। পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে তার মনে হার্ড কৌরটি নিহিত রয়েছে একটিমাত্র লাইনে—হায় রে মানুষ! হায় রে তোদের জীবন নিয়ে রাজনীতিবিদদেব পুতুল পুতুল খেলা!

—না, কমলদা, তুমি রাজনীতি করেছ বলেই এই লাইনটা তোমার মনে ধাক্কা মেরেছে বেশি। নো, অফেন্সমেন্ট্। কিছু মনে করো না এভাবে কথাটা বললাম বলে।

একটু মৃদু হেসে কমল বলে—পাদটিকার দরকার নেই। পরস্পরকে আমরা ভাল করেই জানি। আমার জবাবটা পরে দেব। তুমিই ব্যাখ্যা করে বল, দীপালি বৌদি'র ট্র্যাজিডিটাকে তুমি এতটা গুরুত্ব দিচ্ছ কেন?

—দিচ্ছি এজন্যে যে বৌদি'র মৃত্যুর পরই দেখা দেয় গৌতমের চিত্তবৈকল্য।

—আমি মনে করি, ওটা ছিল লাস্ট স্ট্র অন দ্য ক্যামেল্স্ ব্যাক। সেই কোন্ শৈশবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাবার মুখে তরুণ এক বৃটিশ সৈনিকের মৃত্যুর করুণ কাহিনী শুনে গৌতমের মনে জেগেছিল যুদ্ধের প্রতি তীব্র ঘৃণা, তার প্রভাব থেকে নিজেকে সে কোনদিন মুক্ত করতে পারেনি। বরং ঘটনাচক্রে যখন তাকেই আবার যেতে হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বর্মার রণাঙ্গনে তখন সেই ঘৃণা হল আরও ঘনীভূত। পরবর্তীকালে আমার সঙ্গে যতবার নানা বিষয়ে ওর আলোচনা হয়েছে কথার ফাঁকে ফাঁকেই এই ঘৃণাটা ফেটে পড়ত। আর ঐ পুতুল খেলার কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলত সে। দীপালি বৌদির ব্যাপারটা তার সচেতন অবচেতন মনে সব সময় জাগ্রত ছিল সন্দেহ নেই। তবু 'যুদ্ধ' ঘৃণাটার মত কোন স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করতে পারেনি তার মনের গভীরে। দীপালি বৌদির মৃত্যু সেই ক্ষতটাকেই দগদগে একটা ঘায়ে পরিণত করে মৃত্যুর পথে তাকে ঠেলে দেয়। এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

দিলীপ এবং প্রশান্ত কেউ আর কিছু জবাব খুঁজে পায় না। কমলও চুপ করে যায়। মিনিট দুই এভাবেই কাটে। কিছু একটা বলা দরকার, তাই যেন প্রশান্ত বলে—এটা বোধহয় ভালই হয়েছে।

—কোন্টা? প্রশ্ন করে দিলীপ।

—গৌতমের মৃত্যুটা।

অবাক হয়ে কমল বলে—হঠাৎ তোমার মুখে এমন একটা কথা?

হঠাৎ নয় কমলদা'। এ চিন্তাটা কিছুদিন যাবৎ আমার মনের আনাচে-কানাচে উঁকি মারছিল। সুযোগ পেয়ে আজ তাই বেরিয়ে এল।

—কেন বল তো?

—কেন? আচ্ছা কমলদা', তুমিই তো আমাদের রাজনৈতিক গাইড। বল তো, আজ চারদিকে, সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক সার্বিক অবক্ষয় আমাদের ঘিরে ফেলেছে, গৌতম বেঁচে থাকলে এটা সে সইতে পারত?

—না।

—পারত না, অথচ তার প্রতিকার করবার কোন ক্ষমতাই তার থাকত না। আমাদেরও নেই। কারও আছে বলেও মনে হয় না। দিনরাত অবক্ষয়ের দাবদাহ সমাজজীবনকে অসহনীয় করে তুলছে। কিছু করতে পারছি না, অথচ বেঁচে আছি, এর কোন মানে হয়?

—হয়।

—কী রকম।

—প্রতিকারের কোন পথ নেই, ভাবছ কেন?

—কী সেই পথ? তুমিই বল।

—বিপ্লব।

হেসে ওঠে দিলীপ। বলে, সেই বস্তাপচা বিপ্লবের বাণী। সত্তর দশকে নকশালপন্থীরা তো তুলেছিল সেই ধ্বনি। স্বল্পকালের জন্যে নকশালবাড়ি অঞ্চলে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করেছে বলে দাবীও জানিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ফল যা দাঁড়িয়েছিল আমরা সবাই তো জানি। এদেশে কখনও আর বিপ্লব হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

কমলের মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। একটু তিক্তস্বরেই বলে—এবার ঠিক পুলিশের মতই কথাটা বলেছ তুমি। সত্তর দশকের সেই কলংকের কাহিনী যে কোন সভ্য দেশেরই পরম লজ্জা। নকশালরা ভুল করে বিপ্লবের সঠিক পথ ছেড়ে ব্যক্তি হত্যার পথে

পা বাড়িয়েছিল। তার নৃশংসতম জবাব দিয়েছিলে তোমরা গণহত্যার ধুন্ধুমারে। তাজা প্রাণের তাজা রক্তে বীভৎসতার বন্যা বইয়েছিলে বাংলা দেশের এই উর্বর জমিতে। আড়িয়াদহে, বারাসতে, ডায়মণ্ড-হারবারে আরও কত কত জায়গায় সদর রাস্তার ধারে ধারে সারবাঁধা মৃতদেহের প্রদর্শনী খুলেছিলে। রাত্রির অন্ধকারে পাড়ায় পাড়ায় ঢুকে রকে বসে বিশ্রম্ভালাপরত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেও বাদ দাওনি গুলির নিশানা থেকে। নীরব দর্শকরূপে আত্মগোপনের ঘাঁটি থেকে নিজের চোখে আমি দেখেছি, কী ভাবে পুলিসের এক বিরাট বাহিনী আনোয়ার শা' রোড-এর মোড়ে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে কত তরুণ প্রাণকে হত্যা করেছে রাইফেলের অগ্নিগর্ভ গুলি। দেখেছি আর ভেবেছি যে দেশে "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে"—সে দেশে বিচারের ভার দেশবাসীকেই তুলে নিতে হয় নিজের হাতে। তাই করেছিলাম আমরা ১৯৭৭ সালে—অত্যাচারীদের ঝাড়ে-বংশে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়ে। আর সেটা করেছিলাম বিনা রক্তপাতে। তাই আমরা আজও বেঁচে আছি, তাই না?

দিলীপের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কাতর চোখে বলে—আমাকে তুমি ক্ষমা করো, এতটা ভেবে কথাটা বলিনি। আর তুমি তো জানোই, সত্তর দশকের অনেক আগেই আমি চাকরি থেকে রিটায়ার করেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে কমল বলে—না-না, দিলীপ, তোমাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো আমি বলিনি। এমন কি, যে সেপাইরা রাইফেল ছুঁড়েছিল তাদের লক্ষ্য করেও নয়। বেতনভুক্ কর্মীদের কোন দো দিতে পারি না আমরা। দ্যাট্ উইল বি হিটিং বিলো দ্য বেল্ট তাঁদের অনেকেই তো আজও কৃতিত্বের সঙ্গে সরকারি চাকরি বহাল রয়েছেন। আমার উক্তি শুধু তাঁদেরই বিরুদ্ধে যাঁরা ওপ তলায় এয়ার-কনডিশনড্ ঘরে বসে হিম শীতল হাতে গণহত্যা

নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিবেকে যাঁদের এতটুকু বাধে নি। জনতার বিচারে তাঁরাই নির্বাসিত হয়েছেন ১৯৭৭ সালে।

বংশী আবার তিন কাপ চা এনে সেন্টার টেবিলটায় রাখে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে এবার প্রশান্ত বলে—আচ্ছা কমলদা', দিলীপ যে বলল সত্তর দশকে সেই তাণ্ডবের পর কেউ আর বিশ্বাস করবে না এ দেশে আর কখনও বিপ্লব হবে। তুমিও কী তাই মনে কর?

—না। আমি মনে করি, সে সময় বিপ্লবের জমি তৈরী ছিল না তাই অসময়ে বিপ্লব করতে গিয়েই তার খেসারৎ দিতে হয়েছিল, শুধু নকশালপন্থীদেরই নয়, আমাদেরও তদানীন্তন সরকার চেয়েছিলেন নকশাল দমনের ধ্বনি তুলে সমগ্র বামপন্থী আন্দোলনটাকেই পশ্চিমবাংলায় চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দিতে। আমরা সতর্ক ছিলাম। যতটা সম্ভব শহর ছেড়ে গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিলাম। মন দিয়েছিলাম ইস্পাৎ কঠিন সংগঠন গড়ে তোলার কাজে। এবং সেটা করেছিলাম বলেই ১৯৭৭ সালে ফিরে এসেছিলাম শতগুণ শক্তি নিয়ে।

—বিপ্লবের জমি কী এই আট বছরে তৈরী হয়েছে বলে মনে কর ?

—না, তা' মনে করবার মত দিন আজও আসে নি'। এটা বোঝা দরকার বিপ্লবের পথ কুসুমাকীর্ণ নয়, বা পাকাপোক্ত সদর রাস্তাও নয়। সে যখন আসবে অনেক ঝোপ-ঝাপ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়েই তাকে আসতে হবে। যে কথা কাজী নজরুলের কবিতার ভাষায়—'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে, লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁসিয়ার।" আর যখন আসবে তখন বর্ষার পাহাড়ি নদীর মতই স্রোত হবে তার অপ্রতিরোধ্য। তারই মহড়া চলছে আমাদের পশ্চিমবাংলার উর্বর জমিতেই। মহড়ায় অভিনেতাদের পার্ট থমকে থমকে মুখস্থ করতে হয়। কখনো এগুতে হয়, কখনও পেছুতে হয়। অর্থাৎ তীর দূরে নিক্ষেপ

করতে হলে ধনুকের ছিলেটাকে যেমন পেছনেই টেনে ধরতে হয়। সে পর্যায়টাই চলছে এখন পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে। কিন্তু সব চেয়ে বড় বাধা হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলিতে প্রকৃতপক্ষে আজও সেই মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থা। রাজা-মহারাজদের অবসান ঘটানো হয়েছে অবশ্যি কিছু আইন করে, কিন্তু তাঁদের অধস্তন তালুকদার জোতদাররা এখনো বহাল তবিয়তে রয়েছেন এবং ভূমিহীন কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর তাদের শোষণ পর্ব আজও অব্যাহত, বিশেষ করে হিন্দি বলয়ে। তদুপরি রাজা-মহারাজদের শূন্য আসন দখল করেছেন সরকারি দাক্ষিণ্যে অন্য এক ধরণের শোষকগোষ্ঠী। তাদের বলা হয় শিল্পপতি। যারা গড়ে তুলছেন এক একটি পৃথক "হাউস"। সবাই তাদের নাম জানেন। খবরের কাগজে তাদের কীর্তিকাহিনীর বিবরণও পড়ি প্রায়শঃ, কিন্তু তাদের গা কেউ স্পর্শ করতে গেলে নিজেই সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। দেশোন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা জমা হচ্ছে তাদের ধনভাণ্ডারে—যার অন্যূন অর্ধাংশের চালু নাম কালো টাকা। যার প্রভাবে দ্রব্যমূল্যের বছরের পর বছর ঊর্ধগতি, ধনী হচ্ছে আরও ধনী, গরিব হচ্ছে আরও গরিব। সব চেয়ে বড় মারাত্মক ব্যাপার এদের প্রভাব প্রতিপত্তি শুধু হিন্দি বলয়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, এরা ছড়িয়ে আছে, সারা দেশব্যাপী।

—এই অক্টোপাশ গ্রীপ থেকে দেশকে ছিনিয়ে আনার আশা দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়, কমলদা'। বিপ্লবের বেলুন উড়িয়ে আকাশছোঁয়া তাদের অগ্রগতি রোধ করা যাবে না। তা' ছাড়া আজকের পরিস্থিতি আরও ঘোরালো। এখানে ওখানে সাম্প্রদায়িকতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ আর সমাজবিরোধীদের আক্রমণ সারা দেশটাকে টালমাটাল অবস্থায় ঠেলে দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী যে ভাবে একের পর এক এদের সঙ্গে চুক্তি করে চলেছেন শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে যে আমরা দাঁড়াব তারই ঠিকানা নেই।

—এই দিবাস্বপ্নের মাঝেই কিন্তু আশার আলো দেখতে পাই আমি। এই ধরনের পরিস্থিতির ক্লাইম্যাক্স্ থেকেই জন্ম নেয় সত্যিকারের বিপ্লব। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে রাশিয়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চীনের পরিস্থিতির দিকে ফিরে তাকাও বুঝতে পারবে আমি কী বলতে চাই। যারা সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবে বিশ্বাসী তাদের জন্যে পা ফেলার জমি তৈরি হচ্ছে। সে জমি কবে চাষের উপযোগী হবে তা জানি না। হয় তো একাবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগে। আবার চলতি শতাব্দীর শেষ পাদে হলেও অবাক হব না। রাজনীতিতে ভবিষ্যদ্‌বাণী বোকামির নামান্তর। আমি বোকা নই, আশাবাদী।

কমলের বক্তব্য শেষ হয়ে যায়। দিলীপ ও প্রশান্ত বলবার মত নতুন আর কোন কথা খুঁজে পায় না। তিনজনই চুপ করে যার যার আত্মানুভূতি ও চিন্তার জগতে যেন ডুবে যায়। মাথার ওপর দিয়ে গুম্ গুম্ আওয়াজ তুলে একটা বিমান চলে যায়। অকস্মাৎ রাস্তার দিক থেকে কর্ণভেদী বিকট এক শব্দ এসে ওদের সচকিত করে তোলে। যাবার সময় বিমানটা একটা বোমা ফাটিয়ে গেল যেন। তিন বন্ধু উঠে ব্যালকনিটার রেলিং ধরে নিচের দিকে তাকায়। দেখা যায় শত শত মানুষের ভিড়। তাড়া খাওয়া পিঁপড়ের মত এদিক ওদিক পাগলের মত ঘরমুখো মানুষগুলো ছুটোছুটি করছে। একটা ডবল ডেকার পার্শ্ববর্তী একটা ট্রামের পেটে ঢুকে পড়েছে। সেকেণ্ড ক্লাশ বগিটা কাত হয়ে আছে। তাকে ঘিরে অসংখ্য মানুষ জানালা দিয়ে টেনে হিঁচড়ে আহতদের কামরা থেকে বের করে আনছে। একটা ট্রাফিক পুলিশ হাত তুলে প্রাণপণে বাঁশি ফুকরে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে পুলিশের একটা কালো ভ্যানও আপৎকালীন সাইরেন ফুঁকে ভিড় সরিয়ে ট্রামটার পাশে এসে আহতদের উদ্ধার কাজে হাত লাগায়।

কমল বলে—এটাই কলকাতার প্রাত্যহিক চিত্র। রাস্তাঘাটে,

মাঠ-ময়দানে মিছিল, সমাবেশ, পথরোধের উন্মাদনা, ট্রামে-বাসে বাদুড়ঝোলা মানুষের ভিড়, মোটর গাড়ি, ঠেলা, রিক্সা আর হরেক রকম যানবাহনের ধাক্কাধাক্কি, এ্যাক্সিডেণ্ট, হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্র-তরঙ্গের আছড়ে পড়ার উথাল-পাথাল। এটাই তার বাহ্যরূপ। গভীরে প্রবেশ কর সেখানে দেখবে বৈরাগ্যের প্রশান্তি। কোন কিছুতেই তার আসক্তি নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই, ধ্যানমগ্ন এক যোগীপুরুষ। কে এল, কে গেল, কিছু তার যায় আসে না। কে জানে, একদিন হয়তো ১৯১৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বিশ্ব-কাঁপানো যে ভূমিকা পালন করেছিল রাশিয়ার সেণ্টপিটার্সবার্গ, অনাগত ভবিষ্যতের যে কোন মাসে সেই ভূমিকাই পালন করবে আমাদের এই বিক্ষুব্ধ, অথচ নিরাসক্ত এবং উদাসীন, কলকাতা।

প্রশান্ত বলে—আমার মনের কথাটাই যেন তোমার মুখে ভাষা পেল আজ, কমলদা'। জানো, এ বাড়িতে যেদিন থেকে এসেছি, সেদিন থেকেই ঘরে থাকলে এই ব্যালকনিটাতে আমি এসে দাঁড়াই। প্রায়ই আজকের মতই এমনি ঘটনা বা দৃশ্য চোখে পড়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি। মনে হয় অন্তরীক্ষে দাঁড়িয়ে কলকাতার প্রাণপুরুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। আর ঐ মুহূর্তে তোমার কথায় খুঁজে পেলাম তাকে। কলকাতা সদা চঞ্চল, সদা বিক্ষুব্ধ, অথচ নিরাসক্ত এবং উদাসীন। এটাই তার অন্তর-পুরুষ।

আর কোন কথা নেই, সবাই চুপ। শুধু নিচে থেকে মাঝে মাঝে শোনা যায় পুলিশের বাঁশির তীব্র আওয়াজ, আর শেষবারের মত হতভাগ্য হতাহতদের নিয়ে চলে যাওয়া কালো ভ্যানটার বিদায় সাইরেন।

তিন বন্ধু তখনও নীরবে দাঁড়িয়ে। দিনের আলো স্তিমিত। হাওড়ার আকাশে সূর্য তখন অস্তোন্মুখ। পাতলা সাদা একখণ্ড

মেঘের আড়াল থেকে তার রক্তিম রশ্মিরাজি সহস্র হাত বিস্তার করে অপসৃয়মান দিনের আলোটাকে আঁকড়ে ধরে রাখবার ব্যর্থ প্রয়াসে যেন শেষবারের মত চিকমিক করে ওঠে। তারপর পলকের মধ্যে স্খলিত হস্তে ডুব দেয় রাতের সমুদ্রে। ওপারে কারখানার চিম্‌নিগুলো প্রেতমূর্তির মত দাঁড়িয়ে অন্তরের যত হিংসা যত জ্বালার বিষ যেন কালো ধোঁয়ারূপে আকাশটাকে কালিমালিপ্ত করে চলেছে। তিনবন্ধু পলকহীন দৃষ্টি নিয়ে দেখছে। আরও কাছে দেখতে পায় শিরীষ, কদম আর কৃষ্ণচূড়া গাছের আড়াল থেকে সেন্ট. পল্‌স্ গির্জার সূচ্যগ্র চূড়াটা ঊর্ধমুখ রকেটের মত যেন উৎক্ষেপণের জন্য অপেক্ষা করছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সুডৌল গম্বুজের ওপর দাঁড়ানো পরীটা স্থির হয়ে ডানা মেলে নীরবে নিচে ভ্রমণরত তরুণ-তরুণীদের আহ্বান জানায়—এসো মোর ছায়াঘন সবুজ শীতল প্রাঙ্গণে, প্রাণভরে গেয়ে যাও প্রেমের সঙ্গীত। ডানদিকে দেখা যায় শহিদ মিনারটা তার উদ্ধত বলিষ্ঠ দেহটা নিয়ে নীল আকাশটার দিকে তাকিয়ে আছে। ওদিকে রাজভবনের গম্বুজটার শীর্ষে বিশেষ একটা পতাকা পত্ পত্ করে যেন পথচারিদের সাবধান করে দিচ্ছে—তফাৎ যাও, এখানে তোমাদের প্রবেশ নিষেধ।

গড়ের মাঠটা এরই মাঝে হেমন্তের ধোঁয়াশায় গা' ঢাকা দিয়েছে। মেট্রোর কল্যাণে সৃষ্ট কয়েকটি মাটির ঢিপি সমুদ্রতীরে বালিয়াড়ির মত চৌরঙ্গী সমুদ্রে নানা জাতের, নানা রং-এর পোষাকে সজ্জিত নর-নারীর লাস্যময় জীবনের লীলাকৌতুকের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে। বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের বৈদ্যুতিক বড় ঘড়িটার কাঁটা যেন মিনিটে মিনিটে টুক করে এগিয়ে গিয়ে দর্শকদের সতর্ক করে বলতে চায়—সাবধান, তোমার জীবনের এক মিনিট কমে গেল। সময় থাকতে ভোগ করে নাও, রাতের চৌরঙ্গীর লাস্যময় এই জীবন।

দপ্ করে অকস্মাৎ সব আলো নিভে যায়। কলকাতার বুকে নেমে আসে লোড্-শেডিং-এর অন্ধকার, ধ্যানমগ্না শকুন্তলাকে দুর্বাসার অভিশাপের মত। শুধু দূর আকাশেই শুক্লানবমীর হাস্যময়ী চাঁদ অতন্দ্র প্রহরীর মত জেগে থাকে তার শুভ্র-কোমল আলোক-বর্তিকা নিয়ে।